স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী

ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ

প রি বে শ ক
অ শো ক প্র কা শ ন
এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা বারো

লেখকের নিবেদন

যুগাবতার পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সংশয়বাদী ও নাস্তিক তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্তরকালে স্বামীজী-রূপে (স্বামী বিবেকানন্দ) সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছিলেন। বিশ্বের যেখানেই তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি জুলিয়াস সীজারের মতো বলতে পারতেন, ভিনি, ভিদি, ভিসি, এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। আধ্যাত্মিক জগতের এই জুলিয়াস সীজারের জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস দেওয়া খুবই দুরূহ। তবু সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্যে স্বল্পায়তন পুস্তকে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, তাঁর আদর্শ ও বাণী লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। কতোখানি সার্থক হয়েছি, তা পাঠক-পাঠিকারাই বিচার করবেন।

দ্রুত মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করার ফলে বইখানিতে কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। বইখানির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সহযোগিতা, উপদেশ ও পরামর্শ কামনা করি। ইতি—

লেখক

সূচীপত্র

১
বংশ : জন্ম : শৈশব

একশ' বছর আগের কলকাতা।

সে কলকাতায় বিরাট বিরাট আকাশচুম্বী অট্টালিকা এমন গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ছিল না, ছিল না বিশাল বিশাল রাজপথ, ছিল না বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যানবাহনের উৎকট শব্দ, বৈদ্যুতিক আলোর চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের সমারোহ, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড় আর কলরব। সে কলকাতা তখনকার ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হ'লেও তখনও যেন গ্রামের খোলসটা সম্পূর্ণ ছেড়ে ফেলতে পারেনি। সে কলকাতা ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধনীর অট্টালিকা, মধ্যবিত্তের গৃহ, দরিদ্রের পর্ণকুটির, সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ, এঁদো পুকুর, গৃহস্থের ফলের বাগান, দেবালয়, গোলাবাড়িতে পূর্ণ। সেই কলকাতার উত্তরাংশে হেদো আর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পশ্চিমে সিমুলিয়া-পল্লী। সিমুলিয়া-পল্লীর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে দত্তদের বাড়ি। তখনকার কলকাতার একটি নামজাদা ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবার।

এই পরিবারের পূর্বপুরুষ রামমোহন দত্ত এক ইংরেজ অ্যাটর্নীর সহযোগী-রূপে প্রচুর বিত্ত ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। রামমোহন দত্তের বাসভবনটি ছিল বিশাল। রাস্তার ওপরেই বাড়ির প্রকাণ্ড তোরণ। তোরণের একদিকে একটি প্রকোষ্ঠ, অন্যদিকে বসবার মতো চাতাল। চাতালের পাশ দিয়ে দ্বিতীয় একটি প্রবেশ-পথ। তারপরেই সুপ্রশস্ত আঙিনা। আঙিনার ডানদিকে পুরুষদের বসবার জন্যে কতিপয় ঘর। আঙিনা পার হয়ে দ্বিতল অন্দরমহল। নিচের তলায় রন্ধনশালা, উপরে শয়নকক্ষ। বাসভবনটির সঙ্গে গৃহদেবতার একটি মন্দিরও ছিল।

রামমোহন দত্তের দু ছেলে—দুর্গাচরণ ও কালীপ্রসাদ। তরুণ দুর্গাচরণ তখনকার রীতি অনুযায়ী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাজ চালাবার মতো ইংরেজীও জানতেন। তিনি অল্পবয়সেই বাবার সঙ্গে আইন-ব্যবসায়ে যোগ দেন। প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও বিষয়-লিপ্সা ছিল না রামমোহনের। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও ধর্মানুরাগী। পিতার এই গুণগুলি দুর্গাচরণের মধ্যেও অল্প বয়স থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তরুণ বয়সেই তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য দেখা দিল। এর পর তিনি সংসারে আর বেশী দিন থাকেন নি। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্রকে রেখে দুর্গাদাস সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে যান। এই শিশুপুত্রই বিবেকানন্দের ভাবী জনক বিশ্বনাথ দত্ত।

দুর্গাদাসের সংসার ত্যাগের পর বিশ্বনাথের মা শিশুপুত্রের লালনপালনের দায়িত্ব নিজহাতে তুলে নিলেন। যখন বিশ্বনাথের বয়স মাত্র তিন বৎসর, তখন তিনি একবার কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রা করেন। তখন রেলপথ ছিল না। তাই কাশী যেতে হ'লে এই পাঁচশ মাইল পথ নৌকোয় যেতে হ'তো। নদীপথে তীর্থযাত্রায় যেমন ছিল কষ্ট, তেমনি ছিল আনন্দ। নদীর দুই তীরে অবস্থিত কতো না নগর ও তীর্থ দেখতে দেখতে গ্রাম জনপদ পার হয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতেন তাঁদের অভীষ্ট তীর্থের পথে। কতো অপরিচিত ঠাঁই, অজ্ঞাত মানুষ, অজানা ভাষা, বেশভূষা, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে হ'তো তাঁদের পরিচয়! একদিন সকালে নৌকোর পাটাতনে ব'সে শিশু বিশ্বনাথ খেলা করছিলেন, হঠাৎ তিনি নৌকো থেকে গঙ্গার জলে প'ড়ে গেলেন। বিশ্বনাথের মা সাঁতার জানতেন না, তবু তিনি পলকে শিশুপুত্রকে উদ্ধারের জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ডুবন্ত শিশুকে কঠিন মুষ্টিতে চেপে ধরলেন। নৌকোর অন্যান্য লোকেরা দ্রুত ছুটে এসে শিশুকে ও তার মাকে উদ্ধার করলো। বিশ্বনাথের মা তাঁর শিশুপুত্রকে এমন

কঠিনভাবে চেপে ধরেছিলেন যে, সেই ধরবার দাগ বহু বছর বিশ্বনাথের দেহে ছিল।

অবশেষে তাঁরা তীর্থক্ষেত্র বারাণসীতে গিয়ে পৌছলেন। মন্দির-নগরী কাশী তাঁরা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। বীশ্বেশ্বর শিবের মন্দিরেও তাঁরা গেলেন। একদিন বিশ্বনাথের মা গঙ্গাস্নান ক'রে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে যাচ্ছিলেন, পথে হঠাৎ তিনি পা পিছলে পড়ে গেলেন এবং মূর্ছিতা হলেন। ঐ সময়ে এক সন্ন্যাসী পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরের সিঁড়িতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। বিশ্বনাথের মার যখন জ্ঞান হ'লো তখন তিনি চোখ মেলে দেখলেন, এক সন্ন্যাসী নুয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আছেন। মুহূর্তে চিনলেন বিশ্বনাথের মা, কে এই সন্ন্যাসী। তাঁর স্বামী! সন্ন্যাসীও চিনেছিলেন। দুজনেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সন্ন্যাসী মায়া! মায়া! ব'লে প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন এবং নিমেষে জনারণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বিশ্বনাথের মা-ও অতুলনীয় সংযমের সঙ্গে নিজেকে সংহত ক'রে নিয়ে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হ'লে সন্ন্যাসীদের নিয়মানুযায়ী দুর্গাচরণ একবার জন্মস্থান দর্শনের জন্যে ফিরে এসেছিলেন। তখন বিশ্বনাথের মা পরলোকে। এই সময়ে দুর্গাচরণ তাঁর বালক-পুত্রকে আশীর্বাদ ক'রে যান।

বিশ্বনাথ বড় হয়ে তাঁর বংশের ধারা অনুযায়ী আইন-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন। আইন-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও বিষয়াসক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন দানধ্যানে মুক্তহস্ত, সংগীতে ও সাহিত্যে উৎসাহী। বাইবেল ও হাফিজের কবিতা ছিল তাঁর বড় প্রিয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় গোঁড়া হিন্দুয়ানি তাঁর ছিল না। অনেক অভিজাত মুসলমান ছিলেন তাঁর মক্কেল। তিনি লখনৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ক'রে বহু মুসলমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে আহারে

বিহারে তিনি মুসলমানী রীতি অনুসরণ করতেন আর ধর্মের দিক থেকে ছিলেন খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী। অর্থাৎ ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে তাঁর বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। তিনি অর্থোপার্জন, দীন-দুঃখী ও আত্মীয়-স্বজনকে উদারহস্তে সাহায্যদান এবং জীবন উপভোগকেই জীবনের প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বিশ্বনাথের পরিবারে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ছিল নিত্য সমাগম, গৃহে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাসদাসী, গাড়ি-ঘোড়া, সহিস-কোচুয়ান। বিশ্বনাথের মতো ধনী, উদার ও দৃঢ়চেতা মানুষ সংসারে বিরল।

বিশ্বনাথের এই বিশাল সংসারে মধ্যমণি ছিলেন তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবী। ভুবনেশ্বরী ছিলেন প্রাচীনপন্থী হিন্দু মহিলা। তিনি বাংলা লেখাপড়া ভালোই জানতেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি তিনি নিয়মিত পড়তেন। স্বামীর উদার মনোভাব তাঁকে আধুনিক ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত করেছিল। তাঁর ছিল এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রে ছিল একটি সহজাত তেজ ও স্বাভাবিক আভিজাত্য। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে স্বামীর ঔদার্য, ঔদাসীন্য তাঁকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে শিবপূজা না ক'রে জলস্পর্শ করতেন না। তিনি ছিলেন শুদ্ধমতি, ব্রতচারিণী। তাঁর চরিত্র পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের প্রভাবিত করতো।

ভুবনেশ্বরীর সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। কেবল অভাব ছিল একটি পুত্রের। একটি পুত্রের জন্যে তাঁর ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শিবমন্দিরে পুত্র-কামনায় কাতর প্রার্থনা জানাতেন, নানারকম বারব্রত করতেন। দত্তপরিবারের জনৈক বৃদ্ধা মহিলা কাশীধামে থাকতেন। তাঁকে দিয়ে ভুবনেশ্বরী বীরেশ্বরের মন্দিরে পুত্রকামনায় পুজো ও যজ্ঞাদি করবার ব্যবস্থাও করলেন। বীরেশ্বরের মন্দিরে তাঁর অভীষ্ট মতো পুজো ও যজ্ঞাদি করা হয়েছে জেনে ভুবনেশ্বরীর মন অপার আনন্দে

পূর্ণ হ'লো। তিনি শিব-চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন। গৃহ-কর্মের চেয়ে বেশির ভাগ সময়ই তাঁর গৃহদেবতার মন্দিরে শিব-পূজায় কাটতে লাগলো।

একদিন সকালে শিবপূজা সেরে ভুবনেশ্বরী ধ্যানস্থা হলেন। দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেল হ'লো, তিনি বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে শিবধ্যানে তন্ময় হয়ে রইলেন। সন্ধ্যা হ'লো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রজনী গভীর হ'তে লাগলো। অবশেষে ভুবনেশ্বরী শ্রান্তদেহে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন—কৈলাসপতি দেবাদিদেব তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখলেন, সেই অপরূপ দেবমূর্তি শিশুরূপ গ্রহণ ক'রে তাঁর কোলে আশ্রয় নিলেন। অপার আনন্দে ভুবনেশ্বরীর ঘুম ভেঙে গেল। তখন ভোরের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। ভুবনেশ্বরী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে 'হে শিব! হে শংকর!' ব'লে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনা যে পূর্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর কোনও সংশয় রইলো না।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি। বাংলা সন ১২৬৯ সালের পৌষ মাসের শেষ দিন, মকর-সংক্রান্তি। সোমবার। প্রত্যূষে মকর-সংক্রান্তির পুণ্য সপ্তমী তিথিতে স্নানের জন্যে অগণিত নরনারী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দিকে চলেছে। সূর্যোদয়ের ৬ মিনিট আগে, সকাল ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডে ভুবনেশ্বরী দত্ত-পরিবারে আনন্দ কলরবের মধ্যে এক পুত্র প্রসব করলেন। তাঁর এই পুত্রই পরবর্তী-কালের বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ।

নবজাত শিশুর নামকরণ নিয়ে অনেকে আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেন, শিশু দেখতে ঠিক পিতামহের মতো, সুতরাং নাম রাখা হ'ক দুর্গাদাস। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তাঁর স্বপ্নের কথা স্মরণ ক'রে শিশুর নাম রাখলেন 'বীরেশ্বর'। বীরেশ্বর থেকে শিশুর ডাক-নাম হ'লো 'বিলে'। শুভ অন্নপ্রাশনের সময় শিশুর নূতন নামকরণ হ'লো নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের দুরন্তপনায় সংসারের সকলে অস্থির। দুষ্টু বুদ্ধিতে সে কম যায় না। বড় দুই দিদি তাকে শাসন করতে গেলে সে হাসতে হাসতে নর্দমায় দিয়ে দাঁড়ায় আর নোংরা মেখে দুই হাত বাড়িয়ে বলে, 'কই, ধর দেখি।' অসময়ে নাইবার ভয়ে দিদিরা ছুটে পালায়। মা অনেক সময় রাগ ক'রে বলেন, "চাইলুম শিবকে, তিনি পাঠিয়ে দিলেন একটা ভূত!" নরেন্দ্রনাথ যখন কান্না শুরু করে, তখন সে কান্না আর থামতে চায় না। কান্না থামাতে সকলে হন্তদন্ত হয়ে যান। আদব ক'রে বা ভয় দেখিয়ে সে কান্না থামানো যায় না। শেষ পর্যন্ত মা ভুবনেশ্বরীর কী খেয়াল হ'লো কে জানে, তিনি একটা অদ্ভুত উপায় বের করলেন। নরেন্দ্রনাথ যখনই ওই রকম দুরন্তপনা ও কান্না শুরু করতো, মা অমনি ছুটে এসে তার মাথায় শিব-নাম উচ্চারণ করতে করতে এক ঘটি জল ঢেলে দিতেন। মন্ত্রের মতো কাজ হ'তো। নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ শান্ত হয়ে যেত। ভুবনেশ্বরীর এই কৌশল আবিষ্কারের পেছনে বুঝি একটা তত্ত্ব ছিল। তিনি সেই স্বপ্নের কথা স্মরণ ক'রে মনে করতেন, শিবই তো এসেছেন তাঁর কোলে; মাথায় জল ঢেলেই তো আশুতোষ ভোলানাথকে তুষ্ট করতে হয়। তবে নরেনের মাথায় জল ঢাললেও সে তুষ্ট হয়ে ঠাণ্ডা হবে না কেন? কৌশলটা মন্ত্রের মতো কাজ করছে দেখে তাঁর ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হ'লো। তবে একথা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। নরেন্দ্রনাথ যখন দুরন্তপনা করতো, তখন মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, 'তুই যে এমন দুষ্টুমি করছিস, শিব কিন্তু তোকে কৈলাস ঢুকতে দেবেন না।' কথাগুলো শুনে শিশু নরেন্দ্রনাথ কেমন যেন ভয় পেয়ে যেতো, নিমেষে দুরন্তপনা বন্ধ ক'রে সে ভালো মানুষটি হয়ে যেত।

ভুবনেশ্বরীর বাড়িতে দুপুরবেলা রোজই রামায়ণ মহাভারত পড়া হ'তো। কখনও ভুবনেশ্বরী নিজে পড়তেন, কখনো বা পড়তেন পরিবারের জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা। এই আসরের নিয়মিত শ্রোতা ছিল

শিশু নরেন্দ্রনাথ। সব দুরন্তপনা ফেলে শান্তশিষ্ট হয়ে মন দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনতো সে। অন্যান্য পুরাণের গল্পগুলিও সে মন দিয়ে মায়ের কাছে শুনতো। রামসীতার কাহিনী শুনতে শুনতে তার শিশু-হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠতো। একদিন সে তার এক খেলার সাথীকে সঙ্গে নিয়ে বাজার থেকে একটি রামসীতার যুগলমূর্তি কিনে আনলো। বাড়ির ছাদে একটি নির্জন ঘরে সেই মূর্তিটিকে স্থাপন ক'রে নরেন্দ্রনাথ তার সম্মুখে প্রায়ই চোখ বুজে বসে থাকতো। ছোটবেলা থেকে সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখে দেখে এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অমিততেজা মুনি-ঋষিদের গল্প শুনে শুনে নরেন্দ্রনাথের শিশু-মনে ধ্যান ও তপস্যা করবার একটি আশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু রামসীতাকে নিয়ে শীঘ্রই এক সমস্যায় পড়লো নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের আর এক শখ ছিল, ঘোড়ার গাড়ি চড়বার শখ। ঘোড়ার গাড়িতে মার কোলে ব'সে যখন সে বেড়াতে বেরুতো, তখন রাস্তার দুই পাশের অসংখ্য বস্তু তার শিশু-চিত্তকে দোলা দিত। প্রশ্নের পর প্রশ্নে মাকে বিব্রত ক'রে তুলতো সে। গাড়ি সে এতো ভালোবাসতো যে, রোজ বাড়ির সুমুখে ব'সে প্রত্যেকটি গাড়িকে লক্ষ্য করতো। গাড়ির চেয়ে ভালোবাসতো গাড়ির কোচোয়ানকে। কেমন রথের সারথির মতো তেজী ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে বুক ফুলিয়ে বসে থাকে লোকটা। কেমন লোভনীয় তার পোশাক-পরিচ্ছদ—চাপরাস, জরির পাগড়ি। ভবিষ্যৎ জীবনে কোচোয়ান হওয়ার বাসনা নরেন্দ্রের শিশুমনে প্রবল হয়ে উঠলো। একদিন তাঁর বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "নরেন, তুমি বড় হয়ে কি হবে বলো দিকি।" নরেন গম্ভীরমুখে জবাব দিল, "কেন, কোচোয়ান।" বালক নরেন্দ্রনাথ কোচোয়ান হওয়ার আশায় বাবার বুড়ো কোচোয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব গ'ড়ে তুললো। সুযোগ পেলেই সে বাবার আস্তাবলে গিয়ে পৌঁছতো। বুড়ো কোচোয়ানের সঙ্গে জুড়ে

দিতো হাজারো গল্প। বুড়ো কোচোয়ান ছিল হিন্দুস্থানী, রামসীতার ভক্ত। শিশু নরেন্দ্রনাথ রামসীতার ভক্ত হয়ে উঠেছে জেনে তাদের বন্ধুত্বটা খুব নিবিড় হয়ে উঠলো। বুড়ো কোচোয়ান শিশু নরেনের কাছে তার সব প্রাণের কথাই বলতো, নিজের সুখ-দুঃখের কথাও। সুখ-দুঃখের কথা বলতে গিয়ে বললো, তার বিবাহিত জীবনের কথা। তার বউ আর বিবাহিত জীবন যে তার সকল দুঃখের মূলে, তা-ও সে সবিস্তারে বর্ণনা করলো। এই জীবন্ত বর্ণনা বালক নরেন্দ্রনাথের মনে বিবাহিত জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুললো। নানা চিন্তায় আকুল হয়ে নরেন্দ্রনাথ সজল চক্ষে মার কাছে ফিরে গেল। মা কারণ জিজ্ঞাসা করলে নরেন্দ্রনাথ কোচোয়ানের কাছে যা শুনেছিল, তা সবিস্তারে জানালো এবং ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলো —'মা, আমি সীতারামের পূজো করবো কেমন ক'রে? সীতা রামের বউ ছিল যে!' মা প্রিয় পুত্রকে বুকে টেনে নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সীতারামের পূজো নেই বা করলে। কাল থেকে তুমি শিবপূজো করো বাবা!' মার কথায় নরেন্দ্রনাথ মায়ের মতো শিবপূজোই করবে স্থির করলো। সেদিনই সন্ধ্যায় অন্ধকারে সে রামসীতার যুগলমূর্তিখানিকে পথে নিক্ষেপ করলো। এমনি ভাবে বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বিবাহিত জীবনের প্রতি যে তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মেছিল, তাই ভাবী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শকে সুনির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিল।

রামসীতার দাম্পত্য জীবনের আদর্শ নরেন্দ্রনাথকে প্রণোদিত না করলেও বাল্যকাল থেকেই রামায়ণের হনুমানের চরিত্রটি তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাল্যকাল থেকেই রামভক্ত বীর হনুমানের অলৌকিক কাহিনী শুনতে সে বড় ভালোবাসতো। মার কাছে সে শুনেছিল, হনুমান অমর, তিনি এখনও জীবিত আছেন। সেই থেকে হনুমানকে দেখবার জন্যে নরেনের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতো। কোথাও কি একবার হনুমানের দেখা পাওয়া যায় না!

একদিন নরেন্দ্রনাথ এক জায়গায় কথকতা শুনতে গিয়েছিল। কথকঠাকুর নানা হাস্যপরিহাসের সঙ্গে হনুমানের চরিত্র বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হনুমান কলাবনে থাকেন এবং কলা খেতে বড়ই ভালবাসেন। বালক নরেন্দ্রনাথ কথকঠাকুরের পরিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে কথক-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি যে বললেন, হনুমান কলা খেতে ভালবাসেন ও কলাবাগানেই থাকেন, আমি সেখানে কি তাঁকে দেখতে পাব?' কি সুগভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে যে এই কথাগুলি বালক জিজ্ঞাসা করেছিল, তা বুঝবার মতো শক্তি ছিল না কথক-ঠাকুরের। তিনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, খোকা। তুমি কলাবাগানে খুঁজলে তাঁর দেখা পেতে পার।'

নরেন্দ্রনাথ কথকতার আসর থেকে সোজা চলে গেল তাদের বাড়ির পাশের কলাবাগানে। সেখানে সে হনুমানের দর্শনলাভের জন্যে আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। তবু হনুমান এলেন না। শেষ পর্যন্ত ভগ্নমনোরথ হয়ে নরেন বাড়ি ফিরলো। ছেলের ফিরতে দেরি দেখে মা নানা আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। পুত্র ফিরে এলে তার মলিন মুখ দেখে মা প্রশ্ন করলেন। বালক মার কাছে সব খুলে বললো। বালকের এই বিশ্বাসের মূলে মা আঘাত ক'রে তাকে কষ্ট দিতে চাইলেন না। তাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ হয়ত হনুমান রামের কাজে কোথাও গেছেন। আর একদিন দেখা হবে।' আশায় আনন্দে বালকের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো। যা সে বিশ্বাস করতো, তা প্রত্যক্ষ করবার তৃষ্ণা চিরদিনই তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলতো। তাই একদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করবার জন্যে তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটি মানুষের, যিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি ভগবানকে দেখেছি।' এর পর বালক আর হনুমানকে দর্শন করবার চেষ্টা করেছিল

কিনা জানা যায় নি। তবে হনুমানের প্রতি তার যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা তার হৃদয়ে অম্লান ছিল। পরবর্তীকালে (তিনি যুবকদের হনুমান-চরিত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে বলতেন। তিনি বলতেন, দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজো চালিয়ে। দুর্বল বাঙ্গালী জাতির সামনে এই মহাবীর্যের আদর্শ তুলে ধর। দেহে বল নেই, মনে সাহস নেই—কি হবে এই সব জড়োপিণ্ডগুলো দিয়ে! আমার ইচ্ছে করে, বাংলার ঘরে ঘরে মহাবীরের পূজো হ'ক) একবার তিনি বেলুড়মঠে মহাবীর হনুমানের একটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপনের সংকল্পও করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাচরণ সন্ন্যাসী হয়ে সংসারত্যাগ করেছিলেন। তাই এ সংসারে সন্ন্যাসীদের প্রতি মোহ ও স্নেহ-শ্রদ্ধা ছিল স্বাভাবিক। শিশুকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথ সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠতো। সন্ন্যাসীদের দেখলে সে খোঁজখবর নিতো, কৈলাসে শিব কেমন আছেন ইত্যাদি। সন্ন্যাসীরা যখন যা চাইতেন, সে বাড়ির লোকের অজ্ঞাতেই তা বিলিয়ে দিতো। নিজের পরা-কাপড়খানিও দিয়ে বসতো। এজন্য প্রায়ই তাকে তিরস্কার ও শাসন সইতে হ'ত। সন্ন্যাসী সাজতে তার খুবই ভালো লাগতো। অনেক সময় পরবার কাপড় ছিঁড়ে ন্যাকড়া তৈরি করে তা দিয়ে সে কৌপীন ক'রে নিতো, এবং করতালি দিয়ে 'শিব' 'শিব' বলে নাচতো। এই শিশু-সন্ন্যাসীকে দেখে ভুবনেশ্বরী তন্ময় হয়ে যেতেন, স্বপ্নে দেখা শিশু ভোলানাথের কথাই তাঁর মনে পড়তো। মাথায় জটা গজাবার জন্যেও চেষ্টা চলতো নরেন্দ্রনাথের। তার এই ধারণা ছিল যে, সন্ন্যাসীরা চোখ বুজে ধ্যান করেন, তাই তো তাঁদের মাথায় অমন জটা গজায়। সুতরাং চোখ বুজে বসে থাকলেই মাথায় কোন্ না জটা গজাবে? তাই সে অনেক সময় চোখ বুজে বসে থাকতো, আর মাকে জিজ্ঞেস করতো, মাথায় চুল কতখানি বাড়লো?

শৈশব থেকেই ধ্যান করার খেলাটা নরেন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিল। কিন্তু এ কেবল চোখ বুজে বসে থাকার খেলাই ছিল না। সে প্রায়ই ধ্যানে তন্ময় হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যেতেন। একবার সে তার বালক সাথীদের নিয়ে ধ্যান-ধ্যান খেলছিল। সকলেই চোখ বুজে ধ্যান করছে। হঠাৎ তার একজন সাথী চোখ মেলে দেখলো—এক বিষধর সাপ তাদের সামনে ফণা ধরে দাঁড়িয়ে। সাথীটি 'সাপ সাপ' বলে চীৎকার করে উঠলো। অন্যান্য সাথীরা চোখ মেলে তাকিয়ে সাপ দেখেই এক লাফে যে যেখানে পারলো গিয়ে আশ্রয় নিলো। তাদের চীৎকারে বাড়ির লোকজন যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এলো। সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ধ্যানমগ্ন বালক নরেন্দ্রনাথের কিন্তু হুঁশ নেই। সে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানহীন। সে এক অপরূপ দৃশ্য! এক শিশু-যোগী পদ্মাসন হয়ে ধ্যানমগ্ন আর তাঁর সম্মুখে ভীষণ এক বিষধর ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার ক'রে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিশ্চল! লোকজনের সমাগমে সাপ ফণা গুটিয়ে তার বিবরে গিয়ে প্রবেশ করলো। তখনও কিন্তু বালকের ধ্যান ভাঙলো না। শেষে যখন ধ্যান ভাঙলো, তখন সে বললো, সাপ, লোকজন, চেঁচামেচি, এসবের কথা কিছুই সে জানে না; সে কেবল এক অপার আনন্দে ডুবেছিল। (সহজেই ধ্যানস্থ হওয়ার ক্ষমতা ছিল নরেন্দ্রনাথের সহজাত। অতি শৈশবকাল থেকেই সে চোখ বুজলেই দেখতো তার দুই ভুরুর মধ্যে গোলাকার এই আলোকবিন্দু। রোজ শুয়ে ঘুমাবার আগে সে চোখ মুদলেই এই আলোকবিন্দু দেখতে পেতো। তারপর এই আলোকবিন্দু ক্রমেই বিস্তারলাভ করে তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তো।) ছোটবেলায় তার ধারণা ছিল, এ রকম সকলেরই হয়। কিন্তু একটু বয়স হ'লে সে তার বন্ধুদের প্রশ্ন করে জেনেছিল, তারা কেউ চোখ মুদলে এরকম আলোকবিন্দু দেখে না। সে তাতে অবাক হয়েছিলো। (পরবর্তী কালে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সঙ্গে যখন তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন রামকৃষ্ণ তাকে

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে চোখ মুদলে আলোকবিন্দু দেখে কিনা। স্বভাবসিদ্ধ যোগী নরেন্দ্রনাথের পক্ষে এ যে স্বাভাবিক, তা রামকৃষ্ণ সেদিন বলেছিলেন।)

নরেন্দ্রনাথ ছিল আজন্ম নেতা। শৈশব থেকেই তার খেলার সাথীরা তাকে নিজেদের নেতারূপে মেনে নিয়েছিল। বাড়ির সিঁড়িতে প্রায়ই তাদের খেলার বাদশাহী দরবাব বসতো। সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপটি ছিল রাজাসন। নরেন্দ্র সেখানে বসে তার পাত্রমিত্রদের নিয়ে দরবার করতো। সাথীদের মধ্যে বিবাদ বাধলে তার মীমাংসা করতো নরেন্দ্র। অপরাধীকে শাস্তি দিতে হ'লেও ভার পড়তো নরেন্দ্রের ওপর।

(বিচারবুদ্ধিতেও সে ছিল সাথীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কি ও কেন, এই প্রশ্ন সর্বদাই তাকে ব্যাকুল করতো। বাঁ হাতে গেলাস ধরে জল খেলে গেলাসে তো ভাত লাগে না, তবে গেলাস সকড়ি হয় কেন? সব মানুষই দেখতে সমান, তবে একজনেব ছোঁয়া খেলে জাত যায় না, আবার একজনের হাতে খেলে জাত যায় কেন? জাত কি? জাতের ব্যাপারটা বাল্যকাল থেকেই তাকে চিন্তিত ক'রে তুলেছিল।) বিশ্বনাথ দত্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। খ্রীষ্টান ইংরেজ ও মুসলমানদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাই জাত বাঁচাবার গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতেন না। এক পেশোয়াবী মুসলমান ছিলেন তাঁর মক্কেল। এই ভদ্রলোক বালক নরেন্দ্রনাথকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বাড়িতে এসেছেন শুনলেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ছুটতো, এবং তাঁর কোলে বসে হাতীর পিঠে ও উটের পিঠে ছড়ে পাঞ্জাব আফগানিস্থানের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের অপূর্ব কাহিনীগুলো প্রাণভরে শুনতো। শিশু নরেন্দ্রনাথকে সেদিনই মরু-গিরিকান্তার হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। এক-একদিন নরেন্দ্রনাথ ঝোঁক ধরে বসতো, সেও ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে ঐ সব জায়গা দেখতে যাবে। ভদ্রলোক হেসে বলতেন, 'তুমি আর দু আঙুল

বড় হলেই তোমাকে নিয়ে যাব।' নরেন ভ্রমণের লোভে রাতারাতি ছু-আঙুল বড়ো হয়েছে কিনা মাকে জিজ্ঞেস করতো। কিন্তু ছু-আঙুল বড় হতেও এতো সময় লাগে দেখে কিছুটা বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তো। এই ভদ্রলোক প্রায়ই নরেনকে সন্দেশ ও নানারকম ফল এনে খেতে দিতেন। নরেন তা স্বচ্ছন্দে খেতো। বাবা নিষেধ করতেন না। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা এই 'জাতনাশা সর্বনাশা' ব্যাপারটাকে সহজে মেনে নিতে পারতেন না। মুসলমানদের ছোঁয়া খাওয়া! তাঁরা এজন্য প্রায়ই নরেনকে শাসন করতেন। তাই জাত কি, ধর্ম কি,—জিনিসটা শিশু-নরেনের মনে বিচিত্র সব প্রশ্ন তুলতো।

বিভিন্ন জাতের মক্কেল আসতো বাড়িতে। তাই তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী বৈঠকখানার একদিকে কতকগুলি রূপোয় বাঁধানো হুঁকো সাজানো থাকতো। এক জাতের লোকের হুঁকোয় অন্য জাতের লোক হাত-ও দিতো না। অন্য জাতের হুঁকোয় তামাক খেলে নাকি জাত যায়! ভারী চিন্তিত হ'লো বালক নরেন্দ্রনাথ। জাতটা কেমন জিনিস? জাত কেমন ক'রে আসে, কেমন করে যায়, সেটা জানা চাই। একদিন ব্যাপারটা সে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইলো। সেদিন বৈঠকখানায় কেউ উপস্থিত নেই দেখে সে পরপর হুঁকোগুলি টানতে লাগলো। কই, তার তো কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না! আগে যেমনই ছিল তেমনই আছে। জাত তো কই যাচ্ছে না! এমন সময় হঠাৎ সেখানে বাবা এসে পৌঁছলেন। তিনি এই পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত পুত্রকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হুঁকো নিয়ে কি করছিস রে বিলে?' সঙ্গে সঙ্গে বিলে উত্তর দিলে, 'বাবা, আমি যদি জাত না মানি, তবে আমার কি হবে, তাই পরীক্ষা করে দেখছি।' বাবা হেসে এই আজন্ম-জিজ্ঞাসু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

(বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ছুটি মানুষ পাশাপাশি বাস করতো নরেনের বুকের ভেতর। কোন কিছুকে নরেন সহজে বিশ্বাস

করতো না। বিশ্বাস যে করবো, প্রমাণ চাই। প্রমাণ পেলে কিন্তু আর অবিশ্বাসের ঠাঁই থাকবে না সেখানে। প্রমাণ না পেলে কোন কিছুকে নরেনকে বিশ্বাস করায় এমন সাধ্যি ছিল না কারো। এই অবিশ্বাসের বলেই কুসংস্কারগুলিকে নরেন বাল্যকাল থেকেই ত্যাগ করতে শিখেছিলেন। এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি হয়েছিলেন রামকৃষ্ণভক্ত বিবেকানন্দ। জুজুর ভয়ে, ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হবার ছেলে ছিল না নরেন্দ্রনাথ। ভয় দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করা যেত না। তার প্রতিবেশী এক খেলার সাথীর (পরবর্তীকালে স্বামী বিরজানন্দ) বাড়ীতে একটি চাঁপাগাছ ছিল। ঐ গাছের ডালে পা বাধিয়ে মাথা আর হাত নিচের দিকে ক'রে দোল খাওয়া একটা প্রিয় খেলা ছিল নরেন্দ্রনাথের। বন্ধুর দাদু (রামরতন বসু) একদিন নরেনকে ঐরকম উঁচু ডালে দোল খেতে দেখে ভয় পেলেন। নরেনের পড়ে মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং গাছের ডালটি ভেঙে যাওয়া দুটো সম্ভাবনাই ছিল। তিনি জানতেন, নরেনকে ধমক দিয়ে কাজ হবে না। তাই বললেন, 'নরেন, ভাই, ও গাছে ব্রহ্মদত্যি আছে। ও গাছে চ'ড়ো না। ব্রহ্মদত্যি রেগে কখন কি ঘটান, কে জানে!' নরেন্দ্র নিরুত্তর রইলো দেখে বৃদ্ধ ভাবলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তিনি চ'লে যেতেই নরেন্দ্রনাথ আবার এক লাফে গাছে উঠলো। বন্ধু ভয় পেয়ে নিষেধ করতে লাগলো। নরেন্দ্রনাথ হেসে বললো, 'দূর বোকা! তোর ঠাকুরদা ভয় দেখাবার জন্যে মিছে গল্প ব'লে গেলেন। যদি ওই গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকতো, তবে অনেক আগেই সে আমার ঘাড় মটকে দিত।'

ভূত-প্রেতে যেমন নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না, তেমনি তার সাহসও ছিল অপরিসীম। যখন তার বয়স মাত্র ছ বছর, তখন সে একদিন সাথীদের সঙ্গে চড়কের মেলা দেখতে গিয়েছিল। মেলায় সে একটি মাটির শিবমূর্তি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছে, এমন সময় দেখলে, একটি ছোট্ট শিশু দলছাড়া হয়ে ফুটপাথ থেকে রাস্তায়

নেমে পড়লো, আর ঠিক সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি দুরন্ত বেগে এসে পড়লো। শিশুটি পালাবার পথ পেলো না। রাস্তার লোকেরা হৈ হৈ ক'রে উঠলো। বালক নরেন্দ্র নিমেষে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলো এবং মহাদেবের মূর্তিটিকে বগলে নিয়ে দ্রুতবেগে রাস্তায় নেমে শিশুটিকে চকিতে প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে টেনে সরিয়ে নিলো। মুহূর্ত বিলম্ব হ'লে যে শিশুটির দেহ যে ঘোড়ার পায়ে পড়ে মাংসপিণ্ডে পরিণত হ'তো তাতে কোন সংশয় ছিল না। ক্ষুদ্র বালকের এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও পরের জন্য বিপদ্‌বরণের দুরন্ত সাহস দেখে সকলেই বিস্মিত হ'লো। সকলে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগলো। ঘটনাব বিবরণ বাড়ির সকলের কানে গেল। মা ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'সকল সময় এমনি মানুষের মতো কাজ ক'রো বাবা।' অন্য কোনও মা হ'লে হয়তো ছেলের বিপদের কথা ভেবে ভয়ে মরতেন। কিন্তু ভুবনেশ্বরী ছিলেন স্বতন্ত্র ধাতু দিয়ে তৈরী। তাই তাঁর তিন পুত্রই—নরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র—বাংলাদেশের ইতিহাসে নিজ নিজ আসন ক'রে নিতে পেরেছিলেন।

(বাল্যকালে নরেন্দ্র যেমন ছিল সাহসী, তেমনি দুরন্ত। নানা রকম দুষ্টুমি-বুদ্ধি তার মাথায় যোগাতো। একবার সঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে গিয়ে পূজো-বাড়ির বারান্দা থেকে সে নিচে পড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে একটা পাথরে তার কপাল ফেটে যায়। এই ক্ষতের চিহ্নটি তার ডান ভুরুর ওপরে কপালে সারা জীবন ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরে একদা বলেছিলেন, ওই দুর্ঘটনাটা নরেনের শক্তিকে কিছুটা সংযত ক'রে দিয়েছিল। নইলে ও দুনিয়াটাকে তছনছ ক'রে দিতে পারতো।)

২
শিক্ষা ঃ কৈশোর

পাঁচ বছর বয়স হ'লেই যথানিয়মে নরেনের লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। তাঁকে পড়াবার জন্যে যে গৃহশিক্ষক ছিলেন, তিনি এই ছাত্রটিকে নিয়ে বেশ বিব্রত বোধ করতেন। তখনকার দিনে মার-ধোর ক'রে ছাত্রদের লেখাপড়া শেখাবার যে সনাতন রীতি চালু ছিল, গুরুমশায় তা প্রয়োগ করতে গিয়ে সুবিধা করতে পারলেন না। তাতে ছাত্র সহজে বিগড়ে বসতো। শেষ পর্যন্ত গুরুমশায় সনাতন রীতি ছেড়ে মিষ্ট কথায় ছাত্রটিকে বশে আনতে সচেষ্ট হলেন। তাতে কিছুটা সুফল দেখা দিল। দু বছব বাদে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে, নরেনের বয়স যখন আট, তখন তাঁকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবের মেট্রোপলিটান ইনস্টিট্যুশনে তখনকার নবম শ্রেণীতে (এখনকাব দ্বিতীয় শ্রেণীতে) ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'লো। বিদ্যালয়ে এসে নবেন শীঘ্রই সহপাঠীদেব দলপতি হয়ে উঠলো। তার বুদ্ধি ও মেধা সম্পর্কে শিক্ষকরা শীঘ্রই সচেতন হলেন। তবে এই অশান্ত বালকটি বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে কিছুটা অসুবিধা বোধ করতে লাগলো। সে অনেকক্ষণ একভাবে চুপচাপ বসে থাকতে পারতো না; একটানা বসে থাকাটা অসহ্য বোধ হ'লে সে কখনও কখনও উঠে দাঁড়াতো, কখনো বা ক্লাসের বাইরে চ'লে যেতো, আবার কখনও বসে বসে নিজের কাপড় বই ছিঁড়তো। তাকে নিয়ে তার বাপ-মার মতো শিক্ষকরাও প্রথমটা বিব্রত বোধ করতেন। শাসন করতে গেলে ফল হ'তো বিপরীত। তাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিষ্ট কথায় শান্ত করতে হ'তো।

নরেনের শরীর যেমন সুন্দর ও সুগঠিত ছিল, তেমনি শরীরে ছিল শক্তি। তার বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তির জন্যে সমবয়সীরা তাকে মেনে চলতো। খেলার সময় সামান্য বিষয় নিয়ে সাথীদের মধ্যে বিবাদ সে আদৌ পছন্দ করতো না; তাই বিবাদ ঘটলেই সে মীমাংসা ক'রে দিতো। সে মীমাংসা না মেনে উপায় ছিল না। তার ঘুষিকে দুষ্টু ছেলেরাও ভয় করতো। লাফানো, দৌড়ানো, মুষ্টিযুদ্ধ ও গুলিখেলা নরেন্দ্রের খুবই প্রিয় ছিল। টিফিনের ঘণ্টা পড়লে নরেন সবার আগেই ক্লাস থেকে খেলার মাঠে পৌঁছতো। শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে নরেনের নেতৃত্বে ছেলেরা ক্লাসেই খেলাধূলো শুরু ক'রে দিতো, অনেক সময় শ্রেণীকক্ষ হলদিঘাটে পরিণত হ'তো। শিক্ষক উপস্থিত থাকলেই বা কি! অনেক সময় ওদিকে শিক্ষকমশায় পড়াচ্ছেন, আর এদিকে নরেন তার দলবল নিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে। একবার এক শিক্ষক তাদের এই সমস্ত লক্ষ্য ক'রে নরেন ও তার সঙ্গীদের তিনি যা পড়াচ্ছিলেন, তা জিজ্ঞাসা করলেন। সকলেই নিরুত্তর রইলো। কিন্তু নরেনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ; সে গল্প করলেও তার মনের একাংশ শিক্ষকমশায়ের দিকেও ছিল। তাই সে শিক্ষকমশায় যা পড়াচ্ছিলেন তা হুবহু ব'লে গেল। অন্যরা বলতে না পারায় শিক্ষকমশায় তাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। নরেনও তাদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। শিক্ষকমশায় তাকে বসতে বললেন। সে বললে, না, তার সঙ্গীরা যদি দোষী হয়, তবে সেও দোষী, কারণ সে গল্প করছিল। শিক্ষকমশায় নরেনের সততা ও বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখে মুগ্ধ হলেন।

তখনকার দিনে শিক্ষকরা প্রায়ই ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি দিতেন। মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুশনে এক অত্যন্ত বদমেজাজী শিক্ষক ছিলেন। তিনি একদিন নরেনের এক সহপাঠীকে বেদম প্রহার করতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে বালক নরেন নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ হেসে ওঠে। তখন শিক্ষকমশায় তাঁর

শিকার ছেড়ে নরেনের ওপর এসে পড়েন, বেদম তাকে প্রহার করতে থাকেন এবং নরেন কখনও আর এভাবে হাসবে না, এই প্রতিশ্রুতি দাবি করেন। নরেন তাতে স্বীকৃত না হ'লে শিক্ষকমশায় তাকে আবার প্রহার করতে থাকেন এবং তার দুই কানে ধ'রে টেনে তাকে বেঞ্চির উপরে তুলতে চেষ্টা করেন। ফলে নরেনের একটি কানের গোড়া ছিঁড়ে যায় ও প্রচুর রক্তপাত ঘটে। নরেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বলতে থাকে, "আমার কান ধরে টানবেন না বলছি! খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবেন না!"

সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে বিদ্যাসাগর মশায় ক্লাসে এসে ঢোকেন। ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে নরেন বললে, সে এই স্কুলে আর পড়বে না এবং বই নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিদ্যাসাগর নরেন্দ্রনাথকে নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাকে নানাভাবে শান্ত করলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপারটির তদন্ত করলেন, এবং এই ধরনের ব্যাপার যাতে আর না ঘটে, সেজন্যে শিক্ষকদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন। মা ভুবনেশ্বরীদেবী বিদ্যালয়ে পুত্রের এই ধরনের নির্যাতনের কথা শুনে খুবই বিচলিত হলেন। বললেন, নরেন আর ও স্কুলে পড়বে না। কিন্তু নরেন পরদিন হাসিমুখে আবার স্কুলে গেল। তবে কানের ঘা-টা সারতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছিল।

ধীরে ধীরে নরেনের বয়স বাড়তে লাগলো। নরেন হয়ে উঠলো পাড়াপড়সিদের চোখের মণি। এমন সুকান্তি কিশোরকে ভালবাসতে কার না ইচ্ছে করে! বালক নরেন তার সঙ্গীদের নিয়ে শখের নাট্যাভিনয়ও শুরু করলো। বাড়ির পূজোর দালানে মঞ্চ বেঁধে কয়েকবার অভিনয় করলো তারা কয়েকটি নাটক। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের কাকা এতে বাধ সাধলেন। এইসব নাট্যামোদী বালকরা পাছে মাটি হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি মঞ্চ ভেঙে দিলেন। ফলে নরেন্দ্রনাথ ও সঙ্গীদের শখের নাট্যাভিনয় বন্ধ হ'লো। এখন নরেন বাড়ির উঠানে খুলে বসলো এক কুস্তির আখড়া, লেগে গেলো

শরীরচর্চায়। সঙ্গীরা সব এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু আবার তারা খুড়োমশায়ের কু-নজরে পড়লো। কারণ, নরেন্দ্রনাথের এক খুড়তুতো ভাইয়ের শরীরচর্চা করতে গিয়ে হাত ভেঙে গেল। খুড়োমশায় আখড়াটি বাড়ি থেকে বিদায় করলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন সদলবলে তার প্রতিবেশী নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় গিয়ে যোগ দিলো। এখানে নিয়মিত তাদের চললো শরীরচর্চা, সেই সঙ্গে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি, বাইচ ও অন্যান্য খেলাধূলা। কুস্তির প্রতিযোগিতায় একবার নরেন্দ্রনাথ প্রথম পুবস্কারও পেলো। এসব ব্যাপারেও কিছুদিন বাদে তার উৎসাহ কমে গেল। সে বাড়িতে কিছুদিন ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়ে সবাইকে আনন্দ দিলো।

কিছুদিন নরেন্দ্রনাথ রন্ধনশিল্পের দিকেও নজর দিলো। সে বন্ধুদের নিয়ে প্রায়ই চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করতো। এইসব চড়ুইভাতিতে সে-ই হতো প্রধান পাচক। রান্নার ব্যাপারে সে বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে একটু বেশি ঝাল দেওয়ার ঝোঁক ছিল তরকারিগুলিতে।

সেই সঙ্গে ছিল গান-বাজনা। গানবাজনাব শখটা সে পেয়েছিল পৈতৃকসূত্রে। তাব সুকণ্ঠ ছিল অনেক বিখ্যাত গায়কেরও ঈর্ষার বস্তু।

আর এক শখ ছিল বালক নবেন্দ্রনাথের—বেড়াবাব শখ। সময় এবং সুযোগ পেলেই সে কলকাতা ও কলকাতাব উপকণ্ঠে নানান্ জায়গায় বন্ধুদের নিয়ে ঘুবে বেড়াতো। একবার সে বন্ধুদের নিয়ে নদীপথে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবরুজে নবাবের চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরবার পথে তার এক বন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে নৌকায় বমি করে ফেললো। নৌকার মাঝিরা বমি সাফ ক'রে দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। নরেন্দ্রনাথ মাঝিদের ডবল ভাড়া দিতে চাইলো। কিন্তু তাতে তারা রাজী হ'লো না। ঘাটে নৌকো পৌছলে মাঝীরা ওদের নামতে দিলো না, নানা গালা-

গালি দিলো ও মারপিটের ভয় দেখালো। ঐ সময় তীর দিয়ে তুজন গোরা-সৈনিক যাচ্ছিল। নরেন্দ্রনাথ তাদের দেখতে পেয়ে এক লাফে তীরে নামলো এবং তাদের কাছে ছুটে গিয়ে তার বন্ধুদের মাঝিদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্মে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অনুরোধ করলো। গোরা সৈনিকরা এই সুদর্শন ছেলেটির অনুরোধ এড়াতে পারলো না। তারা নৌকোর কাছে গিয়ে ছেলেদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য মাঝিদের হাঁক দিয়ে বললো। মাঝিরা গোরা-সৈনিক দেখে ভয় পেয়ে গেল, ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে নৌকা নিয়ে পালালো। নরেনকে সৈনিক তুজনের খুবই ভালো লেগেছিল। তারা যাচ্ছিল থিয়েটার দেখতে। নরেনকেও তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্মে আমন্ত্রণ জানালো। নরেন সৈনিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো!

নরেনের বয়স তখন বছর এগারো হবে। ইংলণ্ডের যুবরাজ, পরবর্তীকালে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড, ভারতে এসেছিলেন। সেই উপলক্ষে ব্রিটিশ রণতরী 'সাইরাপিস' এসেছিল কলকাতা বন্দরে। শহরের বহু লোক পাস সংগ্রহ করে এই রণতরী দেখতে যাচ্ছিলো। নরেন্দ্রের বন্ধুরা নরেনকে তাদের জন্মে পাস সংগ্রহ করতে অনুরোধ করলো। পাস দিচ্ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী। সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার। নরেন একটা আবেদনপত্র নিয়ে সাহেবের আফিসে পৌছলে দারোয়ান তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চাইলো না। দশ-এগারো বছরের ছোকরাকে না দেওয়ারই কথা। নরেন কিন্তু সহজে হার মানবার পাত্র নয়। সে লক্ষ্য ক'রে দেখলো, দোতলার একটি ঘরে দলে দলে লোক ঢুকছে ও বার হয়ে আসছে। তা থেকে সে বুঝলো, নিশ্চয় উপরে সেই সাহেব আছেন, যাঁর অনুমতি দরকার। নরেন বাড়ির পেছনের দিকের একটা সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি উপরে উঠে গেল এবং একটা পর্দা সরিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়লো। সারি দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে দরখাস্তে সাহেবের সই নেওয়ার জন্মে। সেও সেই সারিতে

দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর তার পালা এলে সে তার দরখাস্তটি সাহেবের সামনে ধরে দিলো। সাহেব মুখ তুলে তাকালেনও না। সই ক'রে দিলেন। এবার নরেন্দ্রনাথ বিজয়গৌরবে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। দারোয়ান তো অবাক্। সে বললো, "তুমি ঢুকলে কেমন ক'রে?" নরেন হেসে বললো, "ম্যাজিক জানি।"

নবগোপাল মিত্রের আখড়ার ভারটা অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্র ও তার বন্ধুদের হাতে এসে পৌঁছেছিল। একবার তারা একটা খুব ভারী বারকে গর্তে গাড়বার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা তা নিজেরা কোনোমতেই পারছিল না। পাশে ভিড় জমে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগোচ্ছিল না। নরেন দেখলো একজন ইংরেজ নাবিক ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সে ইংরেজ নাবিকটিকে তাদের সাহায্য করবার জন্যে বললে। নাবিকটি সানন্দে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু বারটি তুলবার সময় হঠাৎ হাত ফসকে নাবিকটির গায়ে পড়লো এবং নাবিকটি আঘাতের ফলে অজ্ঞান হয়ে গেল। সাহেব চাপা পড়েছে দেখে যে যেখানে ছিল ভয়ে দৌড়ে পালালো। কেবল পালালো না নরেন ও তার দুই বন্ধু। নরেন দ্রুত নিজের কাপড় ছিঁড়ে নাবিকের ক্ষতস্থানটি বেঁধে দিলো। নাবিকের মুখেচোখে জল দিতে ও বাতাস করতে নাবিকের সংজ্ঞা ফিরে এলো। নরেন তাকে কোলে ক'রে কাছের একটি স্কুল-বাড়িতে নিয়ে এলো। দ্রুত ডাক্তার ডাকলো। তারপর নরেন ও তার বন্ধুরা করলো নাবিকের অবিরাম শুশ্রূষা। নাবিক সেরে উঠলো। কিন্তু নরেন ও তার বন্ধুরা জানতো, নাবিক সপ্তাহকাল অনুপস্থিত থাকায় তার নিশ্চয় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট। তাই তারা সংগ্রহ করলো কিছু টাকা। বিদায়কালে নাবিককে তারা এই টাকার তোড়াটি উপহার দিলো। নাবিক নরেন ও তার বন্ধুদের ব্যবহারে এতোই মুগ্ধ হয়েছিল যে, সে টাকা নিতে চাইল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নরেন ও তার বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে এই

স্নেহের দান সে নিতে বাধ্য হ'লো। শৈশবেই নরেন্দ্রনাথ জাতিভেদের গণ্ডি অতিক্রম করেছিলেন, কৈশোরে তিনি শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় এই বর্ণের গণ্ডিও অতিক্রম করেছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে তিনি একদিন যে রাখীবন্ধন করেছিলেন তার সূচনা হয়েছিল তাঁর কৈশোরেই।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ যখন থার্ড ক্লাসে (এখনকার অষ্টম শ্রেণীতে) পড়ছিলেন, তখন তাঁর বাবা মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে থাকতেন। ঐ সময় নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ কঠিন উদরাময়রোগে পীড়িত হন। দীর্ঘদিন এই রোগে ভুগে নরেন্দ্রনাথের শরীর অস্থিচর্মসার হয়ে যায়। হয়তো জলবায়ুর পরিবর্তন হলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, এই ভেবে তাঁর বাবা তাঁর পরিবারের সকলকে রায়পুর নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে রায়পুর পর্যন্ত রেলপথ ছিল না। এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হয়ে নাগপুর পর্যন্ত রেলে যাওয়া যেত। তারপর পনের-কুড়ি দিনের পথ গোরুর গাড়িতে চড়ে যেতে হ'তো। ওখানে নরেন্দ্রনাথ আগে কখনও যাননি, তবু তিনি সকলকে নিয়ে নির্ভয়ে রওনা হলেন। নাগপুর থেকে তাঁদের নিয়ে গোরুর গাড়ি চললো। এই অঞ্চলের নিসর্গ-শোভা কিশোর নরেন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে মুগ্ধ করলো। এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এর স্রষ্টার কথাও তাঁর মনে পড়লো। তিনি গোরুর গাড়িতে শুয়ে শুয়ে একদিন এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন যে, দীর্ঘপথ তাঁর গাড়ি কখন যে অতিক্রম ক'রে গেছে, তিনি জানতেও পারেননি! সম্ভবতঃ তাঁর এই প্রথম ভাব-সমাধি!

রায়পুরে এসে দ্রুত নরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'লো। রায়পুরে তখন স্কুল ছিল না। তাই বিশ্বনাথবাবু নিজেই ছেলেকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। পিতার এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্য নরেন্দ্রনাথের চরিত্রগঠনে খুবই সহায়ক হয়েছিল। এখানে বিশ্বনাথবাবুকে

মামলা-মোকদ্দমার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হ'তো না। তাই তিনি পুত্রের শিক্ষাকার্যের জন্যে যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন। তিনি স্কুলপাঠ্য বই ছাড়াও ছেলেকে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহী ক'রে তুললেন। এখানে বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে রায়পুরের শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায়ই আসতেন এবং দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এইসব আলোচনা নরেন্দ্রনাথ মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন। কখনও কখনও বিশ্বনাথ কিশোর পুত্রকে আলোচনায় যোগ দিতেও বলতেন। বয়সে বালক হ'লেও তাঁর মতামতগুলি প্রবীণরা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, অনেক সময় সেগুলির সারবত্তা দেখে মুগ্ধ ও আশ্চর্য হতেন।

প্রায় দু বছর রায়পুরে থেকে নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন তাঁর বয়স বছর ষোল হবে। কিন্তু তাঁর সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারা দেখে অনেকেরই তাঁকে বিশ বছরের যুবক ব'লে মনে হ'তো। তিনি আবার এসে মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুশনে ভর্তি হলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। থার্ড ক্লাস বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়বার সময়ই তিনি স্কুল ছেড়ে রায়পুর চলে গিয়েছিলেন। তাই এই অল্প সময়ের মধ্যে দু বছরের পড়া শেষ করা কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু এই দুই বৎসরে তার বুদ্ধিবৃত্তির যে বিকাশ হয়েছিল, তাতে পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই প্রথম বিভাগে পাস করলেন। ঐ বছর একমাত্র তিনিই ঐ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে পাস করেছিলেন।

যে বাগ্মিতা স্বামী বিবেকানন্দকে একদিন বিশ্ববিশ্রুত করেছিল, তারও সূচনা ঘটেছিল এই ছাত্রজীবনেই। নরেন্দ্রনাথ যখন মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুশনে পড়তেন, তখন একজন প্রবীণ শিক্ষক অবসর নিচ্ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্কুলের ছেলেরা তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা করলো। ঐ বিদায়-সভায় তখনকার দেশবরেণ্য জননেতা ও সুবিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিদায়-সম্ভাষণ কে জানাবে, তা ভেবে ছাত্ররা চিন্তিত হ'লো। শেষে সকলেই নরেন্দ্রনাথকে এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করবার জন্যে অনুরোধ জানালো। নরেন্দ্রনাথ সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে সুন্দর ইংরেজীতে সুমধুর কণ্ঠে শিক্ষকমশায়কে ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। তিনি বক্তৃতা শেষ করলে সুরেন্দ্রনাথ নিজে উঠে তাঁর বক্তৃতার প্রশংসা করলেন। সেকালে ষোল-সতের বছরের একটি কিশোরের পক্ষে সুবিখ্যাত বাগ্মী ও জননেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা কম সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের কথা ছিল না।)

৩

কলেজ : শিক্ষা : পথের সন্ধান

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস ক'রে নরেন্দ্রনাথ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন, তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন পড়বার পর হঠাৎ তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। ম্যালেরিয়ায় অনেকদিন ভোগার ফলে তাঁকে সে বছর প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়তে হ'লো। পরবৎসর তিনি জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইনস্টিট্যুশনে (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজে) ভর্তি হয়ে এফ. এ. পড়তে লাগলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ ছাত্র ও অধ্যাপকদের কাছে নিজ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রিয় হয়ে উঠলেন। নরেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ দেহ ও মন, বয়সের তুলনায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও তর্কশক্তি, তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও সংগীতের পারদর্শিতা সকল ছাত্রেরই ঈর্ষার বস্তু ছিল। ফলে কলেজে তাঁর বন্ধু ও অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা ছিল প্রচুর। (নরেন্দ্রনাথ ছিলেন যুক্তিবাদী ও শক্তিবাদী। বালক ও যুবকদের লজ্জানম্র মেয়েলী হাবভাব তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। বিলাসদ্রব্যাদি ব্যবহারও তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। যুক্তিহীন বিধিনিষেধ মেনে চলাকে তিনি এক প্রকার দুর্বলতা ব'লেই মনে করতেন। বলিষ্ঠ মনের মতো বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী হওয়া যে একান্তই দরকার, তা নরেন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।) ডন-বৈঠক, কুস্তি ও ক্রিকেট খেলা তাঁর প্রিয় ছিল। আমোদ-প্রমোদের নূতন উপায় উদ্ভাবনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অন্ধের মতো সকল বিধিনিষেধ মানবার বিরোধী হওয়ায় অনেক সময় তাঁর কাজ ও আচরণ অনেকের কাছে উচ্ছৃঙ্খলতা

ব'লে মনে হ'তো। কেউ তাঁর কোন নিন্দা করছে শুনলে তা তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ছিলেন, তাই স্বল্প সময় প'ড়েই নির্দিষ্ট পাঠ তৈরি ক'রে নিতেন। বাকী সময় বাইরের বই পড়তেন, গানবাজনা, খেলাধূলো, হাস্যপরিহাস প্রভৃতি করতেন। ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর পড়াশোনা ছিল যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। এফ. এ. পরীক্ষার আগেই মিল, হিউম, হার্বার্ট স্পেন্‌সর প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের লেখা বই খুব ভালোভাবেই পড়েছিলেন। পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন তাঁর বন্ধু। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় দুজনে ছিলেন দুজনের সমকক্ষ। আলোচনা-সভায় এঁরা প্রায়ই অংশ নিতেন। বহু সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণে নরেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব দেখাতেন, তা উপস্থিত সকলকেই বিস্মিত করতো। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইনস্টিট্যুশনের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম হেস্টি সাহেব। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও সুপণ্ডিত। তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র নরেন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—"He is an excellent philosophical student. In all the German and English universities there is not one student so brilliant as he is." হেস্টি সাহেবের মন্তব্য যে কতো সত্য ছিল, তা ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিঃসংশয়ে সুপ্রমাণিত করেছে।

দেকার্তে, হিউম, মিল, বেন, ডারুইন, স্পেন্সর, হেগেল প্রভৃতির রচনা নরেন্দ্রনাথ যতোই পড়তে লাগলেন, ততোই তিনি চিন্তার অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেললেন। ওইসব দার্শনিকদের পরস্পর-বিরোধী মতবাদ তাঁকে বিভ্রান্ত, অস্থির ও অশান্ত ক'রে তুললো। প্রকৃত সত্য কি, তা জানবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। যদি সত্যের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়, এই আশায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে দার্শনিক

আলোচনার জন্যে যেতেন। কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতা তাঁকে মুগ্ধ করলেও বাল্যবিবাহ নিয়ে যখন ব্রাহ্মসমাজে মতভেদ দেখা দিল এবং কেশববিরোধী ও বাল্যবিবাহবিরোধীরা যখন নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ তাতেই যোগ দিলেন। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে নববিধান সমাজ বেশী অগ্রসর ও সংস্কারমুক্ত ছিল, তাই নরেন্দ্রনাথ নববিধান সমাজেরই সমর্থক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তিনি ব্রাহ্মসংগীত গাইতেন, উপাসনায় যোগ দিতেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে অসংখ্য আধ্যাত্মিক প্রশ্ন যে তুমুল ঝড় তুলেছিল, তার মীমাংসার কোন উপায় মিললো না। নরেন্দ্রনাথের অশান্ত চিত্ত আরও অশান্ত হয়ে উঠলো। প্রকৃত সত্য কি? প্রকৃত পথ কি? কে সেই সত্য-পথের সন্ধান দেবে?

(নরেন্দ্রনাথ এফ. এ. পড়বার সময়ে কলেজে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শোনেন। সেদিন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক অনুপস্থিত ছিলেন। তাই অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টি ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। পড়াচ্ছিলেন কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের Excursion কবিতা। এতে কবি বলছেন, তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মাত্র মুহূর্তের জন্যে ভাবসমাধির (trance) অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এই trance বা ভাবসমাধি কি, তা ছাত্ররা বুঝতে না পারলে তিনি বুঝিয়ে বললেন, "মনের বিশুদ্ধতা থাকলে এবং কোনও বস্তু সম্পর্কে একান্ত মনোনিবেশ ঘটলে এইরকম অভিজ্ঞতা ঘটে। তবে, বিশেষতঃ আজকাল, এ অভিজ্ঞতা সচরাচর দেখা যায় না। আমি মাত্র এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যিনি এই স্বর্গীয় অবস্থা লাভ করতে পারেন। তিনি হলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস। ভাবসমাধি জিনিসটা কি, তা তোমরা দক্ষিণেশ্বর গেলে দেখতে ও বুঝতে পারবে।")

(এফ. এ. পড়বার সময়ই, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণদেবকে চাক্ষুষ দেখেন।/ চার-পাঁচ বছর

ধরে নরেন্দ্রনাথ ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের কাছে কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত শিখছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমধুর। তিনি কণ্ঠ-সংগীতে ও যন্ত্রসংগীতে খুবই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি আহম্মদ খাঁর কাছে বহু হিন্দী, উর্দু ও ফারসী গান শিখেছিলেন, সেগুলির বেশির ভাগই ছিল ভক্তিমূলক। তাই গায়ক হিসাবেও পল্লীতে তাঁর খুবই জনপ্রিয়তা ছিল। সিমলা পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন নিজের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আসেন। এই উপলক্ষে একটি উৎসবের আয়োজন হয়। সেখানে সুকণ্ঠ গায়করূপে নরেন্দ্রনাথের ডাক পড়ে। নরেন্দ্রনাথ সেখানে ভক্তিমূলক কয়েকটি বাংলা গান করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের গান শুনে মুগ্ধ হন, এবং নরেন্দ্রনাথকে একবার দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে যান।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর নরেন্দ্রের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তাই তিনি এফ. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে স্বাস্থ্যোদ্ধারের ইচ্ছায় কিছুদিন গয়া বেড়াতে গিয়েছিলেন। পরীক্ষার কয়েক মাস আগে তিনি গয়া থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং এফ. এ. পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকেন। তাই রামকৃষ্ণের সস্নেহ আমন্ত্রণের কথা প্রায় ভুলেই যান।

পরীক্ষা শেষ হ'লে তাঁর বাবা তাঁকে বিয়েব জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু শৈশবেই যে বিবাহবিতৃষ্ণার বীজ নরেনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা এতোদিনে আরও দৃঢ়মূল এবং পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি বিয়েতে তীব্র আপত্তি জানালেন। ছেলের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বিশ্বনাথবাবুর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। তাই তিনি নিজের মতামতকে ছেলের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তাকে বুঝিয়ে রাজী করাবার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য নিলেন। ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন বিশ্বনাথবাবুর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। তিনি বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একজন গৃহী ভক্ত। তিনি একদিন নরেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ের বিষয়ে আলোচনা করলেন। নরেন তাঁর কাছে নিজের মনের কথাগুলি খুলে বললেন। তিনি চান সত্যের সন্ধানে জীবন নিয়োগ করতে। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি? কে এই সত্যের সন্ধান দিতে পারে? পাশ্চাত্য দর্শন তাঁকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে নি। ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে সত্যের সন্ধান দিতে পারেনি। তিনি চিন্তার অরণ্যে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। তাঁর আত্মার এই অশান্ত অস্থিরতা কে প্রশমিত করতে পারে?

নরেন্দ্রের কথাগুলি শুনে রামবাবু তাঁকে বিয়ের বিষয়ে পীড়াপীড়ি করলেন না। তাঁকে বললেন, তিনি যদি প্রকৃত সত্যের সন্ধান চান, তবে তিনি ব্রাহ্মসমাজে না ঘুরে বা পাশ্চাত্য দর্শনের পুঁথির মধ্যে আটক না পড়ে যেন একবার দক্ষিণেশ্বর যান। শ্রীরামকৃষ্ণ কালী-সাধক। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সুপরিচিত, তাছাড়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। তিনি দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী। তাই রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর খুব একটা উৎসাহ ছিল না। কিন্তু নিজের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে এবং রামবাবুর পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যেতে রাজী হলেন। তারপর কয়েকদিন বাদে দু-চারজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখে ঠাকুর খুব খুশী হলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে এমনভাবে আলাপ করতে লাগলেন, যেন তাঁদের কতোদিনের পরিচয়। তারপর তিনি নরেনকে গান শোনাতে বললেন। গান শেষ হ'লে ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর হাত ধ'রে তাঁকে উত্তরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন ও দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ মনে করলেন, ঠাকুর সম্ভবতঃ তাঁকে ধর্মসাধনা সম্পর্কে একান্তে দু-একটি উপদেশ দেবেন। তা নয়। তাঁর দুই চক্ষু জলে ভরে এলো। তিনি নরেনের হাত দুখানি ধ'রে বলতে লাগলেন, "তুই এতোদিন কেমন

করে আমায় ভুলে ছিলি? তুই আসবি বলে যে আমি কতদিন ধরে পথ চেয়ে আছি! বিষয়ী লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। আজ আমি তোর মতো যথার্থ ত্যাগীর মুখে দুটো কথা শুনে শান্তি পাব!" ঠাকুর কাঁদতে লাগলেন। নরেনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ ধরনের অভিজ্ঞতার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। ঠাকুর হাতজোড় ক'রে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বলতে লাগলেন, "জানি, প্রভু, তুমি আর কেউ নয়, তুমি সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি নররূপী নারায়ণ! তুমি জীবের দুঃখনিবারণের জন্যে ধরায় এসেছ!")

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, ইনি কি পাগল! আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্র, আমার সম্বন্ধে এ কি অদ্ভুত প্রলাপ! কিন্তু নরেন্দ্র মুখে কোনও প্রতিবাদ করলেন না। চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বললেন, "দাঁড়া, তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।" ব'লে তিনি ও ঘরে চ'লে গেলেন এবং সন্দেশ, মিছরি ও দুধের সর নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর নিজ হাতেই নরেনকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। নরেন বাধা দিয়ে বললেন, "না না, আমায় দিন্। আমার বন্ধুরা আছে, সবাই ভাগ ক'রে খাব।" ঠাকুর বললেন, "তারা পরে খাবে'খন।" ব'লে তিনি জোর ক'রে খাবারগুলি নরেনকে খাইয়ে দিলেন। তারপর নরেনের হাত ধ'রে কাকুতি ক'রে বললেন, "আবার আসবি বল্। কথা দিয়ে যা। একা আসবি। দেরি করিস নে যেন।"

নরেনকে সায় দিতে হ'লো। ঠাকুর আবার এসে তাঁর ভক্তদের মধ্যে বসলেন এবং খুব সহজভাবেই আলাপ করতে লাগলেন। নরেন এখন তাঁর মধ্যে উন্মত্ততার বা অপ্রকৃতিস্থতার কোনও লক্ষণই দেখতে পেলেন না। তাই ঠাকুরের কথাগুলি তাঁর কানের মধ্যে বাজতে লাগলো। তাঁর কথাগুলিকে তিনি সত্য বলে বিশ্বাস না করলেও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না।

নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আসবার বহু পূর্বেই ঠাকুর তাঁর সমাধিস্থ অবস্থায় যা দেখেছিলেন, তার বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছিলেন :

"একদিন আমি সমাধিতে দেখলাম, আমার মন যেন এক জ্যোতির্ময় পথ ধ'রে ক্রমাগত ঊর্ধ্বলোকে উঠে যাচ্ছে। শীঘ্রই তা নক্ষত্রলোক পার হয়ে যেন এক সূক্ষ্মতর ভাবরাজ্যে গিয়ে ঢুকলো। আমার মন যখন ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে উঠছিল, তখন আমি পথের দু পাশে দেবতাদের ভাবময় মূর্তিগুলি দেখতে লাগলাম। তারপর আমার মন ঐ রাজ্যের বহিঃসীমায় গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে এক আলোর প্রাচীর যেন খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক ক'রে রেখেছে। সেই প্রাচীর ভেদ ক'রে আমার মন এক অশরীরী রাজ্যে প্রবেশ করলো। এখানে দেবতারা পর্যন্ত উঁকি দিতেও ভয় পান, তাঁরা এই রাজ্যের অনেক নীচে বসতে পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন। পরমুহূর্তে আমি দেখলাম, যেন সাতটি মহা ঋষি সেখানে সমাধিস্থ অবস্থায় ব'সে আছেন। আমার মনে হ'লো, এঁরা জ্ঞানে ও পবিত্রতায়, ত্যাগে ও প্রেমে কেবল মানুষকে নয়, দেবতাদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। আমি অভিভূত হয়ে এঁদের মহত্ত্বের কথা ভাবছি, এমন সময় দেখলাম, সেই অখণ্ড ও ভেদবিরহিত জ্যোতির্ময় লোকের এক অংশ ঘনীভূত হয়ে এক দিব্য শিশুতে পরিণত হ'লো। শিশুটি একজন ঋষির কাছে এলো, সুন্দর সুকোমল দুই বাহু দিয়ে ঋষির গলা জড়িয়ে ধরলো এবং সুমধুর কণ্ঠে তাঁকে ডেকে তাঁর সমাধি ভাঙতে চেষ্টা করলো। শিশুর সেই জাদুস্পর্শে ঋষি তাঁর অতিচেতন সমাধিস্থ অবস্থা থেকে জেগে উঠলেন এবং অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব শিশুর পানে তাকালেন। তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখে মনে হ'লো যে, ঐ শিশু তাঁর হৃদয়ের মণি। মহানন্দে সেই অদ্ভুত শিশু তাঁকে বললো, "আমি নিচে যাচ্ছি। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।" ঋষি নীরব রইলেন, তাঁর স্নেহময় মুখমণ্ডলে সম্মতি ফুটে উঠলো। তিনি শিশুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে

থাকতে আবার সমাধিস্থ হলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তাঁর শরীর ও মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পৃথিবীর দিকে নামতে লাগলো। আমি নরেনকে দেখেই চিনেছিলাম, ও সেই ঋষি।”)

আর একবার এক দিব্যদর্শনে রামকৃষ্ণ দেখেছিলেন,(একটি জ্যোতির্ময় রেখা আকাশপথে বারাণসী থেকে কলকাতার দিকে আসছে। তা দেখে তিনি মহানন্দে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, “মা আমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছে। সে আমার কাছে আসছে।”)

নরেন্দ্রকে দেখে রামকৃষ্ণ তাই এখন আকুল হয়েছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তা জানতেন না। ঠাকুরের কথাগুলিকে উন্মাদের প্রলাপোক্তি ব'লে মনে হ'লো। কিন্তু যাঁর সংস্পর্শে এসে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরাও মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁকে উন্মাদ ব'লে মনে করতেও নরেনের সংকোচ হ'লো। তিনি এক সমস্যায় পড়লেন। তিনি স্থির করলেন, তিনি এঁর সান্নিধ্যে এলে নিজেকে সতর্ক রাখবেন এবং ভালোরকমে যাচাই না ক'রে এঁকে ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষ ব'লে কখনও মেনে নেবেন না। নরেন্দ্রনাথ নিজেকে জাদুশক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী থেকে দূরে রাখতেও চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে তিনি সফল হলেন না। তিনি এই শিশুর মতো সরল, নিরভিমান ও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্যে মনের মধ্যে ক্রমাগত একটি ব্যাকুলতা বোধ করতে লাগলেন। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কি শক্তি যেন তাঁকে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে টেনে নিয়ে গেল।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরও আমরা দেখি, নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নিয়মিত যোগ দিচ্ছেন। তখনও দেব-দেবীতে অবিশ্বাস তাঁর অটুট আছে। রাখালচন্দ্র ঘোষ (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নরেন্দ্রের সঙ্গে একযোগেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের আগেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে 'পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং সর্বদা

কাছে কাছে রাখতেন। একদিন নরেন রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে গিয়ে প্রণাম করতে দেখে ঠাকুরের সামনেই তাঁকে মিথ্যাচারী ব'লে তিরস্কার করলেন। কারণ, তখনও রাখাল ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে কেবল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। নরেন্দ্রের তিরস্কারে বালক রাখাল লজ্জিত হলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তার পক্ষ সমর্থন ক'রে বললেন, "ওর যদি সাকারে ভক্তি হয়, ও কি করবে? তোমার ভালো না লাগে, তুমি ক'রো না। তা ব'লে অপরের ভাব নষ্ট করবার কি অধিকার তোমার আছে?"

রামকৃষ্ণ ধর্মের সকল পথেরই পথিক ছিলেন; যত মত তত পথ, এই আদর্শ অনুযায়ী তিনি তাঁর শিষ্যদের স্ব স্ব পথে অগ্রসর হ'তেই সাহায্য করতেন। (নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানই নরেন্দ্রের ভালো লাগতো। তাই তাঁকে সেইভাবেই তিনি উপদেশ দিতেন। সাকার বিশ্বাস বা উপাসনায় তিনি জোর ক'রে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেননি। কালক্রমে নরেন্দ্রনাথ সাকারকে স্বতঃই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পরিচয়ের ও আলাপের পরও তিনি সহসা রামকৃষ্ণকে নিজ গুরুরূপে বরণ করেননি। তবে পরিচয়ের পর থেকে তাঁর মধ্যে ঈশ্বর-চিন্তা প্রবলতর হয়েছিল, প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তাঁর ব্যাকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল।)

ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই রামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম নেতা বিজয় গোস্বামী রামকৃষ্ণের প্রভাবে নিজ ধর্মমত পরিবর্তন ক'রে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করায় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম-নেতাই রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত বন্ধ ক'রে দিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরাও যাতে রামকৃষ্ণের কাছে না যান, সেজন্য সচেষ্ট হলেন। তাঁরা রামকৃষ্ণবিরোধী প্রচারও শুরু করলেন। নরেন্দ্র যে রামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েছেন, তা শিবনাথ জানতেন। তাই তিনি নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে

যেতে নিষেধ ক'রে দিলেন, বললেন, "ও সব সমাধি, ভাব, যা কিছু দেখ, সব স্নায়ুর দুর্বলতা মাত্র। অত্যধিক দৈহিক কৃচ্ছ্রতা অভ্যাসের ফলে পরমহংসের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।" শিবনাথের কথাগুলি নরেন্দ্র নিরুত্তরে শুনলেও তাঁর মনের মধ্যে যে ঝড় বইছিল তা আরো প্রবল হ'লো মাত্র। রামকৃষ্ণকে জানবার জন্যে, তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্যে ব্যাকুলতা আরও বাড়লো। তিনি ঈশ্বরলাভের জন্যে দুঃসহ আকুলতা বোধ করতে লাগলেন। এই সময়ে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গঙ্গাবক্ষে একখানি বোটে বাস করতেন। তিনি একদিন ঈশ্বর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন এমন সময় বোটের কক্ষদ্বারে প্রবল করাঘাত শুনে বাইরে এলেন। দেখলেন, তাঁর সম্মুখে নরেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। বাত্যাবিক্ষুব্ধ পাখীর মতো এলোমেলো ভাব তাঁর সর্বশরীরে, চোখে উন্মাদের মতো তীব্র দৃষ্টি। মহর্ষি কোন কথা বলবার বা প্রশ্ন করবার আগেই তিনি ব'লে উঠলেন, "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?" বিস্ময়-বিমূঢ় মহর্ষি কি যেন উত্তর দিতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি অবশেষে কেবলমাত্র বললেন, "নরেন, তোমার চোখ দেখে বুঝেছি, তুমি যোগী। তুমি যোগাভ্যাস কর, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হবে।"

কিন্তু নরেন এই উত্তর চান নি। মহর্ষির মতো ব্যক্তিও যদি ঈশ্বরদর্শন না ক'রে থাকেন, তবে ঈশ্বরদর্শনের উপায় কি? ব্রহ্ম একেশ্বর হলেও তিনি যদি থাকেন, তবে ভক্তের ডাকে দেখাই বা দেবেন না কেন? তবে কি সব অলীক কল্পনা, মিথ্যা! নরেন্দ্র-নাথের বুকের মধ্যে যে ঝড় বইছিল, তা ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে যাবেন। কিন্তু ভয় পেলেন, যদি তিনিও 'না' বলেন? কেউ যদি তাঁকে না দেখে, তবে বা এই অলীকের পেছনে ছুটে লাভ কি?

নরেন্দ্রনাথ অস্থিরচিত্তে দক্ষিণেশ্বরে ছুটলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে দেখামাত্র প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?"

নরেন্দ্র রামকৃষ্ণের মুখে বিস্ময়ের লেশমাত্র দেখলেন না। প্রশ্ন শুনে তাঁর মুখ অপূর্ব মৃদুহাস্যে পূর্ণ হ'লো। তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে বললেন, "দেখেছি। এই তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট ক'রে দেখেছি।" এই উত্তরের জন্যই তিনি ব্যাকুল হয়ে এতো পথ ছুটে এলেও উত্তরে তিনি স্তম্ভিত হলেন। তাঁর বিস্ময় ততোধিক বাড়িয়ে রামকৃষ্ণ আবার বললেন, "তুই যদি দেখতে চাস, তোকেও দেখাতে পারি। তবে আমি যা বলব, তা করতে হবে।" ঠাকুরের মুখমণ্ডলের অপূর্ব শান্তি ও প্রত্যয়ভরা স্থির মধুর কণ্ঠস্বরে নরেন্দ্র চমকিত হলেন। এর মধ্যে যে কোন সংশয় নেই, কোন প্রতারণা নেই, তা বুঝলেন। তাঁর হৃদয়ের ঝড় হঠাৎ প্রশমিত হ'লো। তবে তিনি বুঝলেন,(সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ঈশ্বরদর্শন পেতে হ'লে এই অর্ধোন্মাদ গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে কঠোর সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে হবে।) ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত নরেন্দ্র হঠাৎ রামকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করতে পারলেন না। তবে তিনি অনেকখানি শান্তচিত্তে সেদিন বাড়ি ফিরে এলেন। এর পরও তিনি নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যেতে লাগলেন।

এরপর অনেকদিন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাননি। এদিকে ঠাকুর তাঁকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সেদিন ছিল রবিবার। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নরেন্দ্র নিশ্চয় উপস্থিত থাকবেন, এই ভেবে ঠাকুর সন্ধ্যাবেলা ব্রাহ্মসমাজের সভায় উপস্থিত হলেন। আচার্য তখন বেদী থেকে ভগবৎ-কথা বলছিলেন। তা শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণ ভাববিভোর হয়ে বেদীর কাছে এগিয়ে গেলেন। নরেন্দ্র এখানে ঠাকুরের আগমনের কারণ অনুমান ক'রে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের প্রতি কেউ কোনও সৌজন্য দেখানো দূরের কথা, তাঁদের অনেকেই অবজ্ঞা প্রকাশ করতে লাগলেন। এই সময়ে হঠাৎ ঠাকুর সমাধিস্থ হ'লে নরেন্দ্র তাঁর পতনোন্মুখ দেহকে ধ'রে ফেললেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখবার জন্যে অনেকে

আগ্রহী হয়ে উঠলে সভায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। এই সময় সমাজের কর্তৃপক্ষ একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করলেন, সভাকক্ষের গ্যাসের আলো নিবিয়ে দিলেন। কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলো। নরেন্দ্র বহুকষ্টে ঠাকুরকে উপাসনামন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে আনলেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুরের প্রতি ব্রাহ্ম-সমাজের এই আচরণ নরেন্দ্রকে অত্যন্ত পীড়া দিল। আজ তাঁর জন্যেই ঠাকুর এভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত হলেন জেনে তিনি সেই থেকে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করলেন।

রামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে ধর্মীয় প্রতিভা দেখেছিলেন, তাই তাঁকে এমনভাবে নরেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ করেছিল। এই আকর্ষণ নরেন্দ্রও দীর্ঘকাল এড়াতে পারলেন না। তবে তিনি এতো সহজে ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। তিনি রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ মানবের হিতে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক ঋষি, ইত্যাদি রামকৃষ্ণের কথাগুলি মোটেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। বরং এগুলিকে অনেক সময় তাঁর পাগলামি ব'লেই মনে হ'তো। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত ছিলেন। অনেক ভক্ত তাঁর বাম পাশে বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতিও ছিলেন। রামকৃষ্ণ হঠাৎ ভাবস্থ হয়ে তাঁদের দেখতে লাগলেন। তারপর কেশবচন্দ্র, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিরা বিদায় নিলে তিনি ভক্তদের বললেন, "দেখলাম, কেশব যে শক্তিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তেমন আঠারোটা শক্তি রয়েছে নরেনের মধ্যে। কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের পিদিম জ্বলছে, আর এর মধ্যে আছে জ্ঞানসূর্য।"

এই প্রশংসায় নরেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হলেন। বললেন, "কী যে বলেন আপনি! কোথায় দেশবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন,

আর কোথায় একটা কলেজের ছোকরা নরেন দত্ত! লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বলবে যে!" ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলভঙ্গিতে মৃদু হেসে বললেন, "তা কি করবো বল্? মা যে দেখিয়ে দিলে। তাই বলছি।" নরেন্দ্র বললেন, "মা দেখিয়ে দিলে, কি আপনার খেয়াল হ'লো, তা কেমন ক'রে বুঝবো? আমার তো ওরকম হ'লে খেয়াল দেখেছি ব'লেই বিশ্বাস হ'তো।"

একদিন নরেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, তিনি ঘুমাবার আগে তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্যে আলোক-বিন্দু দেখতে পান কি না! নরেন্দ্র স্বীকার করলে ঠাকুর বললেন, "তা তুই দেখবি বৈকি! ধ্যানসিদ্ধ না হ'লে তো কেউ অমনটি দেখতে পায় না। তুমি যে জন্ম থেকে ধ্যানসিদ্ধ পুরুষ।" একদিন তিনি ভক্তদের সম্মুখে নিজের দেহ দেখিয়ে বললেন, "এর মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা শক্তি; আর নরেনের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা পুরুষ; ও আমার শ্বশুরঘর।" নরেন সম্পর্কে কেউ নিন্দা করলে ঠাকুর তাকে তিরস্কার করতেন, বলতেন, "ও কি করছিস? শিবনিন্দা করছিস যে!" তিনি ভক্তদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলতেন, "তোমরা কেউ নরেনের বিচার ক'রো না। তোমরা ওকে পুরোটা বুঝবে না।" একবার এক ভক্ত এসে ঠাকুরকে বললেন, নরেন অসৎ সঙ্গে মিশছে। ঠাকুর তাকে তিরস্কার ক'রে বললেন, "তা সত্যি হ'তে পারে না। মা আমাকে বলেছে, ও কখনও অসৎ পথে যেতে পারে না। অমন কথা যদি ফের বলবি, তবে তোর মুখ দেখব না।"

ঠাকুর নরেন্দ্রের প্রতি যেরকম স্নেহ দেখাতেন, তাতে নরেন্দ্র একদিন ঠাকুরকে ঠাট্টা ক'রে বললেন, "পুরাণে আছে, ভরত রাজা তাঁর প্রিয় হরিণটির কথা সর্বদা ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পর হরিণ হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি আমার জন্য যে রকম করেন, তাতে আপনারও সেই দশা না হয়।" নরেন্দ্রের এই কথা শুনে ঠাকুর শিশুর মতো ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "তাই তো রে! আমি

যে না দেখে থাকতে পারিনে! আমার কি হবে?" তখুনি তিনি মার কাছে ছুটে গেলেন, কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, "যা শালা, তোর কথা আমি শুনবো না। মা বললে, তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ওকে ভালোবাসিস; যেদিন ওর ভেতর নারায়ণকে দেখতে পাবি না, সেদিন ওর মুখ দেখতে পারবি না।"

কিন্তু স্নেহে, সারল্যে ভুলবার পাত্র নন নরেন্দ্র। এই মানুষটিকে তিনি ভালোবাসলেও ইনিই প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারবেন, এ বিশ্বাস তবু নরেন্দ্রর হচ্ছে না। কয়েকদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন নি। হঠাৎ যেন একটি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন। তিনি ঐ সুদীর্ঘ পথ হেঁটে গিয়ে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বরে। গিয়ে দেখলেন, ঠাকুর একটি তক্তপোষে বসে আছেন—যেন তাঁরই প্রতীক্ষা করছেন। নরেন্দ্রকে দেখে বললেন, "আয়! আয়! তোর জন্যে ব'সে আছি সেই কখন থেকে।"

নরেন্দ্রনাথকে তিনি পাশে বসতে বললেন। নরেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে দূরে বসলেন। ঠাকুরের স্নেহের আতিশয্যটাকে তাঁর কেমন যেন পাগলামি ব'লে মনে হয়। ঠাকুর একটু একটু ক'রে কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর তাঁর ডান পা-খানি চকিতে রাখলেন নরেনের দেহের ওপর। মুহূর্তে যেন বিশ্বসংসার ওলটপালট হয়ে গেল নরেনের কাছে। সমস্ত পৃথিবী চোখের সামনে ঘুরতে লাগল, যা কিছু দৃশ্যমান, তা যেন অনন্ত সত্তায় বিলীন হয়ে গেল। নরেন্দ্র অনুভব করলেন, তিনি একা, শেষে তাঁর সেই একাকিত্বও যেন বিলীন হ'তে চললো। তিনি ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "এ আপনি আমার কি করলেন! আমার যে বাপ-মা আছেন!" ঠাকুর নরেনের বুকে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের সম্বিত ফিরে এলো। তিনি দেখলেন, ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন, বলছেন, "তবে থাক, এখন থাক। আস্তে আস্তে হবে।" নরেন্দ্রের

এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। নিজের মানসিক ও স্নায়বিক বলিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁর যে গর্ব ছিল, তা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

যে মানুষের স্পর্শ মুহূর্তে বিশ্বভুবনের চেতনা লোপ ক'রে দিতে পারে, তিনি তো সাধারণ মানুষ নন। ভাবলেন নরেন্দ্র। কিন্তু পরমুহূর্তে তার যুক্তিবাদী মন রুখে দাঁড়ালো। এ কোনও প্রকার সম্মোহনবিদ্যা নয় তো? ঠাকুর যাতে তাঁর ওপর অকস্মাৎ এরকম প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন, সেজন্য নরেন্দ্র এখন থেকে সতর্ক হলেন। এই ঘটনাটাকে তিনি কোনও অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি ব'লে এতো সহজে স্বীকার ক'রে নিলেন না।

এফ. এ. পাস ক'রে নরেন্দ্র বি. এ. পড়ছিলেন। বি. এ. পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাবার ইচ্ছানুসারে বিখ্যাত এটর্নী নিমাইচরণ বসুর কাছে এটর্নীর কাজও শিখছিলেন। নরেন্দ্র কিছুদিন নিজেকে পড়াশুনো ও কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করলেন। বি. এ. পরীক্ষারও সময় এগিয়ে এসেছিল। পড়াশুনোর জন্য নরেন্দ্র কিছুদিন যাবৎ রামতনু বসু লেনে তাঁর মাতামহীর বাড়ির একটি কক্ষে থাকতেন। এই কক্ষে তাঁর ছিল সামান্য একটি বিছানা, কিছু পাঠ্যপুস্তক, একটি তানপুরা ও তামাক খাবার কিছু সাজ-সরঞ্জাম। এমনি একটি নির্জন কক্ষ তাঁর মানসিক অবস্থার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এখানে তিনি পড়াশুনো, সংগীতচর্চা ছাড়াও ধ্যান ও সংযম প্রভৃতি অভ্যাস করতেন। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণদেব নিজেও এখানে আসতেন এবং তাঁর কাছে গান শুনতেন, তাঁকে কিছু কিছু উপদেশও দিতেন।

ব্রহ্মচারীর জীবন ছিল তাঁর আদর্শ। বাবা তাঁকে বিবাহের জন্য কিছুদিন যাবৎ অনুরোধ করলেও তিনি নিজের ইচ্ছাকে ছেলের উপর চাপিয়ে দেননি। নরেন্দ্র যে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে যাতায়াত করেন, বিশ্বনাথ তা জানতেন, কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে নরেন্দ্রের এই ঘনিষ্ঠতা তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউই ভালো চোখে দেখতেন না। কিন্তু এ-বিষয়ে নরেন্দ্রকে নিষেধ করতে কেউ সাহস পেতেন না। দু-একজন সহপাঠী এরকম পরামর্শ দিতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের একজনকে নরেন্দ্র একদিন বলেছিলেন, "ভাই, তুমি রামকৃষ্ণদেবকে বুঝতে পারছ না। আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। তবু আমি তাঁকে ভালোবাসি। কেন এত ভালোবাসি, আমি নিজেও জানি না।"

নরেন্দ্রনাথ এইরকম মানসিক অবস্থার মধ্যে বি.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। পরীক্ষার জন্য তাঁকে যথেষ্ট কঠোর পরিশ্রম করতে হ'লো। কারণ, তিনি প্রচুর পড়াশুনো করলেও পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলির অনেকগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই ছিল না। যেমন, গ্রীসের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস ছিল পরীক্ষার জন্য পাঠ্য, কিন্তু এই বই তিনি পরীক্ষার আগের দিনই সারা রাত জেগে পড়েন। যাই হোক, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্র বি. এ. পরীক্ষা দিলেন।

পরীক্ষার অল্পদিন বাদে নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক জীবনে একটি রূঢ় আঘাত পেলেন। পরীক্ষার ফল তখনও বেরোয়নি। তিনি কলকাতা থেকে বরানগরে বেড়াতে গিয়েছিলেন এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে কিছু গানবাজনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। এই আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই রাত্রিতে কলিকাতা থেকে দুঃসংবাদ এলো, তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত আর ইহলোকে নেই—তিনি অকস্মাৎ হৃদরোগে মারা গেছেন। এই দুঃসংবাদে নরেন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি দ্রুত কলকাতা ফিরে এসে দেখলেন, মা, দুই দিদি, দুই ছোট ভাই, সকলেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। নরেন্দ্র তখন এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি কাঁদতেও পারলেন না। শোক-বিমূঢ় হয়ে পিতার শেষকৃত্য সম্পাদন করলেন।

বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যুর পরেই বোঝা গেল, সংসারের আর্থিক দুরবস্থা। বিশ্বনাথবাবু-প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, কিন্তু ব্যয় করতেন আরও

বেশি। বহু দূর-সম্পর্কের দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন ছিলেন তাঁর পোষ্য। অনেক পোষ্য ছিল যারা সাহায্যের অযোগ্য, অলস, অকর্মণ্য, মাতাল। তাই কিশোর বয়সে কোনও আত্মীয়ের পরামর্শ অনুসারে নরেন্দ্র একদিন তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, "বাবা, আপনি আমাদের জন্যে কি রেখে যাচ্ছেন ?" সেদিন এই প্রশ্ন শুনে বাবা বলেছিলেন ছেলেকে, "দেওয়ালে টাঙানো ওই আর্শিটায় নিজেকে দেখে আয়, তবে বুঝবি আমি তোকে কি দিয়েছি।" নরেন্দ্র বাবার সে কথাগুলি ভোলেননি। বাবা তাঁদের জন্যে অধিক ধন-সম্পদ রেখে যাননি বলে তাঁর মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু অপরিচিত দৈন্য ও অনটনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি আজ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মা ও নাবালক ভাইদের মুখে দুবেলা দুটি অন্ন দেওয়ার প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। আত্মীয়-স্বজন এই দুর্দিনে সকলেই সরে দাঁড়ালো। পাওনা-দাররা এসে হানা দিতে লাগলো। তার ওপর জ্ঞাতিরা শুরু করলো বৈর আচরণ। তারা বাসগৃহ থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করলো। নরেন্দ্র ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে নীরবে সব সহ্য করতে লাগলেন, অভাব-অনটনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

তিনি বি. এ. পাস করলেন এবং আইন পড়বার জন্যে ভর্তি হলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত আজ আর ধনীর দুলাল নয়, দীনতম ছাত্র। গৃহে অন্ন নেই, দেহে উপযুক্ত বস্ত্র নেই, ঋণশোধ দূরের কথা, কলেজে মাইনে দেওয়ার টাকাও জুটছে না। বহুদিন তাঁকে অনাহারেই দিন কাটাতে হতো, বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে কখনও কখনও নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতো। তাদের সঙ্গে গল্প-গুজবে নিজের ভয়াবহ দৈন্যদুঃখের কথা তিনি সাময়িকভাবে ভুলে থাকতে চাইতেন। কিন্তু সেখানে যখন বন্ধুরা তাঁকে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতো, তখনই তাঁর চোখের সামনে তাঁর বাড়িতে কয়েকটি অনাহারক্লিষ্ট অতিপ্রিয় মুখ ভেসে উঠতো। তিনি নানা অছিলায় বন্ধুদের দেওয়া খাদ্য ফেলে চলে আসতেন। বাড়িতে মা যখন তাঁকে খেতে বলতেন, তখন তিনি জানতেন,

তিনি খেলে অন্যদের কম পড়বে; তাই তিনি বন্ধুর বাড়ি খেয়ে এসেছেন বলে সরে পড়তেন। বাইরে হাসিখুসির ভাবটা যথাসম্ভব বজায় রাখতেন। তিনি দরখাস্ত নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াতেন, যদি একটি চাকরি জোটে—যদি দুমুঠো নিয়মিত অন্নের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোথাও একটা সামান্য চাকরিও জুটলো না। একটা চাকরির প্রত্যাশায় নরেন্দ্র নগ্নপদে ক্ষুধার্ত দেহে পাগলের মতো কলকাতার গ্রীষ্মদগ্ধ পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো, সংসারে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই। একদিন তিনি ক্লান্ত দেহে ময়দানের ঈশানকোণে মনুমেণ্টের তলায় বসেছিলেন। তাঁর কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন সঙ্গে। তাঁরা তাঁকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে কয়েকটি ভক্তিমূলক গান গাইলেন। ভগবানের করুণার কথা বললেন। নরেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "তোমরা এই গালভরা কথাগুলো বন্ধ করবে কি? যাদের ধনদৌলত আছে, যাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা নেই, তাদেরই এ ধরনের কল্পনাবিলাস শোভা পায়। আমারও একদিন এরকম কল্পনাবিলাস ছিল। আজ সেসবই নিদারুণ পরিহাস মনে হয়।"

তাঁর ধনী বন্ধুরা তাঁর আথিক দুরবস্থার কথা জানতেন না। তাঁরা প্রায়ই জুড়ি-গাড়ি চড়ে তাঁকে বাগান-বাড়িতে বেড়াতে ও আমোদ করতে ডাকতে আসতেন। অনেক সময় তিনি তাঁদের এড়াতে পারতেন না। নিজের দারিদ্র্যের কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ করতেন না। তবে তাঁর একজন ধনীবন্ধু কি ভাবে তা জানতে পেরেছিলেন। ঐ বন্ধুটি জানতেন, নরেন্দ্র কারও কাছে কোনও দয়ার দান নেবেন না। তাই তিনি মাঝে মাঝে গোপনে নরেন্দ্রের মার কাছে নানা উপহার পাঠাতেন। যেসব পুরাতন বন্ধু অসৎ পথে দু-পয়সা রোজগার করছিল, তারা নরেন্দ্রকে তাদের দলে ভিড়তেও নানাভাবে প্ররোচিত করছিল। এমনকি একাধিক ধনী মহিলা তাঁকে অর্থের বিনিময়ে পেতে চাইলো। নরেন্দ্র এইসব জঘন্য পথ সন্তর্পণে এড়িয়ে চললেন।

এই কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেও নরেন্দ্র ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস হারান নি। কদাচিৎ মুহূর্তের উত্তেজনায় তিনি ঈশ্বরের করুণায় অবিশ্বাস প্রকাশ করলেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটি জ্যোতির্ময় শিখা অনির্বাণ জ্বলতো। একদিন তিনি ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে শয্যাত্যাগ করছিলেন, হঠাৎ মার কণ্ঠস্বর কানে এলো ঃ "চুপ কর খোকা! ছোটবেলা থেকে তো ভগবানকে ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল; ভগবান তোর জন্যে কি করলেন?" কথাগুলি শেলের মতো নরেন্দ্রের মনে বিঁধলো। তাঁর মনে সংশয় জাগলো, সত্যিই কি ভগবান আছেন? সত্যিই কি তিনি মানুষের ডাকে সাড়া দেন? তবে আমার ডাকে তিনি সাড়া দেননি কেন? তবে তাঁর সৃষ্টিতে এত দুঃখ কেন? এত পাপ কেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাগুলি তাঁর মনে পড়লো—"ভগবান্ যদি করুণাময় মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের সময়ে এক গ্রাস অন্নের জন্যে হাহাকার ক'রে কোটি কোটি মানুষ মরে কেন?" নরেন্দ্রের মনে ঈশ্বরে সংশয় জাগলো। কোনও জিনিস লুকিয়ে বেড়ানো স্বভাব ছিল না নরেন্দ্রের। তিনি তাঁর এই সংশয়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে লাগলেন। তাঁর অধঃপতন ঘটেছে এই সংবাদ দক্ষিণেশ্বরেও পৌঁছলো। ঠাকুর কিন্তু তাতে কর্ণপাত করলেন না।

নরেন্দ্রের এই সাময়িক নাস্তিকতা সত্ত্বেও বাল্যকাল থেকে তাঁর মধ্যে যে ঈশ্বরবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল এবং রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে যেসব দিব্য অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, তা তাঁকে বারে বারে ঈশ্বরচিন্তার পথেই ফিরিয়ে আনল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয় ঈশ্বরকে লাভ করবার উপায়ও আছে। নইলে তো এ জীবন অর্থহীন। এই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেই তিনি সে উপায় সন্ধান করবেন। এইভাবে নরেন্দ্রের মধ্যে নাস্তিক্য ও আস্তিক্যের, সংশয় ও বিশ্বাসের, দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা এলো। চাকরির সন্ধান চলতে লাগলো।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে অনাহারক্লিষ্ট বর্ষণসিক্ত অবসন্ন দেহে নরেন্দ্র বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ অবসন্ন দেহে ফুটপাতের উপর লুটিয়ে পড়লেন। এই দিনের ঘটনা সম্পর্কে বিবেকানন্দ পরে বলেছেন, "বলতে পারি না আমি সংজ্ঞাহীন হয়েছিলাম কিনা। আমার মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা ভিড় ক'রে আসছিল। সেগুলিকে দূর ক'রে একটি কোন চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট করবার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু আমি অকস্মাৎ অনুভব করলাম, কোনও ঐশী শক্তি যেন আমার আত্মার উপরকার আবরণ সরিয়ে দিল—ভগবানের ন্যায়বিচার ও করুণা এবং জগদ্‌ব্যাপী এই দুঃখদৈন্যের সহাবস্থান নিয়ে যে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ আমার মধ্যে চলছিল, আপনা থেকে তার যেন সমাধান হয়ে গেল। এক গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে সব কিছুর অর্থ যেন আমি দেখলাম। আমি সন্তুষ্টমনে বাড়ি ফিরলাম। বোধ করলাম, আমার দেহে ও মনে আর কোন অবসাদ নেই, একটি অদ্ভুত শক্তি ও শান্তিতে আমার দেহমন সজীব হয়ে উঠেছে।"।

এর পর নরেন্দ্রের বিশ্বাস হলো, সাধারণ মানুষের মতো ভোগবিলাস, অর্থোপার্জন ও পরিবার-পোষণের জন্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি গোপনে গোপনে তাঁর পিতামহের মতো সংসার ত্যাগের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। একটি দিনও স্থির ক'রে ফেললেন। ঐ সময় তিনি শুনলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় এসেছেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই নরেন্দ্র সংসার ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ঐদিন দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে নরেন্দ্র অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের পাশে বসলেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হলেন। তারপর তিনি নরেন্দ্রের গা ঘেঁষে বসে গান গাইতে লাগলেন, দু চোখ তাঁর জলে ভরে গেল। নরেন্দ্র এতোদিন কাঁদেন নি। আজ যেন তাঁর চোখের জলে বন্যা বইলো। তাঁদের এই ভাববিনিময় দেখে উপস্থিত ভক্তরা

আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ঠাকুরের ভাবাবেশ কাটলে কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর অর্থ কি। ঠাকুর বললেন, "আমার আর ওর মধ্যে একটা হয়ে গেল।" সে রাত্রিতে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরেই রইলেন। রাত্রিতে অন্যান্য ভক্তরা সবাই চলে গেলে ঠাকুর নরেন্দ্রকে বললেন, "আমি জানি, মার কাজেই তুই এসেছিস। সংসারে তুই থাকতে পারবি না। তবে আমি যে কদিন আছি, থাক।" কথাগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর দু চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগলো। পরদিন ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে নরেন্দ্র বাড়ি ফিরলেন।

পরিবার পোষণের প্রশ্নটা রয়েই গেল। এটর্নি অফিসে কাজ ক'বে ও দু'চার-খানা বই অনুবাদ ক'রে তিান গ্রাসাচ্ছাদনের মতো কিছু রোজগার করতে লাগলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন রোজগার না থাকায় খুব দুশ্চিন্তার মধ্যেই দিন কাটতে লাগলো। এই সময় একদিন মনে হ'লো, 'ভগবান তো ঠাকুরের কথা শোনেন, তবে আমার এই অর্থাভাব দূর করবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে ঠাকুরকে একবার বলি না কেন?' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছুটলেন। ঠাকুর কিন্তু বললেন, "আমি তো মার কাছে এসব কথা বলতে পারব না। তার চেয়ে তুই নিজেই মাকে বল্ না।" নরেন্দ্র বললেন, "আমি তো মাকে চিনি না। তিনি আমার কথা শুনবেন কেন? তুমিই আমার হয়ে বল না।" ঠাকুর বললেন, "কতোবার তো বলেছি রে! মা কি বলে জানিস? ও তো আমাকে মানে না। তুই বলিস্ কেন? ও নিজে বলতে পারে না? আজ তো মঙ্গলবার আছে। রাত্রিতে মন্দিরে নিজে গিয়ে মার কাছে লুটিয়ে পড়ে তোর যা চাইবার চা, নিশ্চয় পাবি।"

নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করলেন! রাত্রির জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত্রি নটা বাজলে ঠাকুর তাঁকে মন্দিরে যেতে বললেন। আশায়-প্রত্যাশায় বুক নেচে উঠলো। এবার তবে একটা কিনারা হবে।

নরেন্দ্র মন্দিরে ঢুকেই বোধ করলেন দেবীমূর্তি প্রাণময়ী, সমস্ত প্রাণ ও চেতনার আধার। আবাল্য নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী নরেন্দ্রের যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। ভক্তির প্লাবন এলো তাঁর দেহে মনে। তিনি মার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হয়ে বার বার প্রার্থনা করতে লাগলেন, "মাগো! আমায় চৈতন্য দাও! ভক্তি দাও! ত্যাগ দাও! তোমাকে অবিরাম দেখবার শক্তি দাও।" নরেন্দ্র সংসারের কথা, দুঃখদৈন্যের কথা ভুলে গেলেন। এক জ্যোতির্ময় চৈতন্যরূপে মা তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

নরেন্দ্র মন্দির থেকে বেরিয়ে এলে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর দুঃখদারিদ্র্য ঘুচাবার কথা তিনি মাকে বলেছেন কিনা। নরেন্দ্র চমকে উঠলেন। বললেন, "আমি ওসব চাইতে ভুলে গেছি! এখন কি হবে?" ঠাকুর বললেন, "আবার যা।" নরেন্দ্র আবার মন্দিরে গেলেন। কিন্তু প্রথম বারের মতো আবার তিনি পার্থিব কিছু চাইতে ভুলে গেলেন। ঠাকুর শুনে বললেন, "কি বোকা তুই রে! এইটুকু মনে রাখবার মতো তোর মনঃসংযোগ নেই! বেশ, আর একবার চেষ্টা কর। যা, জলদি যা।" নরেন্দ্র আবার মন্দিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর মনে হ'লো, এ কি তুচ্ছ জিনিস চাইতে এসেছি আমি! তিনি ব'লে উঠলেন, "না মা! আমি কিছুই চাই না। আমায় তুমি চৈতন্য দাও, ভক্তি দাও!"

মন্দির থেকে বেরিয়ে নরেন্দ্রের মনে হ'লো, এবারও তো চাওয়া হ'লো না। তিনি ঠাকুরকে এসে বললেন, "এবারও চাইতে পারলাম না। কিন্তু সে তো তোমারই ইচ্ছায়। তুমিই চাইতে দিচ্ছ না। তবে তুমিই নিজে আমার পরিবারের একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও।" ঠাকুর বললেন, "আমি কেমন ক'রে কি ব্যবস্থা করবো রে? মার ইচ্ছে নয় যে তুই ভোগসুখে থাকিস্। আমি কি করব বল্? তবে আমি মাকে আবার বলব, যাতে তোর বাড়ির লোকেদের দুবেলা দু মুঠো মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের অভাব না হয়।"

এই ঘটনাটি নরেন্দ্রের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সূচনা করলো। এতদিন ঈশ্বর নরেন্দ্রের কাছে সগুণ নিরাকার ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। মূর্তিপূজার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। কিন্তু আজ থেকে তিনি সাকার আরাধনার অর্থ বুঝলেন। নিরাকার ও সাকার, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী এক হয়ে গেলেন। নরেন্দ্রের এই পরিবর্তনে ঠাকুরেরও আনন্দের সীমা ছিল না। যদিও তিনি জানতেন নবেন্দ্রের এই পরিবর্তন অনিবার্য।

কিছুদিন বাদে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুসনে একটি শিক্ষকতা পেলেন। নাবালক ও বিধবার সম্পত্তি জ্ঞাতিরা প্রায়ই ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করে। বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর জ্ঞাতিরা সে চেষ্টাও করেছিল। এই দুর্দিনে ভুবনেশ্বরী দেবী প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। নরেন্দ্র এই অন্যায় সহ্য করবেন না, এই সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবন্ধু ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা চালাবার ভার নেন। এই মামলা চালাবার সময়ে উমেশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, নরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে একজন বড় আইনজীবী হ'তে পারবেন। মামলায় নরেন্দ্রনাথেরই জয় হয়েছিল। আইন-বিষয়ে নরেন্দ্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে যে বহু দুঃস্থ বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা যায়, তা তিনি বুঝেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর বাবা ও পূর্বপুরুষেরা সকলেই ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী। তিনি নিজেও অ্যাটর্নী অফিসে কিছু কিছু কাজ করছিলেন। তাই নরেন্দ্র আইন পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু এদিকে তিনি বেশীদূর এগোতে পারলেন না।

৪

নরেনের সিদ্ধিলাভ—ঠাকুরের তিরোধান

নরেন মাস্টারি করতে ও আইন পড়তে লাগলেন। কিন্তু মনটা প'ড়ে রইলো দক্ষিণেশ্বরে। সময় পেলে দেহটাও দক্ষিণেশ্বরে ছুটলো। এখন তিনি রামকৃষ্ণকেই তাঁর গুরুরূপে বরণ করলেন। যুক্তি, ভক্তি ও শক্তির এক অপূর্ব মিলন দেখলেন এই মহামানবের মধ্যে। নরেন পাঁচ বৎসর তাঁর গুরুর সঙ্গ ও সান্নিধ্যের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই দিনগুলি ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল—ঘটনাগুলি ঘটছিল তাঁর অন্তর্লোকে। তিনি একদিন প্রায় নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, তারপর ব্রাহ্মসমাজের সগুণ ব্রহ্মে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে পরে হয়ে উঠেছিলেন অদ্বৈতবাদী। পরে পৌত্তলিকতা ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না তাঁর কাছে। নরেন কঠিন তপস্যায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত ধ্যান ও যোগভ্যাস করতেন, সমাধিস্থ হতেন। তিনি দ্রুত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করতে লাগলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামকৃষ্ণ তাঁর গলায় ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। ভক্তদের সঙ্গে অবিরাম আলাপ করায় ও ঘন ঘন সমাধিস্থ হওয়ার ফলে এমনটি হচ্ছে বলে ডাক্তাররা অনুমান করলেন। তাঁরা রামকৃষ্ণকে কথা বলতে ও ঘন ঘন সমাধিস্থ না হ'তে পরামর্শ দিলেন এবং এ বিষয়ে শিষ্যদেরও সতর্ক হ'তে বললেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁদের পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। এই সময়ে কলকাতার উপকণ্ঠে পানিহাটিতে একটি মহোৎসব হয়, তাতে তিনি সারাদিন ভাবোন্মত্ত হয়ে সংকীর্তন করেন এবং বার বার সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। ফলে রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শীঘ্রই ধরা

পড়ে, রামকৃষ্ণের গলদেশে ক্যান্সার রোগ দেখা দিয়েছে। শিষ্যরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও নরেনের যথেষ্ট পড়াশুনো ছিল। এই মারাত্মক ব্যাধির বিপদ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর আশঙ্কা ও উদ্বেগের সীমা রইলো না। চিকিৎসার জন্যে রামকৃষ্ণকে কলকাতা আনা হ'লো। ঠাকুর কিছুদিন বলরাম বসুর বাড়িতে রইলেন, তারপর শ্যামপুকুরে একটি বাড়ি তাঁর জন্যে ভাড়া নেওয়া হ'লো। তখনকার সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। এখন ঠাকুরের কাছে সর্বদা থাকবার জন্যে নরেন মাস্টারি ছেড়ে দিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যরা দিবারাত্র ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। ঠাকুর কিন্তু নরেনকে তাঁর সেবা করতে দিলেন না। তাই সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান ক'রে তাঁকে ক্ষান্ত হ'তে হ'লো।

এই দুরারোগ্য পীড়ায় ঠাকুর ক্রমেঃ শীর্ণ থেকে শীর্ণ হয়ে পড়লেন। কিন্তু রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর দেহ যেন দিব্য জ্যোতি লাভ করতে লাগলো। ঠাকুরের এই অসুস্থতা সম্পর্কে তাঁর শিষ্যরা অনেকেই অনেক রকম মতবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন। একদল শিষ্যের মত হ'লো, ঠাকুর অন্যান্য মানুষের পাপ নিজে নেওয়ায় তাঁকে এই দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু নরেন বললেন, "ঠাকুরের দেহ-ও অন্যান্য মানুষের মতোই প্রকৃতির বিধানের বশবর্তী। জন্ম, ক্ষয়, ব্যাধি ও মৃত্যু তার থাকবেই।" ঠাকুরের তরুণ শিষ্যেরা নরেনের এই মতবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁদের প্রিয়তম এই মানুষটির রোগযন্ত্রণা তাঁদের কাছে আরো মর্মান্তিক ছিল। নরেন ঠাকুরকে কোনদিন ভগবানের অবতার ব'লে বিশ্বাস করেন নি ; ঠাকুর তাঁর কাছে সাধারণ মানুষও ছিলেন না। তিনি নিজের ধারণাটিকে সুস্পষ্টভাবে একদিন ডাঃ সরকারের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমরা ঠাকুরকে ভগবান ব'লে মনে করি

না, আমরা মনে করি, তিনি দেবতার মতো একজন ব্যক্তি। তাই তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তিটা দেবভক্তির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে।"

ডাঃ সরকার নরেনকে দেখলে খুশী হয়ে উঠতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন, এমন কি বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রেও খাওয়াতেন। তিনি শ্যামপুকুরে নরেনের গান শুনে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি নরেনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "এদের মতো ছেলেরা যে এখানে ধর্মোপদেশ নিতে এসেছে, তা খুবই আনন্দের বিষয়। নরেন প্রকৃতই একটি রত্ন, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই এর দীপ্তি প্রকাশ পেতে পারে।" তখন রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "অদ্বৈত গোস্বামীর জ্বালাময় আকুতিই একদিন নদীয়ায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। এবারের আসাটাই ওর (নরেনের) জন্যেই।"

রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগের ফলে ভক্তদের মধ্যে বিশ্বাস ও ভক্তি যেমন খুব বেড়েছিল, তেমনি তাঁরা একটি বিপজ্জনক পথেও পা দিয়েছিলেন। শিষ্যরা প্রায়ই উচ্চ হাসিকান্না ও গানের মধ্যে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন বা পড়বার ভান করতে লাগলেন। নরেন ভক্তদের এই অবস্থা দেখে তাঁদের তিরস্কার ক'রে সতর্ক ক'রে দিলেন: "এ তোমরা কি করছ? ঠাকুর যে দিব্য-শক্তির অধিকারী হয়েছেন, সেজন্যে তাঁকে সারাজীবন সাধনা করতে হয়েছে, জীবনে তাঁকে অনেক ত্যাগের মূল্য দিতে হয়েছে। তোমাদের এই উত্তেজিত ভাবপ্রবণতা ও ভাবাবেশ যদি সত্যি হয়, তবে তা অসুস্থ মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতা মাত্র। যারা অসুস্থ, তাদের নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। তাদের উচিত উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া, এইসব মেয়েলিপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। যে ধর্মই এই ধরনের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশে উৎসাহ দিয়েছে, সে ধর্মের শতকরা ৮০ জন লোকই ব্যভিচারী ও উচ্ছৃঙ্খল এবং শতকরা ১৫ জন লোক উন্মাদ হয়েছে।"

নরেনের কথাগুলি ঔষধের মতো কাজ করলো। সকলেই সংযত হলেন। অনেকে স্বীকার করলেন, তাঁরা ভাবাতিশয্যের ভান করছিলেন। নরেন সকলকে সতর্ক ক'রে দিলেন। তিনি সকলকেই ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে বললেন। এইভাবে নরেন ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সংঘের অবিসংবাদী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নরেন নিজেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। তা তাঁকে রামকৃষ্ণের যোগ্য উত্তরাধিকারী ক'রে তুলছিল।

ঠাকুরের অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে চললো। ঔষধে কোন কাজ হচ্ছিল না। কলকাতার ধুলো-ধোঁয়ার বাইরে কোন নির্মল পরিবেশে হয়তো ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হবে, এই ভেবে কাশীপুরে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে তাঁকে আনা হ'লো। ঠাকুর এখানে এসে কিছুটা ভালো বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তা-ও সাময়িক। দিনের পর দিন তাঁর শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লো। নরেনের পরিচালনায় ছেলেরা সবাই রাতদিন তাঁর সেবা করতে লাগলো। ঐ সময়েও নরেন আইন পড়ছিলেন, কলকাতায় আদালতে তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে মামলা চলছিল। সেজন্যে তাঁকে প্রায়ই কিছু সময় কলকাতায় আটক থাকতে হ'তো। তিনি কাশীপুরে যখন থাকতেন, তখন সুযোগমতো আইন পড়াশুনোও করতেন। ঠাকুর এই সময়টা বস্তুতঃ তাঁর এই বালক ভক্তদের সঙ্গেই থাকতেন। বালক ভক্তরা সকলেই নরেনের পরামর্শে নিজ নিজ বাড়ি ছেড়ে ঠাকুরের চরণতলেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। নরেন তাঁদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতেন। এই বালক ভক্তদের সংখ্যা ছিল বারো। এই বারোজনই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঠাকুরের তিরোধানের সময় যতোই ঘনিয়ে আসছিল, ততোই নরেনের মধ্যে সিদ্ধিলাভের বাসনাও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।

একদিন রাত্রে নরেন বৈষয়িক ব্যাপারে দু-একদিনের জন্যে

কলকাতা যাবেন ঠিক ক'রে শুতে গেলেন। কিন্তু কোনমতে তাঁর ঘুম এলো না। তখন তিনি শরৎ, ছোট গোপাল ও অন্যান্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন। বেড়াতে বেড়াতে বললেন, "ঠাকুরের অসুখটা মারাত্মক। তিনি থাকতে থাকতে তাঁর সেবা, প্রার্থনা ও ধ্যানধারণার দ্বারা আমাদের দ্রুত আত্মোন্নতি ঘটাতে হবে। তিনি চলে গেলে আমাদের আফশোসের সীমা থাকবে না। আমরা বোকার মতো ভাবছি, হাতের কাজটা সেরে নিই, তারপর ভগবান্‌কে প্রাণ ভ'রে ডাকা যাবে। আর এই ক'রে বাসনার বন্ধনে আরো বাঁধা পড়ছি। বাসনা মানেই মৃত্যু। এই বাসনার উচ্ছেদ আমাদের এখনই করতে হবে।"

সেই নক্ষত্রালোকিত শীতের রাতে নরেনের নির্দেশমতো তাঁরা খড়কুটো সংগ্রহ ক'রে তাঁর পাশে বসলেন। নরেন বললেন, "এই সময়ে সন্ন্যাসীরা তাঁদের ধুনী জ্বালান। এসো, আমরাও ধুনী জ্বালাই, সন্ন্যাসীদের মতোই এই ধুনীর আগুনে আমাদের কামনা-বাসনাকে পুড়িয়ে ছাই করি।" ধুনী জ্বালানো হ'লো। তাঁরা সকলেই ধ্যানস্থ হলেন, অনুভব করতে লাগলেন, তাঁরা এই আগুনে সত্যই তাঁদের কামনা-বাসনাকে পুড়িয়ে ছাই করছেন।

একদিন ঠাকুর নরেনকে 'রাম'-নামে দীক্ষা দিলেন এবং বললেন, এই মন্ত্র তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। দীক্ষার পরে নরেনের মধ্যে প্রচণ্ড ভাবাবেগ দেখা দিল। বিকালে নরেন বাগানবাড়ির চারদিকে উচ্চকণ্ঠে রাম-নাম জপ করতে করতে পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। বহির্জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোন চেতনা রইল না। জ্বলন্ত ভাবাগ্নিতে তাঁর সারা দেহ-মন প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই অবস্থা দেখে অন্যান্য শিষ্যরা ভয় পেলেন এবং ঠাকুরকে খবর দিলেন। ঠাকুর বললেন, "কিছুক্ষণ থাক্ ঐ অবস্থায়। সময়মতো প্রকৃতিস্থ হবে।" কয়েক ঘণ্টা পরে নরেনের এই [illegible] ভাবাবেগের ঝড় কেটে গেল।

কাশীপুর বাগানবাড়ি যেন প্রাচীনকালের ঋষির আশ্রমে পরিণত হয়েছিল। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন, ঋষিবালকদের মতো তরুণ শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করতেন, করতেন মন্ত্রোচ্চারণ ও নাম গান। ঠাকুব প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের ধ্যান করবার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। নবেন প্রায়ই ধ্যানস্থ হতেন এবং নব নব সত্য উপলব্ধি করতেন। নবেন অনেকসময় গান গাইতেন। তা শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যেতেন।

নবেন তাঁর পড়াশুনো একেবারে ছেড়ে ফেলেছিলেন। আইন-পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছিল। কিন্তু নবেনের সেদিকে বিন্দুমাত্র নজব ছিল না। নরেন একদিন সকালে বাড়ি ফিবলে বাড়ির সকলে তাঁকে পডাশুনোয় অবহেলা করবার জন্যে তিরস্কার করলেন। নরেন তাব দিদিমাব বাড়িতে গিয়ে নিরিবিলিতে পড়াশুনো নিয়ে বসলেন। কিন্তু পড়াশুনো সম্পর্কে একটা ভয়ংকর আতঙ্ক যেন তাঁকে পেয়ে বসলো। বুকের মধ্যে একটা ঝড় বইতে লাগলো। তিনি বই ফেলে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন। তাবপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে কাশীপুরে গিয়ে পৌছলেন।

সেই রাত্রিতেই ঠাকুর তাঁকে ইঙ্গতে জানালেন যে, নরেন শীঘ্রই তাঁর অভীষ্ট লাভ করবেন। বাত্রিতে নরেন কয়েকজন গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে নরেন প্রায়ই রাতের পর রাত ধুনী জ্বালিয়ে ধ্যান কবতেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পড়াশুনো ছেড়ে দিলি কেনরে?" নরেন বললেন, "এতদিন যা শিখেছিলাম, তা ভুলিয়ে দেওয়ার মতো যদি কোন ওষুধ থাকতো, তবে তা খেতাম।" নরেন এখন প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন। পুঁথিগত বিদ্যায় তাঁর কি প্রয়োজন? আর, সে তো বিদ্যা নয়, অবিদ্যা। একদিন ঠাকুর নরেনকে বললেন, "এইসব ছেলে তোর হেফাজতে রইলো। দেখিস, তারা যেন

আধ্যাত্মিক চর্চা ঠিকমতো করে, আর বাড়ি ফিরে না যায়।" একদিন ঠাকুর ছেলেদের তাদের সন্ন্যাস জীবনের প্রস্তুতিরূপে ভিক্ষা করতে পাঠালেন। তারা সানন্দে ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়লো। তাদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'লো। অনেকে তাদের তিরস্কার করলো, অনেকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করলো। কিন্তু হাসিমুখে তা তারা উপেক্ষা ক'রে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ক'বে আনলো। ঠাকুরের আনন্দ ধরে না। তারা সেই ভিক্ষান্ন পাক করলে ঠাকুর নিজেও এক কণা খেলেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে শিষ্যদের বাঁধনকে ক্রমেই দৃঢ়তর ক'রে তুললেন। অবশ্য এই বাঁধনের কেন্দ্র হলেন নরেন।

একদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এলেন কাশীপুরে ঠাকুরকে দেখতে। তিনি ঠাকুরকে বললেন, "শাস্ত্রে আছে, আপনাদের মতো লোকেরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে এইসব দৈহিক রোগ সারিয়ে তুলতে পারেন। আপনি যদি ঐ অসুস্থ অংশটার ওপর মনঃসংযোগ করেন এবং স্থির করেন যে, ওটা ভালো হ'ক, তবে ওটা সেরে উঠতে বাধ্য। আপনি তা চেষ্টা ক'রে দেখুন না কেন ?"

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "আপনি পণ্ডিত মানুষ। তবু আপনি এ রকম অর্থহীন কথা বলছেন! আমি আমার মন তো চিরকালের জন্যে ঈশ্বরকে দিয়েছি। তা এখন কেমন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এই পচা রক্তমাংসের পিঞ্জরটার ওপর রাখি ?"

তর্কচূড়ামণি চুপ ক'রে গেলেন। তিনি চ'লে গেলে নরেন ও অন্যান্য শিষ্যরা ঠাকুরকে তাঁর নিজের রোগ সারাবার জন্যে চেপে ধরলেন। বললেন, "অন্ততঃ আমাদের মুখ চেয়েও আপনাকে সুস্থ হ'তে হবে।" ঠাকুর বললেন, "ওরে! আমি কি ইচ্ছা ক'রে এই যন্ত্রণা সইছি ? এটা সেরে উঠুক, তা তো আমি চাই। তবু তো সারছে না। মার ইচ্ছার উপরই তো সব কিছু নির্ভর করে।" নরেন বললেন, "তবে মাকে সারিয়ে দিতে বলুন। মা আপনার কথা না শুনে পারবেন না।" ঠাকুর বললেন, "বললি তো তোরা।

কিন্তু এসব কথা যে আমি মাকে বলতে পারি না।" নরেন বললেন, "তা হবে না। আপনাকে একটিবার আমাদের মুখ চেয়েও বলতে হবে।" ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখব।" কয়েক ঘণ্টা বাদে নরেন এসে ঠাকুরকে বললেন, "মাকে বলেছিলেন? মা কি বললেন?" ঠাকুর বললেন, "মাকে গলাটা দেখিয়ে বললাম, এখানে ঘার জন্যে আমি কিছু খেতে পারছি না। আমি যাতে একটু খেতে পারি, দেখ মা। মা বললেন, 'কেন, তুই যে এতোগুলো মুখ দিয়ে খাচ্ছিস, তাতে তোর পেট ভরছে না!' আমি আর কিছু বলতে পারলাম না, ভারি লজ্জা হ'লো।" ঠাকুরের কথাগুলি শুনে নরেন আশ্চর্য হলেন। অদ্বৈতে এ কি বিশ্বাস! নিজের দেহ সম্পর্কে এ কি চেতনাহীনতা!

ধ্যান করবার অভ্যাস ও শক্তিতে নরেন দ্রুত উন্নতি করছিলেন। তিনি যে কোনও বিষয়ে অবিচলিতভাবে মনোনিবেশ করতে পারতেন এবং তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিও দ্রুত বিকাশ লাভ করছিল। এ শক্তি সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন হয়ে উঠছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস, শিবরাত্রির রাত। কয়েকজন গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে তিনি কাশীপুরে বাগানে বসেছিলেন। তিনি সারাদিন উপবাস করেছেন এবং সমস্ত রাত ধ্যান পূজো ও উপাসনায় কাটাবেন স্থির করেছেন। প্রথম প্রহরের পূজো শেষ হয়ে গেছে। নরেন গুরুভাইদের সঙ্গে কথা বলছেন। বিভিন্ন কাজে কালী (পরে স্বামী অভেদানন্দ) ছাড়া গুরুভাইরা পরে একে একে চলে গেলেন। হঠাৎ নরেনের খেয়াল হ'লো, তিনি অদ্বৈত বেদান্ত সম্পর্কে যে উপলব্ধি আয়ত্ত করেছেন, তা কালীর মধ্যে সঞ্চারিত করার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তাঁর হয়েছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। তিনি কালীকে বললেন, "কয়েক মিনিট বাদে আমাকে তুমি ছোঁবে।" কিছুক্ষণ বাদে যখন একজন গুরুভাই ঘরে এসে ঢুকলেন, তিনি দেখলেন নরেন ও কালী ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছেন। কালী তাঁর ডান

হাত দিয়ে নরেনের জানু স্পর্শ করলেন। কালীর ডান হাতটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। মিনিট দুই-তিন বাদে নরেন বললেন, "আচ্ছা তোমার কেমন বোধ হ'ল ?" কালী বললেন, "যেন ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারি থেকে শক লেগেছে বোধ করলাম।" গুরুভাইটি জিজ্ঞাসা করলেন, "কালী, নরেনকে ছোঁয়ার জন্যেই কি তোমার হাত অমন কাঁপছিল ?" কালী বললেন, "হ্যাঁ, আমি চেষ্টা ক'রেও আমার হাতটা স্থির রাখতে পারছিলাম না।"

দ্বিতীয় প্রহরের পূজো শেষ হওয়ার পর গুরুভাইরা সকলে আবার ধ্যানে বসলেন। কালী গভীরভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। সকলে বুঝলেন, এটা নরেনকে স্পর্শ করার ফল। পূজো শেষ হওয়ার পর নরেন ঠাকুরের ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ব'লে উঠলেন, "তুমি নিজে যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করবার আগেই শক্তির অপচয় করছ। আগে নিজে যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ কর, তারপর বুঝবে কতখানি তুমি ব্যয় করতে পার, এবং কিভাবে তা ব্যয় করতে হবে। মা তোমাকে জানিয়ে দেবেন। তোমার নিজের চিন্তা-ধারণা ঐ ছেলেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর কতখানি ক্ষতি করলে তা কি তুমি জান ? সে দীর্ঘদিন ধ'রে একটা বিশেষ পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। তুমি সব নষ্ট ক'রে দিলে ! যাক্, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এমনটি আর কখনও ক'রো না। যাই হক, ছেলেটার ভাগ্য ভালো।" নরেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ঠাকুর তাঁর নিজের ঘরে ছিলেন। তিনি কি ক'রে জানলেন বাগানে কি হচ্ছে ? নরেন নীরব হয়ে রইলেন।

ঠাকুরের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের উদ্বেগ ও দুঃখের সীমা নেই। দুঃসহ রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও ঠাকুরের মুখে হাসি লেগেই আছে। যেন দেহটা অন্য কার, অন্য কে রোগযন্ত্রণা ভোগ করছে। একসময় কিছুদিন রামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী ছিল একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। নরেন

এ বিষয়ে ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি বুদ্ধদেবের আখ্যানগুলির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। জীবনে একটা সময় বুদ্ধদেবের আদর্শ, বাণী ও জীবন তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বুদ্ধদেবের অতুলনীয় মনীষা, বিচারবুদ্ধি, সত্যের সন্ধানে সর্বস্ব ত্যাগের শক্তি, প্রেম, অহিংসা, ব্যক্তিত্ব, সবই নরেনের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। নরেনের মনোভাবটা ছিল সংক্রামক। নরেন ও অন্যান্য কয়েকজন গুরুভাই স্থির করেছিলেন, তাঁরা সত্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হ'লে জীবন বিসর্জন দেবেন। হঠাৎ নরেনের মনে হ'লো বোধগয়ার কথা, যেখানে তথাগত বুদ্ধ বোধি লাভ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন, বোধগয়ায় যাবেন, এবং সেখানে বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের তলায় বসে বোধিলাভের জন্যে তপস্যা করবেন। তাঁর এই মনের কথা তিনি গুরুভাইদের মধ্যে কেবল তারক ও কালীকে বললেন। তারক পথ-খরচার ব্যবস্থা করলো। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে একদিন গোপনে নরেন, তারক ও কালী গঙ্গা পার হয়ে বালী রেল স্টেশনে পৌছলেন। তারপর বোধগয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন।

তাঁরা কোথায় গেছেন জানতে না পেরে গুরুভাইরা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁদের ধারণা হ'লো, নরেন, তারক ও কালী নিশ্চয় সন্ন্যাস গ্রহণ করবার জন্যে চলে গেছেন এবং তাঁরা আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু ঠাকুরকে এ ব্যাপারে মোটেই উদ্বিগ্ন দেখা গেল না। তিনি বললেন, "তোরা ভাবছিস কেন? তারা শীঘ্রই ফিরে আসবে।"

নরেন, তারক ও কালী গেরুয়া প'রে তপশ্চর্যার জন্যে বোধগয়া যাত্রা করেছেন, এ সংবাদ পরে পাওয়া গেল। তাঁরা তিনজনে গয়া স্টেশনে নেমে সাত মাইল হেঁটে বোধগয়ায় বোধিদ্রুম তলে এসে পৌছলেন। বিস্ময়কর নির্মলতা ও ঐতিহাসিক অতীত স্মৃতি এই স্থানটিতে তাঁদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। একদিন

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় তাঁরা তিনজন বোধিদ্রুম তলে শিলাখণ্ডে ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন। হঠাৎ নরেনের দুচোখ বেয়ে বন্যার মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি তাঁর পার্শ্বে ধ্যানস্থ গুরুভাই তারককে গভীর প্রেমে জড়িয়ে ধরলেন। তারক বিস্মিত হয়ে নরেনকে প্রশ্ন করলেন, তিনি এমন করছেন কেন। নরেন বললেন, বুদ্ধদেবের সেই দিব্য ভাবগম্ভীর চরিত্র, তাঁর করুণা, তাঁর মানব-প্রেমের বাণী, বৌদ্ধধর্মের ফলে পুনরুজ্জীবিত ভারতের সেই অতীত ইতিহাস—সবই যেন বর্ণবিচিত্র অসংখ্য ছবির মতো তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠেছিল, ফলে তিনি নিজের ভাবাবেগ দমন করতে পারেননি।

তাঁরা তিন চারদিন বোধগয়ায় ছিলেন। তাঁরা আবার ঠাকুরকে দেখবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলেন। বোধগয়ার মহান্ত এবং গয়ায় নরেনের এক পিতৃবন্ধু তাঁদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তাঁরা আবার কাশীপুরে ফিরে এলেন। কিন্তু বোধগয়ায় নরেন যা দেখেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন, তা গভীরভাবে তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। তাই তিনি কয়েকদিন আনমনা হয়ে রইলেন, ঐ প্রসঙ্গ ছাড়া যেন আর কোন কথাও বলতে পারলেন না।

একদিন ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য বড় গোপাল কিছু গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষ মালা সাধুদের মধ্যে বিতরণ করবার জন্যে ঠাকুরকে এনে দিলেন। ঠাকুর বললেন, "তোকে সাধু খুঁজতে হবে নারে। এই ছেলেরা সর্বত্যাগী। এদের মধ্যেই এই গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষমালা বিলিয়ে দে।" তারপর একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর তরুণ শিষ্যদের—নরেন, রাখাল, বাবুরাম, যোগিন, নিরঞ্জন, তারক, শশী, লাটু, কালী ও বড় গোপালকে—নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করলেন। এই অনুষ্ঠান-শেষে তিনি তাদের সকলকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের হাতে খাওয়ার অধিকার দিলেন। এইভাবেই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সংঘের সূচনা হলো।

এবার এলো নরেনের সাধক-জীবনের মহত্তম মুহূর্ত। যে দিন

থেকে ঠাকুর নরেনের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তের জ্ঞান সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছি'লন, সেদিন থেকেই পরমব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভের জন্যে, 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম, এই উপলব্ধির জন্যে নরেন অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এজন্যে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই আবদার করতেন। ঠাকুর তাতে কান দিতেন না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এটি ঘটলো। নরেন ধ্যান করছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁর মাথার পেছন দিকে একটি জ্যোতির অস্তিত্ব অনুভব করলেন। যেন সেখানে কে একটা টর্চ লাইট জ্বেলে রেখেছে। আলোটি ক্রমেই বড় ও উজ্জ্বল হ'তে লাগলো। শেষে যেন সেটি ফেটে গেল। নরেনের সমস্ত মন তার সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। তাঁর সমস্ত চেতনায় যা ঘটলো তা অনির্বচনীয়; কারণ অদ্বৈতের অবস্থা কি তা বর্ণনা করা যায় না। নরেন ও গোপাল একই ঘরে ধ্যান করছিলেন। হঠাৎ নরেন চীৎকার করতে লাগলেন, "গোপালদা! গোপালদা! আমার শরীরটা কোথায়?" কেবল মাথা ছাড়া আর সারা শরীরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বোধশক্তি নরেনের লোপ পেয়েছিল। গোপাল চীৎকার ক'রে বললেন, "কেন নরেন, ঐ তো তোমার শরীর রয়েছে, ওই তো" তারপর তিনি দ্রুত নরেনের অবস্থার কথা জানাবার জন্যে ঠাকুরের কাছে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঠাকুরের মুখখানি গম্ভীর ও প্রশান্ত; পাশের ঘরে কি ঘটছে, তা তিনি সবই জানেন। গোপাল নরেনকে এই অবস্থায় সাহায্য করবার জন্যে ঠাকুরকে বললে ঠাকুর বললেন, "থাক্ ও কিছুক্ষণ এই অবস্থায়। আমাকে এজন্যে ও অনেকদিন ধরে জ্বালাচ্ছিল।"

রাত্রি নটা নাগাদ নরেনের সংজ্ঞা কিছুটা ফিরে আসবার লক্ষণ দেখা গেল। যখন তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এলো, তখন নরেন দেখলেন, তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে ঘিরে আছেন। ধীরে ধীরে সবই তাঁর মনে পড়লো! এক অপূর্ব প্রশান্তিতে তাঁর সারা মন ভরে গেছে। পরে তিনি ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর বললেন, "মা তবে তোকে সব

দেখিয়ে দিলে। তুই এখন যা দেখেছিস, ও এখন তালা বন্ধ রইলো। আর চাবি রইলো আমার কাছে। তুই যখন আমার কাজ শেষ করবি, তখন ঐ চাবি আবার খোলা হবে। তখন আবার সব জানতে পারবি, এখন যেমনটি জানলি।" তারপর ঠাকুর নরেনকে এখন কিছুদিন খাদ্য ও সঙ্গীদের সম্পর্কে সতর্ক হ'তে উপদেশ দিলেন। তারপর ঠাকুর অন্যান্য শিষ্যকে বললেন, "নরেনের ইচ্ছা ছাড়া মৃত্যু হবে না। নরেন যখন বুঝবে সে কে, তখন সে এই দেহে আর থাকতে চাইবে না। যখন সময় আসবে সে তার বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে সারা জগৎটাকে তোলপাড় ক'রে দেবে।"

ঠাকুরের মহাসমাধির সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসতে লাগলো। একদিন ঠাকুর নরেনকে ডেকে বললেন, "ছেলেরা রইলো। তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্ ; তুই ওদের সৎপথে চালাস।"

মহাসমাধির তিন-চার দিন আগে ঠাকুর নরেনকে পাশে ডেকে বসালেন। তারপর নরেনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সমাধিস্থ হলেন। নরেন অনুভব করলেন, বৈদ্যুতিক শক্তির মতো কি একটা দুর্বোধ্য জিনিস তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলো, তাঁর সমস্ত বহিশ্চেতনা লুপ্ত হ'লো। তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখলেন, ঠাকুর অবিরল ধারায় কাঁদছেন। নরেন বিস্মিত হয়ে তাঁর এই কান্নার কারণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন। ঠাকুর বললেন, "ওরে, আজ আমি তোকে সব দিয়ে ফকির হয়ে গেলুম রে! আজ আমার যে শক্তি তোর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিলুম, তা দিয়ে তুই অনেক বড় বড় কাজ করবি। কাজ শেষ হ'লে তারপর তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানে ফিরে যাবি।" নরেন অকস্মাৎ তাঁর গুরুর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন—যে শক্তি তাঁর গুরু সুদীর্ঘ দুষ্কর সাধনা ও দুশ্চর তপশ্চর্যার দ্বারা লাভ করেছিলেন।

ঠাকুরের তিরোধানের আর মাত্র দুদিন বাকী ছিল। নরেন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে ক্ষণিকের জন্যে

একটা চিন্তা খেলে গেল,—ঠাকুর অনেক সময় বলেছেন, তিনি ভগবানের অবতার; এখন তাঁর এই মৃত্যুকালে, দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও যদি তিনি তা বলেন, তবে আমি তা বিশ্বাস করবো।" চিন্তাটা যে মুহূর্তে নরেনের মনে উদয় হ'লো, ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাকুর তাঁর দিকে ফিরে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, "ওরে নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নি? যে রাম ও কৃষ্ণ, সেই এই দেহে রামকৃষ্ণ—তোর অদ্বৈত বেদান্তের মতে নয় রে!" নরেন স্তম্ভিত হলেন। তাঁর লজ্জা ও অনুতাপেব সীমা রইলো না।

শেষদিন ঠাকুরের দৈহিক যন্ত্রণা চরমে উঠলো। সন্ধ্যার দিকে তিনি শ্বাসকষ্ট বোধ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মধ্যরাত্রিতে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলো। তারপর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নরেনের সঙ্গে কথা বললেন—তাঁকে নানা বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট এলো। ১টা বাজার দু মিনিট পরে হঠাৎ ঠাকুরের সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল, সারা দেহে রোমাঞ্চ হ'লো, তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ হ'লো, একটি দিব্য হাসিতে ভরে উঠলো মুখখানি, ঠাকুর মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

এইভাবে এক মহানাট্যের যবনিকাপাত হ'লো। তখন নরেনের বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। কিন্তু বয়সে কি আসে যায়, দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডারও মাত্র বিশ বৎসর বয়সেই তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

৫

ভারত পরিক্রমা

ঠাকুরের মহাসমাধির পর শিষ্যরা কি করবেন, না করবেন, স্থির করতে পারলেন না। ঠাকুরের তিরোধান অপ্রত্যাশিত না হ'লেও পরবর্তী অবস্থার জন্যে তাঁরা তৈরি ছিলেন না। বালক ভক্তদের অনেকেই, যেমন, তারক, লাটু, বড় গোপাল, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে স্থায়িভাবেই কাশীপুরে বাস করছিলেন। অন্যান্য বালক ভক্তরা বাড়িতে গেলেও অধিকাংশ সময়ই তাঁরা এখানেই কাটাতেন। তাই রামকৃষ্ণের তিরোধানের পরও কাশীপুর রামকৃষ্ণ ভক্তদের মিলন-কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণের তিরোধানের সপ্তাহকালেব মধ্যে কাশীপুরে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। নরেন ও তাঁর একজন গুরুভাই রাত্রিতে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। নরেন দেখলেন, একটি বস্ত্রাবৃত জ্যোতির্ময় মূর্তি যেন তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। নরেন থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর কি দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে! এইসময়ে তাঁর সঙ্গী ফিস্‌ফিস ক'রে বললেন, "ওকি?" নরেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ওখানে?" নরেনের চীৎকারে বাগান-বাড়ি থেকে অন্যান্য সকলে ছুটে এলেন। ইতিমধ্যে নরেনের কাছ থেকে প্রায় দশ গজ দূরে একটি জুঁইগাছের কাছে মূর্তিটি অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। সকলে আলো নিয়ে তন্ন-তন্ন ক'রে বাগানবাড়ি খুঁজে ফেললেন, কারও কোন চিহ্ন দেখলেন না। তাঁরা হাসলেন, ঠাকুর তাঁদের দেখা দিয়েছেন। তাঁরা জানতেন, শ্রীমাকেও ঠাকুর এইভাবে দেখা দিয়েছিলেন। হিন্দু রীতি অনুসারে বিধবাকে নিরাভরণ হ'তে হয়। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর শ্রীমা যখন তাঁর হাতের চুড়িগুলি খুলে ফেলছিলেন, তখন হঠাৎ ঠাকুর তাঁকে

দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, “আমি মরিনি।” ফলে শ্রীমা তাঁর হাতের চুড়িগুলি আর খোলেননি। ঠাকুরের এই দর্শনদান নরেনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। তিনি ঠাকুরের নিয়োজিত কর্মে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্যে স্থিরসংকল্প হলেন।

ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর গৃহত্যাগী ভক্ত ও গৃহী ভক্তদের মধ্যে ঠাকুরের দেহাবশেষ রাখবার অধিকার নিয়ে মতান্তর ঘটলো। নরেন শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের মীমাংসা করলেন। দেহাবশেষের অর্ধেক গৃহীরা নিয়ে গেলেন, বাকী অর্ধেক সন্ন্যাসী ভক্তরা নিজেদের কাছে রাখলেন। গৃহীরা যে অর্ধেক নিয়ে গেলেন, তা তাঁরা কাঁকুড়গাছিতে সমাহিত করেন। এই স্থানটি এখন ‘যোগোদ্যান’ নামে বিখ্যাত হয়েছে। সন্ন্যাসী ভক্তরা যে অর্ধাংশ রেখেছিলেন, তা কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে রাখা হয়। শ্রীমা বৃন্দাবন যাত্রা করলে তিনি ঐ ভস্মাধার সঙ্গে নিয়ে যান। কিছু কিছু ভস্মাবশেষ হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। এক বৎসর পরে ঐ ভস্মাধার শ্রীমা নরেনকে দেন। নরেন ঐ ভস্মাধার বরানগর মঠে রাখেন। ঠাকুরের ব্যবহৃত শয্যা ও পাত্রাদি অন্যান্য জিনিসপত্রও বরানগরে আনা হয়।

কাশীপুরের বাগানবাড়ির ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিল। তাই এখন গৃহত্যাগী বালক ভক্তদের আশ্রয় কোথায় জুটবে, তা একটি সমস্যা হয়ে উঠলো। লাটু ও যোগিন শ্রীমার সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তারকও পরে বৃন্দাবন যান। অনেক বালকভক্ত পিতামাতা ও অভিভাবকের পীড়াপীড়িতে গৃহে ফিরে যান। তাঁরা নিজেদের কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো শেষ করতে চেষ্টা করেন। নরেন তাঁদেরও একে একে ফিরিয়ে আনলেন। এখন প্রশ্ন উঠলো, এইসব বালকভক্ত কোথায় থাকবেন, কিভাবে তাঁদের অন্নের ব্যবস্থা হবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে অনেক গৃহী ভক্ত, বিশেষ ক'রে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (সুরেশবাবু) এগিয়ে

আসেন। ঠাকুরের জীবদ্দশায় কাশীপুরের অধিকাংশ ব্যয় তিনি নিজে বহন করতেন। এখনও তিনি তা বহন করতে চাইলেন। তাঁর উৎসাহে ও নরেনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বরানগরে একটি ভগ্নপ্রায় গৃহের সন্ধান মিললো। স্থানটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও নির্জন, বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। তা হ'লেও কাশীপুর শ্মশানঘাট (যেখানে ঠাকুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছিল) ও গঙ্গা নিকটে হওয়ায়, এবং ভাড়া মাসিক মাত্র ১০৲ টাকা হওয়ায় নরেন এই ভগ্নপ্রায় গৃহটিকেই গ্রহণ করলেন। এইভাবে বরানগর মঠের সূত্রপাত হ'লো। বালক ভক্তরা একে একে এখানে এসে জুটলেন। নরেন বৈষয়িক মামলায় জড়িত থাকায় তাঁকে বাড়িতে থাকতে হ'লেও তিনি প্রায়ই এখানে আসতেন এবং দিনরাত্রির বেশির ভাগই এখানে কাটাতেন। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বরানগরই রামকৃষ্ণভক্তদের মিলন-কেন্দ্র ছিল। তারপব মঠ দক্ষিণেশ্বরের নিকটে আলমবাজারে উঠে যায়। তারপব সেখান থেকে যায় গঙ্গার পশ্চিম তীরে বরানগরের ঠিক বিপরীত দিকে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে। বরানগরে বালক সন্ন্যাসীদের দিনগুলি কিভাবে কাটত, পরে নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) তাব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন : 'বরানগর মঠে এমন এক-একদিন কাটতো, যখন আমাদের খাওয়ার কিছুই জুটতো না। ভাত থাকতো তো নুন থাকতো না। অনেকদিন কেবল নুনভাতই জুটতো তাতে কারো কোনও বেজার ছিল না। তেলাকুচোর পাতা সেদ্ধ, ভাত আর নুন, এই খাবার আমরা মাসের পর মাস খেতাম। যাই ঘটুক, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না। আমরা ধর্ম-চর্চা ও ধ্যানধ্যারণার বন্যায় ভেসে চলেছিলাম।' সন্ন্যাসীদের কৌপীন ও বস্ত্রগুলিই ছিল পরিচ্ছদ। ছিল একখানি এজমালী চাদর। সেটি দড়িতে ঝোলানো থাকতো। কেউ বাইরে গেলে সেটি কাঁধে ফেলে বেরুতেন। বরানগর মঠে ধর্মচর্চা, ধ্যান ও উপাসনা ছাড়াও চলতো দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান

নিয়ে চর্চা। এ সব ব্যাপারে নরেনই ছিলেন মধ্যমণি। হিন্দু পূজাপার্বণকালে তাঁরা সবই করতেন। শিবরাত্রির উৎসব ছিল একটি বিশেষ উৎসব। নরেন্দ্রের রচিত শিবস্তোত্র তাঁরা গাইতেন। ভস্ম মাখতেন। হর হর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করতেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে বলরাম বাবুর মা বালক-সন্ন্যাসীদের আঁটপুরে তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান। বালক-সন্ন্যাসীদের আগমনে এই বাড়িটি একটি মঠে পরিণত হ'লো। একদিন রাত্রিতে তাঁরা ধূনী জ্বালিয়ে তার চারপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। নরেন তাঁদের যিশুর জীবনী ও বাণী শোনাচ্ছিলেন। নক্ষত্রখচিত নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ও নরেনের কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করলো। একে একে সকলে ভগবানের নামে ত্যাগ, প্রেম ও সেবার মন্ত্র গ্রহণ করলেন। তাঁরা তখনও জানতেন না যে, ঐদিন ছিল যিশুর জন্মের পূর্বরাত্রি ক্রিসমাস ইভ। পরে তাঁরা জেনে আশ্চর্য হয়েছিলেন। আঁটপুর থেকে বরানগরে ফিরবার পথে তাঁরা তারকেশ্বরে গিয়ে মহাদেবের আরাধনা করলেন।

এই সময়ে তাঁরা বিরজা ব্রত ক'বে চিরকৌমার্য ও দারিদ্র্যের শপথ গ্রহণ করলেন। তাঁদের পুরাতন নামগুলি ত্যাগ ক'রে তাঁরা গ্রহণ করলেন সন্ন্যাসীর নূতন নাম। রাখাল হলেন ব্রহ্মানন্দ, যোগিন যোগানন্দ, বাবুরাম প্রেমানন্দ, নিরঞ্জন নিরঞ্জনানন্দ, শশী রামকৃষ্ণানন্দ, হরি তুরীয়ানন্দ, তারক শিবানন্দ, কালী অভেদানন্দ, লাটু অদ্ভুতানন্দ, সারদা ত্রিগুণাতীতানন্দ, শরৎ সারদানন্দ, গঙ্গাধর অখণ্ডানন্দ, বড় গোপাল স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও সুবোধ সুবোধানন্দ। কয়েক বছর বাদে হরিপ্রসন্ন স্বামী বিরজানন্দ নাম গ্রহণ করেন। নরেন কিন্তু কোন স্থায়ী নাম গ্রহণ করেন না। তিনি পর্যটনকালে আত্মপরিচয় গোপনের জন্যে প্রায়ই নূতন নাম গ্রহণ করতেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে খেতরির মহারাজার অনুরোধে তিনি বিবেকানন্দ নাম নেন। এই নামেই তিনি অমর হয়েছেন।

কিছুদিন মঠে থাকবার পর তরুণ সন্ন্যাসীদের মনে তীর্থভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠলো। অথচ ঠাকুরের পুণ্য স্মৃতিকে ঘিরে যে মঠ তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তার আকর্ষণও তাঁদের কাছে কম ছিল না। একদিন গোপনে বালক সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) মঠ ত্যাগ করলে এই বালক কোথায় কি বিপদে পড়বে ভেবে নরেন অত্যন্ত অস্থির হলেন। এই সময়ে সারদার লেখা একখানি চিঠি তাঁর হাতে এলো। তাতে সারদা লিখেছেন, "আমি পদব্রজে বৃন্দাবন যাচ্ছি। আমার পক্ষে এখানে থাকা বিপজ্জনক। কে জানে কখন মনের পরিবর্তন হয়। আমি পিতামাতা ও পরিজনকে স্বপ্নে দেখি। আমি স্বপ্নে মূর্তিমতী মায়ার দ্বারা প্রলুব্ধ হচ্ছি। দুবার আমাকে যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। বস্তুতঃ দুবার আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। তাই আমি দীর্ঘপথ পদব্রজে তীর্থযাত্রায় বার হলাম।" পত্র পেয়ে নরেন বললেন, "সারদা ঠিকই বলেছে। আমিও এমনি একই ভাব মাঝে মাঝে বোধ করি।"

অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও অনেকে তীর্থভ্রমণে বেরুলেন। শেষ পর্যন্ত নরেনও অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি অনুভব করলেন, কেবল তাঁর আত্মীয়-স্বজনের নয়, মঠবাসী সন্ন্যাসীদের চিন্তাও তাঁর ভগবৎ-উপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়ে উঠছে। তাই তিনিও শীঘ্রই অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মতোই অজানা পথে বেরিয়ে পড়বার সিদ্ধান্ত করলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত অবশ্য তিনি বৈদ্যনাথধাম, শিমুলতলা, ও আঁটপুর ছাড়া মঠ ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

তাঁর এই ভারত পরিক্রমার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি কোন রোজনামচা রাখেননি। পরে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে যেসব উক্তি করেছেন, বা যাঁদের সঙ্গে ভ্রমণকালে তাঁর দেখা হয়েছিল, তাঁদের স্মৃতিকথা, ও ভ্রমণকালে গুরুভাইদের কাছে লেখা তাঁর চিঠি থেকে এই পর্যটনের বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর ভ্রমণকালে

রামকৃষ্ণানন্দ ও অদ্ভুতানন্দ ছাড়া অন্যান্য সন্ন্যাসীদের কেউ না কেউ প্রায়ই সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের স্মৃতিকথা বহু তথ্য জুগিয়েছে। সর্ব-প্রথম যে তীর্থ যাত্রার কথা সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেছে, তা হ'লো তাঁর কাশীযাত্রা। এখানে তিনি সপ্তাহকাল ছিলেন। এখানে পূত-তোয়া গঙ্গা, অসংখ্য পুণ্যার্থী, শত শত মন্দির এবং বুদ্ধ ও শঙ্করের অমৃত বাণী তাঁকে উদ্দীপিত ক'রে তোলে। এখানে একদিন পথে তাঁকে একদল বানর তাড়া করলে তিনি ছুটে পালাতে থাকেন। তখন একজন সন্ন্যাসী তাঁকে চীৎকার ক'রে ডেকে বলেন, "দাঁড়াও! পালিও না! সর্বদা বর্বরদের সম্মুখীন হও!" তা শুনে নরেন ঘুরে দাঁড়ালেন। বানররা ভয় পেয়ে পালালো। "পালিও না! সম্মুখীন হও!" এই বাণী নরেনের অন্যতম মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এখানে তিনি দ্বারকাদাসের আশ্রমে থাকতেন। দ্বারকাদাস তাঁকে বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত ও লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ভূদেববাবু এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিচারশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, বলেছিলেন, "ভবিষ্যতে এই তরুণ একজন মহামানব হবে।" নরেন এখানে মহা-সাধক ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দর্শন লাভ করেন। বহু বৎসর পূর্বে রাম-কৃষ্ণও এই মহাসাধকের দর্শনলাভের জন্য গিয়েছিলেন। নরেন বিখ্যাত পণ্ডিত স্বামী ভাস্করানন্দজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বারণসী থেকে নরেন বরানগরে ফিরে আসেন।

অল্প কয়েকদিন বাদেই তিনি আবার তীর্থদর্শনে বার হন। তিনি প্রথমে বারাণসীতে আসেন। এখানে প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রমদাদাস মিত্র ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে কোনও সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'লে নরেন প্রায়ই প্রমদাবাবুকে পত্র লিখতেন।

বারাণসী থেকে তিনি অযোধ্যা যান। শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিপবিত্র

অযোধ্যা তাঁকে মুগ্ধ করে। অযোধ্যা থেকে তিনি যান লখ্‌নৌ। লখ্‌নৌ থেকে আগ্রা। লখ্‌নৌয়ের প্রাসাদ, বাগিচা, মসজিদ তাঁকে মুগ্ধ করে। আগ্রার তাজমহল দেখে তিনি বলেন, "এই অপূর্ব ভবনটি ঠিকমতো দেখতে হ'লে কমপক্ষে ছমাস লাগবে।" আগ্রার বিখ্যাত কিল্লা তাঁর সম্মুখে অতীত ভারতের বীর্য ও ঐশ্বর্যের চিত্র তুলে ধরে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছেন। শেষ ত্রিশ মাইল তিনি দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে পদব্রজে যান। বৃন্দাবনের মাইল দুই দূরে তিনি দেখেন একটি লোক পথের ধারে ব'সে আরাম ক'রে তামাক খাচ্ছে। পথশ্রান্ত নরেনের তামাক খেতে ভারী ইচ্ছে হ'লো, তিনি কলকেটির জন্যে হাত বাড়ালেন। লোকটি সসম্ভ্রমে সংকুচিত হয়ে জানালো, সে মেথর। সংস্কারবশে নরেন হাত গুটিয়ে নিয়ে পথ চলতে শুরু করলেন। কিন্তু মুহূর্তে তাঁর চমক ভাঙলো। একি করছেন তিনি! তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর জাতকুলের বিচার! তিনি দ্রুত লোকটির কাছে ফিরে গেলেন এবং সানন্দে মেথরের কলকেয় তামাক খেলেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছে তিনি লালাবাবুর কুঞ্জে অতিথি হলেন। ওই মন্দিরটি বলরামবাবুর পূর্বপুরুষরা নির্মাণ করেছিলেন। রাধাকুঞ্জের পুণ্যস্মৃতিজড়িত বৃন্দাবন নরেনের মধ্যে ভাবাবেগের বন্যা আনলো। তিনি বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে বহুস্থানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি গিরি-গোবর্ধন দর্শন করলেন এবং এই পর্বত প্রদক্ষিণ-কালে তিনি শপথ করলেন যে, অযাচিত অন্ন ছাড়া তিনি কখনও কিছু গ্রহণ করবেন না। শপথ গ্রহণের প্রথম দিনে দুপুরে তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। ক্ষুধায় ও ভ্রমণে অবসন্ন দেহটাকে তিনি কোনরকমে টেনে নিয়ে চললেন। হঠাৎ কে তাঁকে পেছন থেকে ডাকতে লাগলো। তিনি সেদিকে প্রথমে কান দিলেন না। কিন্তু ডাক ক্রমেই কাছে এল। নরেন যেন এই দান সত্যই ভগবানের কিনা তা পরীক্ষা করবার ইচ্ছাতেই ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে প্রায় ছুটতে লাগলেন। লোকটিও

তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো এবং প্রায় মাইল খানেক ছুটবার পরে তাঁর নাগাল পেলো। তখন নরেন তার কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করলেন। লোকটি নীরবে খাবার দিয়ে নীরবেই চলে গেল। ভক্তকে ভগবান্ কিভাবে রক্ষা করেন, তা নরেন চাক্ষুষ দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

গোবর্ধন থেকে নরেন রাধাকুঞ্জ দর্শনে গেলেন। তখন তাঁর দেহ আচ্ছাদনের জন্যে একটি মাত্র কৌপীন সম্বল ছিল। আর পরবার কিছু না থাকায় তিনি স্নান করবার সময়ে কৌপীনটি খুলে পরিষ্কার ক'রে কুণ্ডের পাড়ে শুকোতে দিয়েছিলেন। স্নান-শেষে তিনি দেখলেন, কৌপীনটি নেই। অনেক সন্ধান ক'রে দেখলেন, একটি বানর সেটি হাতে নিয়ে গাছে বসে আছে। বানরটিকে তিনি অনুনয় করলেন, কিন্তু বানরটা মুখভঙ্গি করলো মাত্র, কৌপীনটি ফিরিয়ে দিলো না। এখন নগ্ন অবস্থায় কিভাবে তিনি পরিভ্রমণ করবেন, তা স্থির করতে না পেরে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাধারানীর প্রতি তাঁর হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হ'লো। তিনি লোকালয় ত্যাগ ক'রে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং সংকল্প করলেন, যতোক্ষণ কোনও পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড না পান, ততক্ষণ তিনি অনশনে থাকবেন, প্রয়োজন হ'লে এইভাবেই দেহত্যাগ করবেন। এই সময় তিনি পিছন থেকে একব্যক্তির ডাক শুনতে পেলেন। লোকটির হাতে একখণ্ড নূতন গেরুয়া কাপড় ও কিছু আহার্য দ্রব্য। নরেন তা মন্ত্রমুগ্ধবৎ গ্রহণ করলেন। লোকটিও নিমিষে অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নরেন বিস্ময়াভিভূত হয়ে পুনরায় রাধাকুঞ্জে ফিরে এলেন। তাঁর বিস্ময় আরও বাড়লো, যখন তিনি দেখলেন যে, তিনি যেখানে তাঁর কৌপীনটি শুকোবার জন্যে মিলে দিয়েছিলেন, সেটি ঠিক সেখানেই সেই ভাবেই রয়েছে।

এরপর আমরা স্বামীজীকে দেখি, হরিদ্বারের পথে হাতরাস রেল-

স্টেশনে এক বৃক্ষতলে ক্লান্তদেহে বিশ্রাম করতে। শরৎচন্দ্র গুপ্ত নামে এক বাঙ্গালী ছিলেন হাতরাসের স্টেশনমাস্টার। শরৎবাবু জৌনপুরের মুসলমানদের মধ্যে লালিত হয়েছিলেন, তাই তিনি হিন্দী ও উর্দু বলতে পারতেন মাতৃভাষা বাংলার চেয়েও ভালোভাবে। তিনি স্টেশনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। এই তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখামাত্র তাঁর হৃদয় ভক্তিশ্রদ্ধায় পূর্ণ হ'লো। তিনি সন্ন্যাসীর পদধূলি নিয়ে বললেন, "আপনাকে পথশ্রান্ত ও ক্ষুধিত মনে হচ্ছে। আপনি কি দয়া ক'রে আমার বাড়িতে পদধূলি দেবেন?" স্বামীজী এই তরুণ ভক্তটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপে জানতে পারলেন, স্বামীজীর এক পুরাতন বন্ধু, ব্রজেনবাবু, এখানে থাকেন। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে আহারের পর স্বামীজী ব্রজেনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দেখতে দেখতে হাতরাসের বাঙ্গালী অধিবাসীরা প্রায় সকলেই স্বামীজীর অনুরাগী হয়ে উঠলো। স্বামীজী এখানে কিছুদিন রয়ে গেলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর শত শত অনুরাগী মিলিত হ'তে লাগলেন। স্বামীর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও আলোচনা তাঁদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখলো। একদিন শরৎ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে প্রায়ই বিষণ্ণ দেখি কেন?" স্বামীজী বললেন, "আমার গুরু আমার ওপর এক মহান দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রে গেছেন—এদেশে কোটি কোটি মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন ঘটানোর ও তাদের দুটি অন্নের ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্বের গুরুত্ব ও নিজের শক্তির ক্ষুদ্রতা দেখে আমি হতাশ হয়ে পড়ি। ভারতবর্ষকে জাগতে হবে, তাকে প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলতে হবে, সে তার অধ্যাত্ম-শক্তি দিয়ে দিগ্‌বিজয় করবে।" শরৎ বললেন, "আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন।" স্বামীজী বললেন, "তুমি কি ভিক্ষাভাণ্ড ও কমণ্ডলু নিয়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য পালনের জন্যে আত্মনিয়োগ করতে পারবে? তুমি কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারবে?" শরৎ নির্ভীকভাবে

ও নিঃসংকোচে বললেন, “নিশ্চয় পারব।” ব’লেই তিনি ভিক্ষাভাণ্ড হাতে নিয়ে স্টেশনের কুলিদের কাছ থেকে ভিক্ষা ক’রে আনলেন। স্বামীজী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। আনন্দে তাঁর অন্তর পূর্ণ হ’লো। এমনি কয়েক শত নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ তরুণ পেলে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রভুর আদেশ পালন করতে পারবেন।

কিছুদিন হাতরাসে থাকবার পর স্বামীজী শরৎকে বললেন, “আমি সন্ন্যাসী, আমাদের একস্থানে বেশীদিন থাকতে নেই। তাছাড়া, আমি তোমাদের স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। সুতরাং অবিলম্বে আমার এ স্থান ত্যাগ করা শ্রেয়।” শরৎ স্বামীজীকে তাঁর শিষ্য ক’রে নেওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। স্বামীজী বললেন, “তুমি কি মনে কর যে, আমার শিষ্য হ’লেই তোমার আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হবে? মনে রেখো, সর্বভূতে ভগবান্ আছেন। এই কথাটি মনে রেখে কাজ করলেই তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হ’তে পারবে।” কিন্তু শরৎ তাতে নিরস্ত হলেন না। তাঁর কাতর অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত শরৎকে দীক্ষা দিলেন। শরৎ পিতামাতার অনুমতি নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে হাতরাস ত্যাগ ক’রে হৃষীকেশের উদ্দেশে রওনা হলেন। এই শরৎই পরে স্বামী সদানন্দ নামে খ্যাত হয়েছেন।

শরৎ গুরুনির্দিষ্ট পথে কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। কিন্তু পথশ্রম ও সন্ন্যাসজীবনের কঠোরতা তাঁর অনভ্যস্ত শরীরে সহ্য হ’লো না। তিনি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হৃষীকেশ থেকে স্বামীজী শরৎকে নিয়ে হাতরাসে ফিরে এলেন। হাতরাসে স্বামীজীও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদে বরানগরে তাঁর গুরুভাইরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি যাতে দ্রুত বরানগরে ফিরে আসেন, সেজন্যে তাঁরা জানালেন যে, বরানগরে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তন একান্তই দরকার। কারণ সেখানে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বামীজী ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি

বরানগরে ফিরে এলেন। শরৎও সুস্থ হয়ে বরানগরে এলেন এবং রামকৃষ্ণ-সংঘভুক্ত হলেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দটা পুরোপুরিই প্রায় স্বামীজী বরানগরে ছিলেন। মাঝে মাত্র কিছুদিন তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি সিমুলতলা গিয়েছিলেন। বরানগর মঠে স্বামীজী গভীরভাবে হিন্দুশাস্ত্রগুলি পাঠ করেন এবং তাঁর গুরুভাইদের কাছে সকল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে ওঠেন। হিন্দুশাস্ত্র পাঠকালে হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি ও হিন্দু সমাজের উপর জগদ্দল পাথরের মতো তার অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বামীজী সচেতন হয়ে ওঠেন। বিশেষতঃ বর্তমান অবস্থায় জাতিভেদ প্রথা এবং তাঁর অযৌক্তিকতা ও নিপীড়নমূলক কঠোরতা তাঁকে বিচলিত ক'রে তোলে। ভারতীয় সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে হ'লে তাকে যে বেদ ও উপনিষদের উদার চিত্তির উপর স্থাপন করতে হবে, সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত হয়ে ওঠেন। বরানগরে থাকায় তাঁর পরিবারের—মা ও ভাইদের শোচনীয় দারিদ্র্য তাঁকে রাত্রিদিন স্বচক্ষে দেখতে হয়। মামলা শেষ হ'লেও মামলার ফলে তাঁর মা ও ভাইরা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তাই স্বামীজী বৈষয়িক ব্যাপারে পরিবারের কিছুটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আবার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে চাইলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পুনরায় তীর্থ-পরিক্রমায় বেরুলেন এবং বৈদ্যনাথ ধামে গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছেই তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাঁর অন্যতম গুরুভাই যোগানন্দ এলাহাবাদে পানিবসন্তে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বামীজী দ্রুত বৈদ্যনাথ-ধাম থেকে এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছলেন। কয়েক দিনের মধ্যে স্বামীজীর শুশ্রূষায় যোগানন্দ সুস্থ হয়ে উঠলেন। স্বামীজী এলাহাবাদের বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। তিনি এখানে তাঁদের সঙ্গে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং হিন্দুসমাজে যে সামাজিক অন্যায় ও

অবিচারগুলি প্রচলিত আছে, তার বিরুদ্ধে নির্মম আক্রমণ চালালেন। এখানে একজন মুসলমান সাধুর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন এবং শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্বীকার করেন যে, ইনি একজন পরমহংস। এখানে তিনি গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পওহারী বাবার কথা শোনেন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গাজীপুর যাত্রা করেন।

গাজীপুরে তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রায় গগনচন্দ্র রায় বাহাদুরের বাড়িতে থাকেন। এখানে অল্পদিনের মধ্যেই বহু লোক তাঁর অনুরাগী ভক্ত হয়ে ওঠেন। এখানকার লোকজনের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হন, কিন্তু তাঁদের পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা তাঁকে পীড়া দেয়। এখানে তিনি সমাজ-সংস্কারকদের সামাজিক রীতিনীতির উপর নির্মম আক্রমণ ত্যাগ ক'রে সাধারণ মানুষকে প্রেম ও ধৈর্যের দ্বারা কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলতে বলেন। তিনি বলেন, এইভাবেই সমাজে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে ভেতর থেকেই আসবে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

স্বামীজী গাজীপুর এসেছিলেন, পওহারী বাবার দর্শনেচ্ছায়। পওহারী বাবার জন্ম কাশীর নিকটে এক গ্রামে। বাল্যকালে তিনি গাজীপুরে আসেন এবং তাঁর এক আজীবন ব্রহ্মচারী পিতৃব্যের কাছে থেকে ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং রামানুজপন্থীদের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। পরে তিনি সত্যের সন্ধানে সারা দেশে ঘুরে বেড়ান। তিনি যোগে সিদ্ধিলাভ করেন এবং অদ্বৈত বেদান্তে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তিনি গাজীপুরে ফিরে আসেন এবং সেখানে নদীতীরে ভূগর্ভে কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকেন। কেবল একমুঠো নিমপাতা ও কয়েকটুকরো লঙ্কা ছিল তাঁর দৈনিক আহার। তিনি এমন স্বল্পাহারী ছিলেন যে, তিনি পরে 'পওহারী' বাবা বা বায়ুভুক্ সন্ন্যাসী নামে পরিচিত হন। যতোই দিন যেতে থাকে, ততোই তিনি বেশি সময় তাঁর ভূগর্ভস্থিত কোটরে কাটাতে থাকেন। অনেক

সময় মাসের পর মাস তিনি মাটির নিচেই কাটান। লোকে বিস্মিত হয়ে ভাবে, তিনি কিভাবে জীবনধারণ ক'রে আছেন। মাঝে মাঝে তিনি বাইরে আসতেন। তখন তিনি তাঁর বিবর-মুখে অবস্থিত একটি ছোট ঘরে দর্শনার্থীদের দেখা দিতেন। স্বামীজী যে এইরকম একজন সাধকের সাক্ষাৎলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবেন, তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু পওহারী বাবার দর্শন পাওয়া যাবে কিভাবে? শেষ পর্যন্ত স্বামীজী পওহারী বাবার দর্শন পেলেন। তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব স্বামীজীকে মুগ্ধ করলো। স্বামীজীকে দেখে পওহারী বাবাও মুগ্ধ হলেন। ঈশ্বর লাভে স্বামীজীকে শেষ পর্যন্ত তিনি সাহায্য করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন প্রতিশ্রুতি কদাচিৎ কারো ভাগ্যে জোটে।

ঐ সময় স্বামীজীর মনের মধ্যে দুটি স্রোত পাশাপাশি বইছিল। একটি ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতালাভ এবং সমাধিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মগ্ন থাকার আকাঙ্ক্ষা। অন্যটি দেশের জনসাধারণের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন ও দৈন্যদুঃখমোচন। দ্বিতীয়টির জন্যেই রামকৃষ্ণ তাঁকে কাজ ক'রে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং স্বামীজী যখন নির্বিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন ঠাকুর বলেছিলেন, "এখন এসব চাবি দেওয়া রইলো, তোর কাজ শেষ হ'লে আপনা থেকেই চাবি খুলবে।" কিন্তু পওহারী বাবাকে দেখবার পর স্বামীজীর মনে প্রথম আকাঙ্ক্ষাটিই প্রবলতর হয়ে উঠলো, তিনি সম্ভবতঃ সাময়িক-ভাবে তাঁর গুরুর নির্দেশ বিস্মৃত হলেন। তিনি যোগে সিদ্ধিলাভের জন্যে পওহারী বাবার শরণার্থী হলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁর সম্মুখে উদিত হয়ে তাঁর মনে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করলো। তিনি অশ্রুশিক্ত নয়নে ভূলুণ্ঠিত হয়ে বার বার ঠাকুরকে প্রণাম জানালেন এবং যোগে সিদ্ধিলাভের আশঙ্কা ত্যাগ ক'রে রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হলেন।

ইতিপূর্বে তিনি হৃষীকেশে অভেদানন্দজীর অসুস্থতার সংবাদ

পেয়েছিলেন। স্বামীজী অভেদানন্দজীকে হিমালয় ভ্রমণ ত্যাগ ক'রে বারাণসীতে ফিরে আসতে লিখলেন এবং প্রমদাদাসবাবুকে অভেদানন্দের দেখাশোনা করতে অনুরোধ জানালেন। পওহারী ব'বার প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ দেখে কোন কোন রামকৃষ্ণ-ভক্ত মনে করেছিলেন, স্বামীজী বুঝি রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস হারিয়েছেন। স্বামী প্রেমানন্দ এইরকম আশঙ্কা নিয়েই গাজীপুরে এসেছিলেন এবং স্বামীজীকে বারাণসীতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এতে স্বামীজী অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং প্রেমানন্দকে তিরস্কার করলেন। তারপর তিনি সকলের অজ্ঞাতে গাজীপুর থেকে কিছুদূরে এক গ্রামে গেলেন এবং সেখানে কয়েকদিন ধ্যানমগ্ন রইলেন। অভেদানন্দের অসুস্থতার সংবাদ শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিচলিত করলো এবং তিনি গাজীপুর থেকে বারাণসীতে এলেন। এই সময়ে বারাণসীতে থেকে কয়েকদিন কঠোর তপশ্চর্যা করবার ইচ্ছাও তাঁর মনে জাগরূক হয়েছিল। তিনি বারাণসীতে এসে অভেদানন্দের চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে প্রমদাদাসবাবুর বাগানে কিছুদিন রইলেন এবং সেখানে কঠোর তপশ্চর্যা শুরু করলেন। এই সময়ে ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছলো। ওই মানুষটি তাঁর রামকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি ও রামকৃষ্ণ-ভক্তদের প্রতি অপার স্নেহের জন্যে রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। স্বামীজী শোকে কাতর হলেন। একজন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর পক্ষে এইরকম শোক শোভন নয়, প্রমদাদাসবাবু এই ধরনের মত প্রকাশ করলে স্বামীজী তাঁকে বললেন, "ওভাবে বলবেন না। আমরা শুষ্ক সন্ন্যাসী নয়। কেন? আপনারা কি মনে করেন, কেউ সন্ন্যাসী হয়েছে ব'লে তার হৃদয় নেই?" বলরাম বসুর পরিবারের সকলেই ছিলেন রামকৃষ্ণভক্ত। তাদের সমবেদনা জানাতে ও সান্ত্বনা দিতে স্বামীজী দ্রুত বারাণসী থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন।

বরানগর মঠেও স্বামীজীর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। ১৮৯০

খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে রামকৃষ্ণ সংঘের পৃষ্ঠপোষক সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের (সুরেশবাবুর) মৃত্যু হয়েছিল। ফলে সংঘ আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। অনেক সময় একমুষ্টি অন্নের প্রশ্নও দেখা দিল। কিন্তু স্বামীজীর উপস্থিতি এই অনটনের মধ্যেও তরুণ সন্ন্যাসীদের প্রেরণা যোগাতে লাগলো। এই সময়ে স্বামীজী ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা করবার কথাও চিন্তা করেন। কিন্তু সুরেশবাবু ও বলরামবাবুর মৃত্যুতে প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে, তা বুঝতে পারেন না।

স্বামীজী বরানগরে দু মাস ছিলেন। আবার তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এখানে নানা সমস্যা নানা বন্ধনরূপে যেন তাঁকে বেঁধে ফেলছিল। এবার তিনি স্থির করলেন, কিছু পাথেয় সংগ্রহ ক'রে প্রথমে যাবেন আলমোড়া। আলমোড়া থেকে যাবেন গঙ্গার তীরে গাড়োয়াল জেলার কোন জায়গায় এবং সেখানে সত্যের সন্ধানে সাধনা করবেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর) ইতিপূর্বেই হিমালয় ভ্রমণ ক'রে এসেছিলেন। তাঁর কাছে স্বামীজী হিমালয়ের ওপরে অবস্থিত তিব্বত ও পামীর সম্পর্কে নানা মনোরম কাহিনী শুনেছিলেন। তাই প্রাচীন তপোভূমি হিমালয় এবার তাঁকে ডাক দিল। স্বামীজী অখণ্ডানন্দকেও সঙ্গে নিলেন। হিমালয়-যাত্রার পূর্বে তিনি একবার ঘুসুড়িতে শ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বরানগর মঠ ত্যাগ ক'রে স্বামীজী প্রথমে ভাগলপুরে এলেন। এখানে তিনি কয়েকদিন ছিলেন। সেখান থেকে গেলেন দেওঘর। দেওঘরে তিনি শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ধর্মালোচনা করলেন। তারপর দেওঘর থেকে গেলেন কাশী। কাশী থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তিনি প্রমদাদাসবাবুকে বললেন, "আমি যখন ফিরে আসব, তখন সমাজের ওপর বোমার মতো ফেটে পড়ব এবং সমাজ আমার অনুবর্তী হবে।"

তারপর তিনি অযোধ্যা ও নৈনিতাল হয়ে আলমোড়ায় এসে পৌঁছলেন। এখানকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরি সাহা স্বামীজীর ও তাঁর সঙ্গীর জন্যে তাঁর বাগানবাড়িটি ছেড়ে দেন। সারদানন্দজী ও কৃপানন্দজীও এই অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁরা স্বামীজীর আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। আলমোড়ায় থাকার সময়েই স্বামীজী তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে তারযোগে তাঁর এক ভগ্নীর আত্মহত্যার সংবাদ পান। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিগত দুঃখ অচিরে দেশব্যাপী কোটি কোটি নারীর শোচনীয় অবস্থার মূর্তি নেয়। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক ও ঐহিক মুক্তির সঙ্গে নারীজাতির মুক্তিও অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে।

অতঃপর স্বামীজী অখণ্ডানন্দ, সারদানন্দ ও কৃপানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গাড়োয়ালের পথে অগ্রসর হন। আলমোড়া থেকে তাঁরা বদরিকাশ্রমের পথে কর্ণপ্রয়াগে এসে পৌঁছেন। কিন্তু সরকার দুর্ভিক্ষের জন্যে কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের পথ বন্ধ করায় বদরিকাশ্রমে তাঁরা যেতে পারেন না। কর্ণপ্রয়াগ ত্যাগ করবার পর স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ পথে একটি চটিতে জ্বরাক্রান্ত হন। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে তাঁরা সপ্তাহকাল পরে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কিছু দূরে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ পুনরায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। সৌভাগ্যবশতঃ গাড়োয়াল জেলার সদর আমিন বদরি দত্ত যোশী এই সময় 'টুরে' বেরিয়েছিলেন। তিনি এই দুই সন্ন্যাসীর অসুস্থতায় বিচলিত হন এবং তাঁদের জন্যে আয়ুর্বেদিক ঔষধের ব্যবস্থা করেন। কয়েকদিন বাদে তাঁরা একটু সুস্থ হ'লে তিনি গাড়িতে ক'রে তাঁদের ন' মাইল দূরে শ্রীনগরে পৌঁছে দেন। আলমোড়া থেকে শ্রীনগর প্রায় একশ বিশ মাইল পথ। এই সুদীর্ঘ পার্বত্য পথ তাঁরা অসুস্থতার মধ্যেও মাত্র দু সপ্তাহে অতিক্রম করেছিলেন। এর মধ্যে ভগবৎ-চিন্তা, উপাসনা, ধ্যান, ধর্মালোচনা, ভিক্ষা, সবই ছিল।

শ্রীনগরে পৌঁছে তাঁরা অলকানন্দা নদীর তীরে একটি নির্জন কুটিরে আশ্রয় নিলেন। এখানে প্রায় একমাস তাঁরা ছিলেন। মাধুকারী ক'রেই তাঁরা অন্নের সংস্থান করতেন। স্বামীজী এখানে তাঁর সতীর্থদের ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রধান উপনিষদ্‌গুলি পড়ান। এখানে দিনগুলি ধ্যান, উপাসনা ও শাস্ত্রচর্চায় কাটে। এখানকার একজন হিন্দু শিক্ষক কিছুদিন পূর্বে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এমন ওজস্বিনী ভাষায় প্রমাণ দেন যে, সেই শিক্ষক পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীনগর থেকে তাঁরা যান তেহ্‌রি। এখানে তাঁরা তেহ্‌রির দেওয়ান বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হন। রঘুনাথ স্বামীজীর গণেশপ্রয়াগ দর্শনের জন্যে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ওই সময় অখণ্ডানন্দ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্থানীয় ডাক্তাররা তাঁর ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে, সুতরাং তাঁদের আসন্ন শীতের সময়ে সমতল ভূমিতে নেমে আসা প্রয়োজন ব'লে পরামর্শ দেন। স্বামীজী রঘুনাথবাবুকে একথা জানালে তিনি স্বামীজীর ও অখণ্ডানন্দের দেরাদুন যাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং দেরাদুনের সিভিল সার্জনের কাছে পরিচয়পত্র লিখে দেন। দেরাদুনের সিভিল সার্জন ম্যাক্লেরেন সাহেব ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে বলেন যে, রোগীর ব্রংকাইটিস হয়েছে, কিছুদিন সমতলভূমিতে সুচিকিৎসার প্রয়োজন। তখন স্বামীজী অখণ্ডানন্দের জন্যে একটি আশ্রয়ের সন্ধানে দেরাদুনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। শেষ পর্যন্ত দেরাদুনের এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও আইনজীবী পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ অখণ্ডানন্দের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। স্বামীজী ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা অন্যত্র থাকেন ও মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। এখানে স্বামীজী প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। অখণ্ডানন্দ একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে স্বামী অন্যান্য সঙ্গীর সঙ্গে হৃষীকেশ যাত্রা করেন।

তখনকার দিনে হৃষীকেশ একটি বনাকীর্ণ অঞ্চল মাত্র ছিল ঝোপঝাড় ও গাছপালার মধ্যে ছিল সাধুদের জন্যে নির্মিত কুটির। প্রতি বৎসর শীতকালে ওখানে হাজার হাজার যোগী ও সন্ন্যাসী সমবেত হতেন এবং শাস্ত্র-পাঠ, যোগ ও ধ্যানে কালাতিপাত করতেন। গঙ্গাবেষ্টিত এই পার্বত্য উপত্যকাটি ভগবৎ-পিপাসুদের মিলনক্ষেত্র ছিল। এখানে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে একটি কুটিরে বাস করতেন। এখানে কঠোর তপস্যার জন্যে স্বামীজী প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি প্রবল জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাই এ সংকল্প ত্যাগ করতে হ'লো। তাঁর অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠলো, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন, এমন কি তাঁর নাড়ীর স্পন্দনও প্রায় থেমে এলো। তাঁর সঙ্গীরা ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এমন সময় একজন স্থানীয় লোক এসে মধুর সঙ্গে কিছু গাছ-গাছড়ার ঔষধ স্বামীজীর মুখে জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিল। স্বামীজী সুস্থ হয়ে উঠলেন। তখন স্বামীজীকে তাঁর গুরুভাইরা হরিদ্বারে নিয়ে গেলেন। হরিদ্বার থেকে তাঁরা শাহরনপুর ও শাহরনপুর থেকে মীবাটে গেলেন। এই অসুখে স্বামীজীর শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল, জ্বর প্রায়ই ফিরে ফিরে হচ্ছিল। আরও কিছুদিন তাঁর চিকিৎসা চললো। স্বামীজী ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পেলেন। মীরাটে স্বামীজী এক শেঠজীর বাগানে থাকতেন। এখানে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া এখানে ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি অন্যান্য সন্ন্যাসীরা আসায় এই বাগান-বাড়িটি একটি নিয়মিত মঠে পরিণত হয়েছিল। স্বামীজী সংস্কৃত সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সতীর্থদের পড়ে শোনাতেন। এই সময়ে তিনি স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে অখণ্ডানন্দকে স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলী আনতে বলেন।

অখণ্ডানন্দ গ্রন্থাগার থেকে যে সব বই আনতেন, সেগুলি পরদিনই ফেরত পাঠানো হ'তো এবং বলা হ'তো যে, স্বামীজীর

বইগুলি পড়া হয়ে গেছে। লাইব্রেরিয়ান এ কথা বিশ্বাস করলেন না, বললেন, "তা অসম্ভব।" ফলে স্বামীজী নিজে একদিন গ্রন্থাগারিককে বললেন, "দেখুন, ঐসব বইগুলিই আমার পড়া হয়ে গেছে। যদি আপনার সন্দেহ থাকে, তবে ঐগুলি থেকে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন।" গ্রন্থাগারিক ভদ্রলোক কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে বুঝলেন, স্বামীজী ঐ বইগুলি খুব ভালোভাবেই পড়েছেন। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। পরে অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি ভাবে তা পারেন?" স্বামীজী বললেন, "আমি word by word পড়ি না, আমি sentence by sentence, অনেক সময় paragraph by paragraph পড়ি।"

স্বামীজী মীরাটে প্রায় পাঁচ মাস ছিলেন। তিনি পুনরায় অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, গুরুভাইদের প্রতি স্নেহমমতাও মায়া! তিনি ভগবানের নির্দেশ পেয়েছেন, তাই পুনরায় তিনি নি সঙ্গ সন্ন্যাসীরূপে সত্যের সন্ধানে বার হবেন। তিনি সকলপ্রকার মায়াকেই ছিন্ন করবেন! ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষার্ধে তিনি একাকী দিল্লী রওনা হলেন।

স্বামীজী বিবিদিশানন্দ নামে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। তিনি দিল্লীতে সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং প্রাসাদ, সমাধি, দুর্গ, প্রাচীন কীর্তি যা কিছু, সবই দেখেন। একদিকে মানুষের শক্তি, কীর্তি ও অহংকারের নশ্বরতা এবং অন্যদিকে ভারতের অতীত গৌরব সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। স্বামীজী এখানে কিছুদিন থাকেন। এখানেও তাঁর ধর্মালোচনা বহু ব্যক্তিকে তাঁর প্রতি অনুরক্ত ক'রে তোলে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আলোয়ার স্টেশনে পৌঁছেন। এখানে দেশীয় রাজ্যের হাসপাতালে একজন বাঙ্গালী, গুরুচরণ লস্কর, ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। স্বামীজী তাঁকে এখানে সন্ন্যাসীর থাকবার উপযুক্ত কোন স্থান আছে কিনা জিজ্ঞাসা

করলে তিনি সানন্দে তাঁকে একটি দোকানের উপর-তলার একটি ঘর দেখিয়ে দেন এবং তাঁর থাকবার সুবন্দোবস্ত করেন। গুরুচরণবাবু স্বামীজীর সঙ্গে নিকটবর্তী হাইস্কুলের উর্দু ও ফারসীর শিক্ষক এক মৌলবীর পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজী মৌলবী সাহেবের সঙ্গে কোরান নিয়ে বহু আলোচনা করেন। গুরুচরণ ও মৌলবী সাহেব উভয়েই স্বামীজীর পাণ্ডিত্যে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন। স্বামীজীর অসাধারণত্বের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য দর্শনার্থী এসে জড় হয়। স্বামীজী তাঁদের ধর্মোপদেশ দেন এবং উর্দু, হিন্দী ও বাংলার বহু ভক্তিমূলক গান গেয়ে শোনান। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, বাইবেল ও কোরান থেকে তিনি অনর্গল যেসব আবৃত্তি করেন, তাও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তিনি বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর ও রামকৃষ্ণের জীবন ও কথামৃত তাঁদের শোনান। স্বামীজীর খ্যাতি দ্রুত সারা আলোয়ারে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব, শৈব, শিয়া, সুন্নী—সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেই দলে দলে তাঁকে দেখতে আসে। তাঁর দর্শনার্থীর ভীড় এতই বাড়তে থাকে যে, এক অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের গৃহে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়। তিনি গেরুয়া পরেন কেন, একজন তাঁকে এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, কারণ গেরুয়া ভিক্ষুকের পরিধান। আমি যদি সাদা পোশাক পরি, তবে গরীব লোকে আমার কাছে ভিক্ষা চাইবে। আমি নিজে ভিক্ষুক, অনেক সময় আমি একেবারে কপর্দকহীন থাকি, কেউ আমার কাছে ভিক্ষা চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিতে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু গেরুয়া দেখলে তারা বুঝবে আমিও ভিক্ষুক। ভিক্ষুক ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করে না।

এখানে মৌলবী সাহেব স্বামীজীর অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি স্বামীজীকে নিজ-গৃহে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে চান। তিনি জানতেন, স্বামীজী আপত্তি করবেন না। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা

হয়তো আপত্তি করবেন। তাই তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর বাসগৃহের আসবাবপত্র সবই ব্রাহ্মণদের দিয়ে ধৌত করাবেন, আহার্য ব্রাহ্মণের দ্বারা পাক করাবেন এবং দূরে থেকে স্বামীজীর আহার দর্শন করবেন। মৌলবীর ভক্তিতে স্বামীজী অভিভূত হয়ে পড়েন। এবং তিনি মৌলবীর গৃহে আহার করেন। অন্যান্য বহু মুসলমান ভক্তও তাঁকে মৌলবীজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে নিজ নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন।

পরে আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী স্বামীজীর কথা লোকমুখে শুনে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যান। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বুঝতে পারেন, এঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আলোয়ারের পাশ্চাত্য-অনুকরণপ্রিয় রাজা মঙ্গল সিংয়ের উপকার হবে। তিনি মহারাজাকে জানান যে, আলোয়ার রাজ্যে একজন ইংরেজীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন সন্ন্যাসী এসেছেন। মহারাজ ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। পরদিনই মহারাজা দেওয়ানের বাড়িতে আসেন এবং স্বামীজীর দর্শনমাত্র মুগ্ধ হয়ে তাঁর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন।

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজা স্বামীজীকে বলেন, "আপনি একজন বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি তো ইচ্ছা করলে বহু অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আপনি ভিক্ষা করেন কেন?" স্বামীজী এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাজাকে প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, আপনি রাজা, আপনি রাজকর্মে অবহেলা ক'রে সর্বদা সাহেব-সুবোর সঙ্গে মেলামেশা এবং শিকার ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকেন কেন?" স্বামীজীর এই কঠোর প্রশ্নে রাজার উপস্থিত পরিষদবর্গ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু মহারাজা শান্তভাবেই বলেন, "জানি না, কেন। তবে এটা যে আমার ভালো লাগে, তাতে সন্দেহ নেই।" স্বামীজী বললেন, "ঠিক এই কারণেই আমি ভিক্ষুক হয়ে ঘুরে বেড়াই।"

মহারাজা প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজী, আমি তো পুতুল পূজায়

বিশ্বাস করি না। আমার কপালে কি আছে?" স্বামীজী বললেন, "আপনি পরিহাস করছেন।" মহারাজা বললেন, "সত্যই আমি পরিহাস করছি না। আমি অন্যান্য লোকের মতো কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতু দিয়ে তৈরি দেবদেবীর মূর্তির উপাসনা করতে পারি না। এতে পারলৌকিক জীবনে কি আমার ক্ষতি হবে?" স্বামীজী বললেন, "না। প্রত্যেক লোকেরই নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে ধর্ম-সাধনার অধিকার আছে।"

স্বামীজী পৌত্তলিকতার বিরোধী নয়, সকলেই জানতেন। তাই তাঁরা স্বামীজীর উত্তরে বিস্মিত হলেন। কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্য তখনো শেষ হয় নি। মহারাজার একটি প্রতিকৃতি দেওয়ালে টাঙানো ছিল, স্বামীজী সেটিকে নামিয়ে আনতে বললেন এবং সেই প্রতিকৃতির উপর দেওয়ানকে থুতু ফেলতে বললেন। উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠলেন। স্বামীজী বললেন, "আসুন, আপনারা যদি পারেন, তবে এই ছবির উপর থুতু ফেলুন। এ তো এক টুকুরো কাগজ মাত্র। আপনাদের মহারাজার রক্তমাংস অস্থি কিছুই নেই এতে। মহারাজার মতো নড়ে না, কথা বলে না। কই, আপনারা কেউ থুতু দিতে পারলেন না তো? কারণ, আপনারা ভাবছেন, ছবিতে থুতু দিলে মহারাজাকে অপমান করা হবে। আপনারা এই ছবির মধ্যে আপনাদের মহারাজাকেই দেখছেন। এইভাবে যাঁরা পুতুল পূজো করেন, তাঁরাও ইষ্টদেবকে পুতুলের মধ্যেই দেখেন।"

স্বামীজীর কথাগুলি মহারাজা মনোনিবেশ সহকারে শুনছিলেন। তিনি করজোড়ে বললেন, "পৌত্তলিকতার এই অর্থ আমি এতোদিন বুঝি নি। আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন।"

পরে মহারাজ দেওয়ানকে বললেন, তিনি যেন স্বামীজীকে আরও কিছুদিন তাঁর রাজ্যে থাকতে বলেন। স্বামীজীকে দেওয়ান এ বিষয়ে অনুরোধ করলে তিনি জানালেন, তিনি সন্ন্যাসী, একস্থানে বেশিদিন থাকা তাঁর উচিত নয়। তবু দেওয়ানজীর ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি

কিছুদিন আলোয়ারে রইলেন। তবে তাঁর এক শর্ত রইলো, তাঁর অবস্থানকালে ধনী দরিদ্র আপামর জনসাধারণ যে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তাকেই সে সুযোগ দিতে হবে। অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীজী আলোয়ার রাজ্যে মহারাজা থেকে দরিদ্রতম প্রজাটি পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের উপর অসাধারাণ প্রভাব বিস্তার করলেন। স্বামীজী এখানে সাত সপ্তাহ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত অশ্রুজলে তাঁকে বিদায় দিলেন। তাঁর বহু শিষ্য অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট মাইল পথ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন। স্বামীজী প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন।

স্বামীজী পাণ্ডুপোলে হনুমানজীর মন্দির দর্শন করলেন। ঐ রাত্রি স্বামীজী মন্দির প্রাঙ্গণেই কাটালেন। তারপর শিষ্যদের নিয়ে ষোল মাইল শ্বাপদসঙ্কুল পার্বত্য পথ পার হয়ে পৌঁছলেন তাহ্‌লা গ্রামে। এখানে তিনি নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রাতে তাঁরা আঠারো মাইল দূরে অবস্থিত নারায়ণী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এই গ্রামে কালিকা দেবীর পুজো হয় এবং প্রতি বৎসর এখানে পুজো উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। ঐ মেলায় মাকে দেখবার জন্যে রাজপুতানার সর্বত্র থেকে অসংখ্য নরনারী আসেন। এখানে স্বামীজী তাঁর অনুচরদের বিদায় দিলেন এবং পুনরায় নিঃসঙ্গ যাত্রা শুরু করলেন। প্রায় ষোল মাইল দূরে একটি রেল স্টেশনে পৌঁছে তিনি ট্রেনে ক'রে জয়পুর রওনা হলেন। জয়পুরে তাঁর এক শিষ্যের কাতর অনুনয়ের ফলে স্বামীজী তাঁর একটি ফটো তুলতে দেন। এটিই স্বামীজীর পরিব্রাজক বেশে প্রথম ফটো।

স্বামীজী জয়পুরে দু সপ্তাহ ছিলেন। এখানে তিনি একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণের কাছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়তে শুরু করেন। পণ্ডিতজী তিন দিন ক্রমাগত চেষ্টা ক'রেও স্বামীজীকে প্রথম সূত্রটির ভাষ্য আয়ত্ত করাতে পারলেন না। তখন তিনি স্বামীজীকে বললেন, "ক্রমাগত তিন দিন চেষ্টা ক'রেও যখন আপনাকে একটি সূত্র বোঝাতে

পারলাম না, তখন আমার কাছে প'ড়ে কি লাভ বলুন।" স্বামীজী খুবই লজ্জা পেলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, যতোক্ষণ তিনি এই সূত্রটি আয়ত্ত করতে না পারেন, ততোক্ষণ আহার বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করবেন না। এখন তিনি পণ্ডিতজীর সাহায্য ছাড়া নিজেই চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তিন ঘণ্টা বাদে পণ্ডিতজীর কাছে ফিরে এলেন। পণ্ডিতজী স্বামীজীর মুখে সূত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে বিস্মিত হলেন। অতঃপর স্বামীজী অনন্যচিত্ত হয়ে পণ্ডিতজীর কাছে পাঠ নিতে লাগলেন এবং পক্ষকালের মধ্যেই অষ্টাধ্যায়ী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করলেন।

জয়পুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিংয়ের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে স্বামীজী প্রায়ই শাস্ত্রালোচনা করতেন। সর্দারজী বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তিনি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না। একদিন রাজপথে স্বামীজী ও সর্দারজী দেখলেন একদল ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-সহ শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে। স্বামীজী সহসা সর্দারজীকে স্পর্শ ক'রে বললেন, "ঐ দেখুন ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।" সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজীর ভাবান্তর হ'লো, তিনি অশ্রুসিক্তনয়নে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে তাঁর চেতনা ফিরে এলে তিনি বললেন, "স্বামীজী, বহুবার তর্ক ক'রে যা বুঝতে পারিনি, আপনার স্পর্শে তা মুহূর্তে বুঝলাম।"

একদিন স্বামীজীর ভক্তদের এক আলোচনা-সভায় পণ্ডিত সূরজ-নারায়ণ নামে এক বেদান্তী পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে বললেন, "আমি বেদান্তবাদী, আমি হিন্দুর পুরাণে ও অবতারে বিশ্বাস করি না। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। আমার সঙ্গে অবতারের পার্থক্য কি?" স্বামীজী পরিহাসচ্ছলে পণ্ডিতজীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "তা ঠিক। তবে হিন্দুরা কচ্ছপ, মৎস্য ও বরাহকেও অবতার বলে। ওগুলির মধ্যে আপনি কোনটি?" সভায় হাসির রোল উঠলো। পণ্ডিতজী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নীরব হলেন।

জয়পুর থেকে স্বামীজী গেলেন আজমীড়ে। সেখানে তিনি আবু পর্বতের এক গুহায় বাস করতে লাগলেন। কোটা দরবারের এক মুসলমান উকিল স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এই মুসলমান ভদ্রলোক স্বামীজীর সঙ্গে কোটার প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিং প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেন। কয়েকদিন বাদে তিনি খেতরির রাজার একান্ত সচিব মুন্সী জগমোহন লালকে নিমন্ত্রণ করেন। জগমোহন লাল যখন আসেন, তখন স্বামীজী কৌপীন-পরিহিত অবস্থায় একটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে দেখে ভাবলেন, এ সামান্য ভেকধারী সাধু মাত্র, চোর-বাটপাড়ও হ'তে পারে। স্বামীজী উঠে বসলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী। আপনি একজন মুসলমানের বাড়িতে আছেন? আপনার খাদ্য পানীয় এই মুসলমান ছুঁয়ে ফেলতে পারেন।" স্বামীজী বললেন, "আপনার এই প্রশ্নের অর্থ কি? আমি সন্ন্যাসী। আমি সমস্ত সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে। আমি একজন মেথরের সঙ্গে বসেও খেতে পারি। এতে ভগবানের ভয় নেই, কারণ এটা ভগবানের নির্দেশ। এতে শাস্ত্রেরও ভয় নেই, কারণ শাস্ত্রেও এরূপ নির্দেশ আছে। আমার ভয় আপনাদের মতো লোকদের ও আপনাদের সমাজকে। আপনারা ভগবান্ ও শাস্ত্রের ধার ধারেন না। আমি সর্বভূতে ব্রহ্ম জ্ঞান করি। আমার কাছে উচ্চ নীচ কি?" স্বামীজী শিব! শিব! ব'লে তন্ময় হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। জগমোহনের ভ্রান্ত ধারণা দূর হ'লো। তিনি স্বামীজীর অতিশয় অনুরাগী হয়ে উঠলেন। খেতরির রাজা তাঁর একান্ত সচিবের কাছে স্বামীজীর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাজা নিজেই গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু স্বামীজী রাজপ্রাসাদে এসে রাজাকে দর্শন দিলেন। রাজা সাদর অভ্যর্থনা ক'রে জিজ্ঞাসা

করলেন, "স্বামীজী! জীবনটা কি?" স্বামীজী বললেন, "একটি সত্তা ক্রমাগত আপনাকে বিকাশ ও প্রকাশ করতে চাইছে, আর বহিঃশক্তি তাকে ক্রমাগত দাবিয়ে রাখতে চাইছে; ফলে যে সংগ্রাম চলছে, তাই জীবন।") রাজা স্বামীজীকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং সেগুলির যথাযথ উত্তর শুনে মুগ্ধ হলেন। স্বামীজী তাঁকে রামকৃষ্ণের অমৃত জীবনের কথাও শোনালেন। খেতরির রাজা স্বামীজীকে খেতরিতে যাওয়ার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে স্বামীজী তাতে রাজী হলেন এবং আবু পর্বত থেকে তিনি খেতরিতে গেলেন। খেতরির রাজা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি স্বামীজীর কাছে তাঁর মনোবাসনা জানালে স্বামীজী তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর মনোরথ পূর্ণ হবে।

স্বামীজী খেতরিতে কয়েক সপ্তাহ বাস করেন। রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন তৎকালীন রাজপুতানার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পণ্ডিত নারায়ণ দাস। স্বামীজী তাঁর কাছে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' পাঠ করেন। কয়েকদিন বাদে পণ্ডিতজী বলেন, "স্বামীজী, আর আপনাকে শেখাবার মতো আমার কিছু নেই। আমি যা জানি, সব কিছুই আপনি অধিগত করেছেন।"

স্বামীজী রাজাকে বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, সাংখ্য দর্শনে তার সমর্থন মেলে। তিনি রাজাকে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। তিনি মহারাজার জন্যে কিছু বিজ্ঞানের প্রাথমিক বই ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আনান এবং নিজে এ বিষয়ে মহারাজাকে শিক্ষা দেন।

স্বামীজীর প্রতি মহারাজার ভক্তির অন্ত ছিল না। স্বামীজী যখন নিদ্রিত থাকতেন, মহারাজা নিজে তাঁর পদসেবা করতেন। স্বামীজী রাজপ্রাসাদে থাকলেও সেখানেই তাঁর সমস্ত সময় কাটতো না। তিনি রাজ্যের বহু দরিদ্র শিষ্যের গৃহেও যেতেন এবং তাঁদের

সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতেন। পণ্ডিত: শংকরলাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি প্রায়ই আহার করতেন। রাজ্যের শত শত নরনারী তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন খেতরিতে থাকার পর স্বামীজী পুনরায় নিঃসঙ্গ পর্যটনে বার হন।

তিনি গুজরাটের আমেদাবাদে এসে পৌছেন। এখানে তিনি আমেদাবাদের জনৈক সাব-জজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমেদাবাদের মন্দির ও মসজিদগুলি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এখানে বহু জৈন মন্দির ও জৈন সাধু থাকায় স্বামীজী জৈনধর্ম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

আমেদাবাদে কয়েকদিন থাকার পর তিনি লিম্বডি দেশীয় রাজ্যে পৌছেন। এখানে তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও পথে-ঘাটে রাত্রিযাপন করেন। শেষে সন্ন্যাসীদের একটি আস্তানার সন্ধান পান এবং সেখানে একটি কক্ষে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আশ্রয় লন! এইসব সন্ন্যাসী ছিলেন বামাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা স্বামীজীর ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ ক'রে তান্ত্রিক সাধনায় উচ্চতর ফল লাভের জন্যে সচেষ্ট হ'লে স্বামীজী লিম্বডির রাজার সহায়তায় ঐ আস্তানা থেকে উদ্ধার পান। লিম্বডির রাজা স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। এখানে পুরীর গোবর্ধন মঠের তৎকালীন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ ঘটে। লিম্বডি থেকে স্বামীজী যান জুনাগড়ে। তিনি জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের অতিথি হন। স্বামীজী এখানে গিরনার পর্বতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলি এবং বহু মসজিদ ও সমাধিমন্দির দর্শন করেন। গিরনারের একটি নির্জন গুহায় তিনি কয়েকদিন সাধনাও করেন। জুনাগড় থেকে তিনি যান ভোজরাজ্যে। সেখানে তিনি রাজ্যের দেওয়ানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি দেওয়ানজীর সঙ্গে প্রায়ই ধর্মালোচনা করতেন। সেই সঙ্গে করতেন রাজ্যের শ্রমশিল্প, কৃষি, অর্থনীতি ও শিক্ষা সম্পর্কে নানা সমস্যার আলোচনা। এখানে দেওয়ানজী

কচ্ছের মহারাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। ভোজরাজ্য থেকে স্বামীজী জুনাগড়ে ফিরে আসেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রামের পর তিনি ভেরোয়াল ও পাটন সোমনাথ বা প্রভাসতীর্থে যান। তিনি সোমনাথের মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ, অহল্যাবাঈ-নির্মিত সোমনাথের নূতন মন্দির প্রভৃতি দেখেন। এখানে কচ্ছের মহারাজার সঙ্গে তাঁর পুনরায় দেখা হয়। প্রভাস থেকে স্বামীজী আবার জুনাগড়ে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে ফিরে তিনি পোরবন্দর রাজ্যে যান। সেখানে পোরবন্দরের দেওয়ান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। দেওয়ান পণ্ডিত শংকর পাণ্ডুরঙ্গ নিজে ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ঐ সময় বেদের অনুবাদ করছিলেন। এ বিষয়ে তিনি স্বামীজীর সহায়তা লাভ করেন। স্বামীজীও এই কাজে খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং পণ্ডিতজীর অনুরোধে এখানে এগারো মাস থাকেন। পাণ্ডুরঙ্গ স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখে একদিন বলেন, "স্বামীজী, আমার ধারণা, আপনি এদেশে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। এখানকার লোকে আপনার মূল্য বুঝবে না। আপনার উচিত পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া ; সেখানে লোকে আপনার মূল্য বুঝবে। আপনি ভারতের সনাতন ধর্ম প্রচার ক'রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।" পাণ্ডুরঙ্গের এই মন্তব্যে স্বামীজী আনন্দিত হন। তিনি নিজেও এই ধরনের চিন্তা করছিলেন।

পোরবন্দরে আকস্মিকভাবে স্বামী ত্রিগুণাতীতের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়। স্বামীজীর চেষ্টায় পোরবন্দরের রাজা ত্রিগুণাতীত ও তাঁর সঙ্গীদের হিংলাজ তীর্থযাত্রায় সাহায্য করেন। ত্রিগুণাতীতের সঙ্গে এই সাক্ষাতের ফলে তাঁর গুরুভাইরা পাছে তাঁর খবর পেয়ে তাঁর অনুসরণ করেন, এই ভয়ে তিনি শীঘ্রই পোরবন্দর ত্যাগ করেন এবং দ্বারকা, মাণ্ডবী, পলিটানা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন ক'রে বরোদা রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেন। বরোদা থেকে তিনি মধ্য ভারতের খাণ্ডোয়ায়

পৌঁছেন। এখানকার বাঙ্গালী সমাজে স্বামীজীর সমাদরের সীমা থাকে না।

এখানেই স্বামীজী সর্বপ্রথম চিকাগোয় আসন্ন ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদানের কথা গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করতে থাকেন। খাণ্ডোয়া থেকে স্বামীজী যান বোম্বাই। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের গৃহে কয়েক সপ্তাহ থাকবার পর তিনি পুনা যান। পুনায় তিনি কয়েকদিন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের অতিথি হন। পুনা থেকে স্বামীজী যান কোলাপুর। শিবাজীর বংশধর কোলাপুরের মহারাজার গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কোলাপুরের রানী তাঁকে একটি নূতন গেরুয়া বসন উপহার দেওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্যা মনে করেন।

কোলাপুর থেকে স্বামীজী যান বেলগাঁও। এখানে বন-বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী হরিপদ মিত্র সস্ত্রীক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদিন এক আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সের Pickwick Papers থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি দিলে হরিপদবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজী ঐ অংশ কতোবার পড়েছেন। স্বামীজী বলেন, "মাত্র দুবার।" মাত্র দুবার পড়ে এই দীর্ঘ অংশ কিভাবে কণ্ঠস্থ হওয়া সম্ভব প্রশ্ন করলে স্বামীজী বলেন, "দৈহিক শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণের ফলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। দৈহিক শক্তিকে সংরক্ষিত ও রূপান্তরিত ক'রে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। দৈহিক শক্তির অপচয় ঘটালে মনের ধৃতি শক্তি নষ্ট হয়।" স্বামীজী একদিন হরিপদবাবুকে তাঁর আমেরিকা যাত্রার ইচ্ছার কথা জানান। হরিপদবাবু সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বেলগাঁও শহরে তিনি চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিতে চান। কিন্তু স্বামীজী তাতে অসম্মত হন।

স্বামীজী বেলগাঁও থেকে মহীশূরে যান। এখানে মহীশূরের দেওয়ান স্যার কে. সহ্যাদ্রি আয়ার তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপে এতোই

মুগ্ধ হন যে, তিনি স্বামীজীকে মহীশূরের রাজা চামরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রাজা এই তরুণ সন্ন্যাসীর ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং স্বামীজী তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বামীজী সরল ও নির্ভীকভাবে অনেক সময় মহারাজার সমালোচনা করতেন। তাতে মহারাজা আনন্দই অনুভব করতেন। একবার তিনি নিভৃতে স্বামীজীকে বলেন, তিনি যেভাবে স্পষ্টোক্তি করেন, তাতে আপনার বিপদ ঘটতে পারে। স্বামীজী বলেন, "সন্ন্যাসীর আবার বিপদের ভয় কি? বিপদের ভয়ে কি সন্ন্যাসী সত্যভাষণ থেকে বিরত থাকবে?" ঐ সময় মহীশূরের রাজসভায় একজন অস্ট্রিয়ান সংগীতজ্ঞ ছিলেন। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে সকলে বিস্মিত হন। মহারাজার বাড়িতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কাজ চলছিল। এ ব্যাপারেও স্বামীজীর জ্ঞান সকলকে বিস্মিত করে। মহারাজার প্রাসাদে পণ্ডিতদের একটি সভা হয়। তাতে স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যবস্তু ছিল বেদান্ত। পণ্ডিতরা সকলেই স্বামীজীর বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা শুনে এক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করেন।

মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী স্বামীজীকে কিছু উপহার দিতে চান। স্বামীজী তাঁকে খুশী করবার জন্যে রাজী হন। প্রধান মন্ত্রী তাঁর এক সেক্রেটারিকে চেকবই নিয়ে স্বামীজীর ইচ্ছামতো যে কোনও জিনিস কিনে দেওয়ার জন্যে স্বামীজীর সঙ্গে বাজারে পাঠালেন। স্বামীজী বাজারে অনেক দামী দামী জিনিস দেখলেন, সেগুলির খুব প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, "ভাই, দেওয়ানজীর ইচ্ছা, আমার ইচ্ছামতো আমি কিছু নিই। আমার ইচ্ছা, একটা দামী চুরুট খাব। তাই আমাকে দাও।" সেক্রেটারি অবাক হয়ে স্বামীজীকে এক শিলিং দিয়ে একটি চুরুট কিনে দিলেন। স্বামীজী সেটি ধরিয়ে সানন্দে প্রাসাদে ফিরলেন।

একদিন মহারাজা বললেন, "স্বামীজী, আমি আপনার জন্যে কি

করতে পারি বলুন।" স্বামীজী সোজা কোন উত্তর না দিয়ে ভারতের দুরবস্থা সম্পর্কে ওজস্বিনী ভাষায় আলোচনা করলেন। বললেন, ভারতের চাই আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় উন্নয়ন। ভারত যে শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী, তা হ'লো তার ধর্ম, তার দর্শন, তার অধ্যাত্ম-সম্পদ্। এই ধন ভারত পাশ্চাত্যকে দিতে পারে। তাই তিনি পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচারের জন্মে যেতে চান। মহারাজা তৎক্ষণাৎ স্বামীজীকে তাঁর এই প্রচার-ভ্রমণের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে চাইলেন। স্বামীজী তখন তা নিতে অসম্মত হলেন।

অবশেষে স্বামীজী একদিন মহীশূর থেকে বিদায় নিলেন। মহারাজা তাঁর জন্য বিবিধ মূল্যবান সামগ্রী আনালেন। স্বামীজী মহারাজাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সেগুলির মধ্য থেকে ধাতুবর্জিত একটি হুঁকো বেছে নিলেন। দেওয়ানজী এক তাড়া নোট স্বামীজীর পকেটে ঢুকিয়ে দিতে বহু চেষ্টা করলেন। স্বামীজী তা নিলেন না। দেওয়ানজী ব্যথিত হয়েছেন দেখে স্বামীজী তাঁকে ত্রিচূড় পর্যন্ত একখানি রেলের টিকিট কিনে দিতে বললেন।

স্বামীজী কোচিনের রাজধানী ত্রিচূড়ে কয়েকদিন থাকলেন। তারপর মালাবারের সুরম্য দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে। এখানে তিনি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহশিক্ষক অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। অধ্যাপক আয়ার স্বামীজীকে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, দেওয়ান ও রাজকুমার মার্তণ্ড বর্মার সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেন।

ত্রিবাঙ্কুর থেকে স্বামীজী রামেশ্বরম্ যাত্রা করেন। পথে তিনি মাদুরায় রামনাডের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সুপণ্ডিত রাজা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজা স্বামীজীকে চিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্মে যেতে বিশেষভাবে

উৎসাহিত করেন এবং আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। স্বামীজী এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা পরে জানাবেন ব'লে রামেশ্বরম্ যাত্রা করেন। রামেশ্বর থেকে তিনি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারীতে পৌঁছেন। এইভাবে স্বামীজী উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। কন্যাকুমারীতে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কুমারী মাতার মন্দিরে বসে স্বামীজী তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করেন। তিনি মনে মনে বলেন, "আমরা এতোগুলি সন্ন্যাসী চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—লোককে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা দিচ্ছি। এ উন্মত্ততা ছাড়া আর কি? আমাদের গুরুদেব বলতেন—খালি পেটে ধর্ম হয় না। আজ ভারতের অসংখ্য মানুষ পশুর মত জীবন যাপন করছে; অনাহারে, অশিক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। আমরা যুগ যুগ ধরে তাদের রক্ত শোষণ করছি, তাদের পদদলিত করছি। এর প্রতিবিধান কি?'

স্বামীজী স্থির করলেন, ত্যাগ ও সেবাই ভারতের দুই সর্বোত্তম আদর্শ। এই দুই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীদের ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী কন্যাকুমারী থেকে পদব্রজে রামনাড হয়ে পন্দিচেরি পৌঁছলেন। পন্দিচেরি থেকে গেলেন মাদ্রাজে। এখানে শিক্ষিত যুবকরা স্বামীজীর ভক্ত হয়ে উঠলেন। মাদ্রাজেই স্বামীজী তাঁর আমেরিকা যাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, এখানেই ঠাকুরের বাণী সহজে ব্যাপক প্রচার লাভ করে, এখানেই স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের আগেই তাঁর বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে স্বামীজী অসংখ্য দর্শনার্থীর সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মাদ্রাজ সরকারের ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন। শীঘ্রই মন্মথবাবুর গৃহ একটি ধর্মালোচনা কেন্দ্র হয়ে উঠলো। স্বামীজী অপরাহ্নে সমুদ্রতীরে

বেড়াতে যেতেন। এখানে তিনি জেলেদের কঙ্কালসার ছেলেমেয়েদের তাদের মায়েদের সঙ্গে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে কাজ করতে দেখে দুঃখে ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি চীৎকার করে ওঠেন, "ভগবান্, তুমি কেন এই হতভাগ্য জীবদের সৃষ্টি করেছ? আমি যে ওদের আর দেখতে পারি না!" স্বামীজীর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

স্বামীজীর প্রভাব মাদ্রাজে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগলো। বহু শিক্ষিত যুবক স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে শুনে মাদ্রাজ কৃশ্চিয়ান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও শহরের সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক সিঙ্গরাভেলু মুদালিয়র স্বামীজীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাধ নিয়ে একদিন উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্বামীজীর যুক্তিজাল ছিন্ন করতে অসমর্থ হয়ে তিনি স্বামীজীর কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। আলোয়ারে স্বামীজী যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, মাদ্রাজে তা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল। মাদ্রাজের বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে দলে দলে লোক আসছিল। স্বামীজী শিকাগোয় সমাসন্ন বিশ্ব ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা পূর্বেই ব্যক্ত করেছিলেন। মাদ্রাজের ভক্তরা এ জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাঁরা স্বামীজীকে ৫০০৲ দিলে স্বামীজী এক সমস্যায় পড়েন। বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর যোগদান মায়ের ইচ্ছা, না এ তাঁর নিজের অভিলাষ, এ কথা চিন্তা ক'রে তিনি শিষ্যদের বললেন, "আমি মার ইচ্ছানুসারেই কাজ করব। আমার যাওয়া যদি তাঁর অভিপ্রেত হয়, তবে তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন, তখন টাকা আপনা থেকেই আসবে। তোমরা এই অর্থ দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ব্যয় করো।"

হায়দরাবাদের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের মাদ্রাজস্থিত বন্ধুদের কাছ থেকে স্বামীজীর কথা শুনেছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে হায়দরাবাদে পদার্পণ করবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। স্বামীজী

সহজেই সম্মত হলেন, তাঁর মনে হ'লো এই আমন্ত্রণে মায়ের কি ইচ্ছা নিহিত আছে। মন্মথবাবু হায়দরাবাদে তাঁর বন্ধু নিজামের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়কে তারযোগে জানালেন যে, ১০ই ফেব্রুয়ারি (১৮৯৩) স্বামীজী হায়দরাবাদে উপস্থিত হবেন। স্বামীজী নির্ধারিত দিনে হায়দরাবাদ স্টেশনে নেমে দেখলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে শত শত লোক উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজা শ্রীনিবাস রাও বাহাদুর, মহারাজা রম্ভারাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতনলাল, ক্যাপ্টেন রঘুনাথ, শামসুল উলেমা সৈয়দ আলি বিলগ্রামী, নবাব ইমাদ জঙ্গ বাহাদুর, নবাব ডুলা খান বাহাদুর, নবাব ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, মিঃ এইচ. দোরাবজী, মিঃ এফ. এফ. মুণ্ডন, রায় হুকুমচাঁদ এম.এ.এল-এল.ডি., শেঠ চতুর্ভুজ, শেঠ মতিলাল, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আছেন। কালীচরণ বাবুর সঙ্গে পূর্বে কলকাতায় স্বামীজীর পরিচয় হয়েছিল। তিনিই সকলের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামীজীকে মাল্যভূষিত ক'রে জয়ধ্বনি সহকারে মধুসূদনবাবু বাংলোয় নিয়ে গেলেন।

১২ই তারিখে নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব স্যার খুরসিদ জাহ্ স্বামীজীকে আমন্ত্রণ ক'রে নিজামের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। স্যার খুরসিদ হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম মুসলমান যিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের সকল হিন্দুতীর্থ পর্যটন করেছিলেন। স্যার খুরসিদ স্বভাবতঃই নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দুদের সাকার উপাসনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করেন এবং ঈশ্বর-উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। স্যার খুরসিদ খুবই সন্তুষ্ট হন। তিনি স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার ইচ্ছার কথা শুনে এক হাজার টাকা দিতে চান। কিন্তু স্বামীজী তা নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যখন তিনি ঐ কাজে সত্যই

নামবেন, তখন তিনি এই সাহায্য প্রয়োজন হ'লে নেবেন। পরদিন সকালে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্যার আসমান জাহ্, রাজ্যের পেশকার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, মহারাজা শিউরাজ বাহাদুর প্রভৃতি ব্যক্তিরা স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা সকলেই স্বামীজীকে তাঁর আমেরিকা যাত্রায় সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে স্বামীজী মেহবুব কলেজে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—My Mission to the West. এই সভায় বহু ইউরোপীয়ও উপস্থিত ছিলেন। জনসভায় বক্তৃতাদান তাঁর যে জন্মগত অধিকার, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। তাঁর বক্তব্য, তাঁর ভাষা, তাঁর যুক্তি, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর দেবদুর্লভ দেহকান্তি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেলে। পাশ্চাত্য জগতে তাঁর সুনিশ্চিত সাফল্য সম্পর্কে তাঁর অনুরাগীরা আরও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। পরদিন বেগমবাজারের কয়েকজন বড় ব্যাঙ্কার তাঁকে আমেরিকা যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রাহা খরচ দিতে চান।

১৭ই তারিখে তিনি হায়দরাবাদ ত্যাগ করেন। তাঁকে স্টেশনে অসংখ্য ভক্ত বিদায় দিতে আসেন। তিনি হায়দরাবাদ থেকে আবার মাদ্রাজে আসেন। এখানে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। মহামন্ত্রি আনন্দচালু, বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি অনেকেই স্বামীজীকে চিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানে পাঠাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হন। স্বামীজীর তরুণ শিষ্যরা তাঁর অন্যতম শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে রামনাদ, মহীশূর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানেও যান। কিন্তু স্বামীজী মহাসমস্যায় পড়েন। এ বিষয়ে মা জগদম্বা বা গুরু রামকৃষ্ণের অভিপ্রায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত না পাওয়ায় তিনি ইতস্ততঃ করতে থাকেন। এতোগুলি মানুষের মিলিত অভিপ্রায় ও প্রয়াসকে তিনি মা জগদম্বার ইচ্ছা ব'লে ধরে নিলেও আরও কিছু সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

হঠাৎ সেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসে। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যদেহ ধারণ ক'রে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর দিয়ে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছেন আর তিনি স্বামীজীকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করছেন। এবার স্বামীজী সকল দ্বিধা-সংকোচ ত্যাগ ক'রে আমেরিকা যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। তিনি ভারত-পরিক্রমার পূর্বে শ্রীমা সারদা দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালেও তিনি শ্রীমার আশীর্বাণী কামনা ক'রে তাঁকে একখানি পত্র লিখলেন। শীঘ্রই আশীর্বাণী এসে পৌঁছলো। ৩১শে মে যাত্রার দিন স্থির হ'লো।

যাত্রার সমস্তই প্রায় প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ খেতরির রাজার একান্ত সচিব জগমোহন লাল এসে উপস্থিত হলেন। দু বছর আগে স্বামীজী যখন খেতরিতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর রাজশিষ্যের পুত্র-কামনা পূর্ণ হবে ব'লে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে আশীর্বাদ পূর্ণ হয়েছে। তাই খেতরি আজ আনন্দ-উৎসবে মত্ত। কিন্তু স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে সে উৎসব অপূর্ণ থাকবে। তাই রাজার অনুরোধ, স্বামীজীকে খেতরিতে পদধূলি দিতে হবে। স্বামীজী বললেন, "আমার আমেরিকা যাত্রার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমি কেমন ক'রে যাব?" জগমোহন বললেন, "মহারাজ আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আপনি না গেলে তাঁর দুঃখের সীমা থাকবে না।" স্বামীজী শেষ পর্যন্ত খেতরি যেতে সম্মত হলেন।

তিনি বাপিঙ্গানা, বোম্বাই ও জয়পুর হয়ে খেতরি গেলেন। কয়েকদিন ধ'রে উৎসব চলছিল সেখানে। রাজপুতানার রাজন্যবর্গের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী উপস্থিত হ'লে রাজা তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। স্বামীজী তাঁকে হাতে ধরে তুলে আশীর্বাদ করলেন। উপস্থিত সকলেই স্বামীজীকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করলেন। রাজা উপস্থিত রাজন্যবর্গের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানালেন যে, এঁর আশীর্বাদেই তিনি আজ পুত্রলাভ

করে সৌভাগ্যবান্ হয়েছেন। রাজা স্বামীজীর আসন্ন আমেরিকা-সফরের কথা ঘোষণা করলে উপস্থিত রাজন্যবর্গ উৎফুল্ল হয়ে তাঁর বিজয় কামনা করলেন। অতঃপর স্বামীজী নবজাত কুমারকে আশীর্বাদ করলেন।

কয়েকদিন বাদেই স্বামীজী জানালেন যে, এখন তাঁকে সমুদ্র-যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে বোম্বাই যেতে হবে। রাজা ও জগমোহন লাল স্বামীজীর সঙ্গে জয়পুর পর্যন্ত যাত্রা করলেন। জয়পুরে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে, যা স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করে। একদিন সন্ধ্যায় রাজাকে এক বাঈজী গান শোনাচ্ছিল। স্বামীজী পাশেব একটি শিবিরে ছিলেন। রাজা তাঁকে গান শুনবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে স্বামীজী জানালেন, তিনি সন্ন্যাসী, সুতরাং এ ধরনের অনুষ্ঠানে তাঁর আসা উচিত নয়। এতে বাঈজী খুবই বেদনাবোধ করলো এবং যেন স্বামীজীর মন্তব্যের উত্তরেই সুরদাসের একটি ভজন করুণকণ্ঠে গাইতে লাগলো ঃ

প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ
এক, রহে ব্যাধ শর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়
দুঁহু এক কাঞ্চন করো।

প্রভু, আমার দোষ দেখো না। তোমার নাম সমদর্শী। যে লোহা দেবতার মূর্তি হয়ে মন্দিরে থাকে, সেই লোহাই থাকে ব্যাধের তীরের ফলক হয়ে। কিন্তু ঐ উভয় লোহা যখন পরশমণির স্পর্শ পায়, তখন তারা সোনা হয়ে যায়।

গানের কথাগুলি আগুনের তীরের মতো স্বামীজীর মনে বিঁধলো। ঐ মেয়েটি ও মেয়েটির গান তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলো, সকলেই ব্রহ্ম। তিনি দ্রুত মজলিসে উপস্থিত হলেন।

জয়পুর থেকে স্বামীজী বোম্বাই রওনা হলেন। সঙ্গে চললেন জগমোহন লাল। রাজা জগমোহন লালকে স্বামীজীর যাত্রার যাবতীয় খরচ এবং তাঁর প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাজা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বামীজীকে বিদায় দিলেন। তাঁরই অনুরোধে স্বামীজী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাম গ্রহণ করলেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

আবু রোড স্টেশনে ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হ'ল। তারপর স্বামীজী ও জগমোহন লাল বোম্বাই পৌঁছলেন। এখানে মাদ্রাজ থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমল এসে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। খেতরির রাজার নির্দেশ অনুসারে জগমোহন লাল যাত্রা-কালে স্বামীজীর স্বাচ্ছন্দের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন। তিনি স্বামীজীকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ, প্রথম শ্রেণীর টিকিট এবং যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দেন। পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্ট্যাল কোম্পানির 'পেনিনসুলার' জাহাজে যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। জাহাজ ছাড়তে কয়েকদিন দেরি ছিল। এই কটা দিন স্বামীজীর ধ্যান, উপাসনা, ভক্তদের বিদায়-সম্বর্ধনা, ধর্মালোচনা প্রভৃতিতে কাটলো। ভক্তদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী গেরুয়া রঙের রেশমী পরিচ্ছদ ও পাগড়ি পরেন।

অবশেষে জাহাজ-ছাড়বার নির্দিষ্ট দিন এলো, ৩১শে মে, ১৮৯৩। ভক্তরা একে একে বিদায় নিলেন। জাহাজ ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে আলাসিঙ্গা পেরুমল ও জগমোহন লাল স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। বাষ্পচালিত অর্ণবপোত ভারতের তটভূমি ত্যাগ করলো।

৬

আমেরিকার পথে—বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন

দণ্ডকমণ্ডলু আর দু-একখানা গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা বই ছিল যাঁর ভ্রমণের সঙ্গী, তিনি জাহাজে তাঁর বাক্স-পেঁটরার লটবহর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সকল কিছুর মধ্যে নিজের মনকে আপন ক'রে নেওয়ার অসীম শক্তি ছিল স্বামীজীর। স্বামীজী শীঘ্রই ভগবানের নিসর্গ লীলা দেখে সব ভুলে গেলেন। তাঁর দেবদুর্লভ মূর্তি সকলেরই চিত্ত জয় করলো। জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে খুবই ভাব জমে গেলো। কাপ্তেন তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জাহাজের সবকিছু দেখালেন, খুঁটিনাটি কলকব্জাটি পর্যন্ত। স্বামীজীর কৌতূহলের অন্ত নেই। জাহাজের খাদ্য, পরিবেশ, লোকজন, সকলের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। ইউরোপীয় যাত্রীদের লক্ষ্য ক'রে দেখে তিনি ইউরোপীয় আদবকায়দাও রপ্ত ক'রে ফেললেন।

জাহাজ প্রথমে এসে ধরলো সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে। ওখানে জাহাজ প্রায় একদিন ছিল। এই সুযোগে স্বামীজী সারা কলম্বো শহর ঘুরে বৌদ্ধ মন্দির ও মূর্তিগুলি দেখলেন। তারপর জাহাজ বাঁধলো পেনাংয়ে, পেনাং থেকে সিঙ্গাপুর। স্বামীজী এখানকার বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্ দেখলেন। শিঙ্গাপুর থেকে হংকং। চীন চিরদিনই ছিল স্বামীজীর কাছে স্বপ্ন ও কল্পনার দেশ। তবে সেই চীনদেশকে তিনি এখানে দেখতে পেলেন না, দেখলেন চীনাদের ব্যবসায়িক তৎপরতা, খদ্দের ধরবার কৌশল ও পটুতা। এখানে তিনি দুই-হালযুক্ত নৌকো, এবং নৌকোর হালে চীনা বউদের কাজ দেখে কৌতূহলী হলেন। তিনি পরে এ কথাও বলেন, "চীনারা আর ভারতীয়রা যে সভ্যতার দিক থেকে মমির মতো একটা অবস্থায়

আছে, তার একটা কারণ তাদের চরম দারিদ্র্য। সাধারণ একজন হিন্দু ও চীনার কাছে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনটা এমন বীভৎস যে, আর কিছু ভাববার সময় সে পায় না।” হংকং-য়ে জাহাজ তিনদিন ছিল। তাই স্বামীজী চীনের ভেতরে সিকিয়াং নদীর মোহানা থেকে ৮০ মাইল দূরে ক্যান্টন শহরটি দেখতে গেলেন। ক্যান্টনে তিনি সুবৃহৎ বৌদ্ধমন্দিরটি সহ কতকগুলি বৌদ্ধমন্দির দেখলেন। চীনের প্রাচীন স্থাপত্য তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি নিজে সন্ন্যাসী, তাই এখানকার একটি মঠ দেখবার ইচ্ছা তাঁর প্রবল হ'লো। দোভাষীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, এখানে মঠ আছে, তবে দর্শকদের সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কারণ বাইবের লোকে মঠের এলাকায় ঢুকলে সন্ন্যাসীরা মারতে তাড়া করে। স্বামীজীর কৌতূহল বাড়লো। তিনি জাহাজের কয়েকজন যাত্রী ও দোভাষীকে শেষ পর্যন্ত মঠে যেতে রাজী করালেন। কিন্তু মঠের এলাকায় ঢুকতেই দোভাষী চীৎকার ক'রে উঠলো, “ওই ওরা আসছে। পালান! পালান!” স্বামীজী দেখলেন, কয়েকজন লোক লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে। স্বামীজীর সঙ্গীরা ভয়ে ছুটে পালালেন। কিন্তু স্বামীজী নড়লেন না। তিনি দোভাষীকে ধরে ফেলে আটকালেন এবং জানতে চাইলেন, ভারতীয় যোগীকে চীনা ভাষায় কি বলে। দোভাষী তা ব'লে দিলে স্বামীজী চেঁচিয়ে তা-ই বলতে লাগলেন। ভারতীয় যোগীর কথা শুনে লোকগুলি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারা কি যেন বলতে লাগলো। স্বামীজীর কানে এলো ‘কবচ’ শব্দটা। তিনি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, ওরা ভারতীয় যোগীর কাছে ভূতপ্রেত তাড়াবার জন্যে কবচ চাইছে। স্বামীজীর ভারী মজা লাগলো। তিনি পকেট থেকে একখানা কাগজ বের ক'রে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়লেন এবং সেগুলিতে সংস্কৃত হরফে ওঁ লিখে সেগুলিকে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। লোকগুলি কাগজগুলিকে মাথায় ঠেকিয়ে স্বামীজীকে সসম্ভ্রমে

মঠে নিয়ে গেল। এই মঠের একটি ভেঙে-পড়া অংশে স্বামীজী বহু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দেখতে পেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেগুলি প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা। তাঁর মনে পড়লো, তিনি একটি মন্দিরে যে পঞ্চশত বুদ্ধশিষ্যের মূর্তি দেখেছিলেন, সেগুলির মুখের আদলও বাঙ্গালীদের মতো। স্বামীজীর এ থেকে স্থির বিশ্বাস হ'লো, অসংখ্য বাঙ্গালী বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে এসেছিলেন এবং চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল।

জাপানের কোবেতে জাহাজ ধরলে স্বামীজী জাহাজ থেকে নামলেন। জাহাজ সমুদ্রপথে ইয়োকোহামা গেল। আর স্বামীজী গেলেন স্থলপথে জাপানের ওসাকা, কিয়োতো, টোকিয়ো প্রভৃতি হয়ে। কথা রইলো তিনি ইয়োকোহামাতে আবার জাহাজে উঠবেন। যে অল্প কয়েকদিন জাপানে তাঁর কাটলো, তাতে তিনি জাপানের রীতিনীতি, সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন। জাপানেও জাপানীরা তাঁকে মুগ্ধ করলো। কয়েকটি মন্দিরে তিনি লক্ষ্য করলেন প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা বাংলা মন্ত্র।

ইয়োকোহামা থেকে জাহাজ পৌঁছলো মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে। ভ্যাঙ্কুভার থেকে ট্রেনে তিনি কানাডা দেশের মধ্য দিয়ে চললেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে। যখন জাহাজ ছেড়েছিল, তখন ভারতে গ্রীষ্মকাল। তাই তিনি ভেবে দেখেননি যে উত্তর প্রশান্ত অঞ্চলে ঐ সময় প্রবল শীতের প্রকোপ হতে পারে। তাই স্বামীজীর সঙ্গে শীতবস্ত্র কিছুই ছিল না। ফলে পথে তাঁর ঠাণ্ডা লাগলো। স্বামীজী যখন চিকাগো শহরে পৌঁছলেন, তখন তাঁর মনের অবস্থাটা সহজেই কল্পনা করা যায়। লটবহর নিয়ে যাতায়াতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত তিনি অত্যন্ত পথশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ সকলেরই কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এমন কি ছেলেমেয়েরা তাঁর পেছনে লেগেছিল। বিদেশে তাঁর এই প্রথম ভ্রমণ হওয়ায় কুলীরা তাঁকে

পদে পদে ঠকাচ্ছিল। এই সময়ে চিকাগোতে যে বিশ্ব প্রদর্শনী চলছিল, তাতে পৃথিবীর বহু দেশের লোক এসেছিল। তাই কুলীরা মওকা পেয়েছিল। যাই হ'ক, অবশেষে তিনি হোটেলের সন্ধান পেলেন এবং কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

পরদিন তিনি বিশ্বমেলা দেখতে গেলেন। বিশ্বের আধুনিকতম উদ্ভাবন ও নিপুণতম উৎপাদনে ও দর্শকে মেলাটি পূর্ণ ছিল। তিনি শিল্পসামগ্রী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কীর্তিগুলি দেখে প্রচুর আনন্দ পেলেও নিতান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধে তাঁর পরিচিত একটি লোকও ছিল না। তিনি ক্রমাগত কয়েকদিন মেলায় গেলেন। মেলার প্রতিটি জিনিস তিনি খুঁটিনাটি ক'রে দেখলেন। দু-একজন লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ও হ'লো। সকলেই জানতে চাচ্ছিল, এই অভূতদৃষ্ট পরিচ্ছদে কে তিনি? তিনি কোথায় যাবেন? কি তাঁর উদ্দেশ্য? শীঘ্রই সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের নজরে পড়লেন তিনি। তারা তাঁর হোটেলের ম্যানেজারের কাছে খোঁজখবর নিতে লাগলো, তাঁকে বিশ্বমেলায় ঘেরাও করলো, তাঁকে সম্ভব অসম্ভব নানা প্রশ্নে জর্জরিত করতে লাগলো। স্বামীজী মাঝে মাঝে অবসাদ বোধ করলেও মার্কিন মুলুকের জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন।

কিন্তু কয়েকদিন বাদে একটি ঘটনায় তিনি মুসড়ে পড়লেন। কবে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন হবে, কি তার নিয়মকানুন তা জানবার জন্যে তিনি বিশ্বমেলার তথ্য বিভাগে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন, বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন হবে, তবে তা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে নয়। আর যারা উপযুক্ত পরিচয়পত্র নিয়ে আসেননি, তাঁদের সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। কেবল তাই নয়, প্রতিনিধি হওয়ার তারিখও অনেক আগেই চলে গেছে। প্রতিনিধি হ'তে পারবেন না? তবে কেন তিনি অনর্থক সুদূর ভারত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ছুটে

এলেন? এখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি। এই দীর্ঘদিন তিনি অকারণ এখানে ব'সে থেকেই বা কি করবেন? তিনি তাঁর মাদ্রাজের অনভিজ্ঞ ছোকরা ভক্তদের অত্যুৎসাহে এখানে কেন এলেন? তিনি নিজেও এ সম্পর্কে কিছু ভাবলেন না কেন? কেবল তাই নয়, টাকাপয়সাও ফুরিয়ে আসছে। এখানে হোটেল খরচ খুব বেশি। আমেরিকায় টাকা জলের মতো খরচ হয়। তাছাড়া, টাকাপয়সার ব্যবহার সম্পর্কে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হওয়ায় তাঁকে লোকে পদে পদে ঠকাচ্ছে। তিনি প্রথমে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়লেও পরে ভাবলেন, তিনি মাদ্রাজে তাঁর শিষ্যদের কাছে আরও টাকা চেয়ে তার পাঠাবেন। তাঁর ফেরবার জন্যে বা এখানে থাকবার জন্যে আরও টাকার দরকার। সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যেও তিনি শেষ চেষ্টা দেখবেন। এখানে সুযোগ না পেলে যাবেন ইংলণ্ডে, ইউরোপে। কিন্তু মাদ্রাজে তিনি আপাততঃ তার পাঠালেন না। তিনি শুনলেন, চিকাগোর চেয়ে বোস্টনে খরচ কম। স্বামীজী চিকাগো ছেড়ে বোস্টনে চললেন।

ভগবানের ইচ্ছা কি, কে বলতে পারে! বোস্টন যাত্রাকালে স্বামীজীর সঙ্গে একই গাড়িতে যাচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়া মার্কিন মহিলা। নাম মিস ক্যাথরিন স্যান্‌বোর্ন্‌। বোস্টনের কাছেই এক গ্রামে তাঁর বাড়ি। তিনি স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে নিজে থেকে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করলেন। স্বামীজী তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য ও বর্তমান সমস্যার কথা জানালেন। মিস স্যান্‌বোর্ন্‌ বললেন, "আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন চলুন। ঈশ্বরেচ্ছায় কিছু একটা সুরাহা হয়ে যাবে।" স্বামীজী সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। মিস্‌ স্যান্‌বোর্ন চিকাগো থেকে যাত্রার পরদিন মেটকাফ. অঞ্চলে একটি সুন্দর বাড়িতে স্বামীজীর থাকবার ব্যবস্থা করলেন। বাড়িটির নামও সুন্দর—Breezy Meadows, মলয় প্রাঙ্গণ। ভদ্রমহিলা ছিলেন ধনী। তাঁর আতিথ্য নিয়ে স্বামীজীর রোজ এক পাউণ্ড খরচ

বাঁচলো ; আর ভদ্রমহিলার লাভ হ'লো, তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ ক'রে ভারত থেকে আগত এক অদ্ভুত চিজ দেখানো। এই অবস্থা ও পরিবেশ স্বামীজীর ভালো না লাগলেও তিনি ভগবানের উপর নিশ্চিত ভরসা রেখে সবই সহ্য ক'রে চললেন। মিস্ স্যান্‌বোর্নের এক বান্ধবী একটি অপরাধিনীদের শোধনাগারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। স্বামীজীকে তিনি এই শোধনাগার বা রিফর্মেটরিটি দেখতে নিয়ে যান। স্বামীজী এখানকাব অপরাধীদের জন্যে সহানুভূতিপূর্ণ মানবিক ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হন। তিনি দেশের দরিদ্র মানুষদের ওদের সঙ্গে তুলনা ক'রে দুঃখে কাতর হন।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় এসেছিলেন, তখনও ছিল গ্রীষ্মকাল। কিন্তু এবার শীত আসছে। শীতের সঙ্গে আসছে তাঁর শীতবস্ত্রের সমস্যা। তাঁর সন্ন্যাসীর পোশাকটি এখানে সহজেই চোখে পড়ে, তাই মিস্ স্যান্‌বোর্ন্ তাঁকে আমেরিকান পোশাক ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সেজন্যে প্রায় এক শ ডলার প্রয়োজন। তা কবলে আর সামান্য অর্থই হাতে থাকবে। বোস্টনের বড় একটি মেয়েদের ক্লাব থেকে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। এই বক্তৃতা দেওয়ার আগেই স্বামীজী একটি আমেবিকান পোশাক কিনলেন। তিনি তাঁর গেরুয়া পোশাক বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে ব্যবহারের জন্যে রাখলেন। ঐ ক্লাবে স্বামীজীর বক্তৃতা খুবই প্রশংসা পায়। এখন অনেকেই তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হ'তে থাকেন।

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জে. এচ. রাইট-ও ছিলেন। অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনায় এতোই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি স্বামীজীকে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে বার বার বলতে লাগলেন। স্বামীজী তাঁকে অন্তরায়গুলির কথা বললেন। তাতে অধ্যাপক রাইট বললেন,

"স্বামীজী! সূর্যের কিরণ দেওয়ার কি অধিকার আছে, তা সূর্যকে জিজ্ঞাসা করাও যা, আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়াও তাই।"

স্বামীজী যাতে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে আসন পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব অধ্যাপক রাইট নিজেই নিলেন। বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের সংগঠকদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল। প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাঁকে তিনি লিখলেন: "এখানে এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের সকল পণ্ডিত অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য একসঙ্গে করলেও তাঁর চেয়ে পাণ্ডিত্য বেশি হবে না।" অধ্যাপক রাইট জানতেন স্বামীজীর কাছে বেশি টাকা নেই। তাই তিনি তাঁকে চিকাগো যাওয়ার জন্যে একখানি টিকিট এবং প্রাচ্য দেশীয় প্রতিনিধিদের থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্যে যে কমিটি আছে তার কাছে একটি চিঠি লিখে দিলেন। স্বামীজীকে চিকাগোর নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ভার নিলেন এক ব্যবসায়ী ভদ্র-লোক। সবটাতেই এমন যোগাযোগ ঘটলো, যা স্বামীজীর কাছে একেবারে অভাবিত ছিল।

কিন্তু এতো বড়ো কাজ কি এতো সহজে হ'লে চলে? তাই মা বুঝি অলক্ষ্যে একটু হাসলেন এবং তাঁর ভক্তকে নিয়ে একটু করুণ কৌতুক করলেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক স্বামীজীকে চিকাগোয় পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজের তাড়ায় তাড়াহুড়ো ক'রে চলে গেলেন, চেয়ারম্যান ডঃ বারোজের অফিসটা যে কোথায় তা জানাতে ভুলে গেলেন। স্বামীজী ডঃ বারোজের ঠিকানা-লেখা কাগজটা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, তা-ও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন? চিকাগো শহরের এই অঞ্চলটায় জার্মানদের বাস। তাই স্বামীজীর কথা তারা বুঝতে পারলো না। ফলে কোন হদিস মিললো না। স্বামীজী একটা হোটেলের সন্ধান চাইলেন, তাও তাদের কাছে দুরধিগম্য রয়ে গেল। স্বামীজী দিশেহারা হয়ে

পড়লেন। তিনি রাতটুকুর জন্যে একটি আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। আশ্রয় মিললো রেল-গুদামের উঠোনে একটি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে। ভবিষ্যৎটা ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে স্বামীজী ওই বাক্সের আশ্রয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি কিছুটা অগ্রসর হ'তেই একটা শৌখীন পল্লীতে এসে পড়লেন। তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাসীর মতোই দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার অন্নের জন্যে ভিক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সকলেই তাঁকে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ভরে বিদায় করলো। কোন কোন বাড়িতে তিনি অপমানিতও হলেন। তিনি সিটি ডাইরেক্টরি বা টেলিফোন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই শ্রান্ত দেহে ও ভগ্ন মনে ক্রমাগত এগিয়ে চললেন।

একি ঈশ্বরের পরীক্ষা! অবশেষে তিনি রাজপথের ধারে এক জায়গায় বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি যেখানে বসে ছিলেন, তার বিপরীত দিকের একটি ধনীগৃহের দরজা খুলে গেল। একজন অপূর্ব সুন্দরী মহিলা বার হয়ে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এলেন এবং সুমধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়, আপনি কি বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি?" স্বামীজী তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটি জানালেন। মহিলা স্বামীজীকে সাদরে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর পরিচর্যার জন্যে ভৃত্যদের আদেশ করলেন। তিনি স্বামীজীকে বললেন যে, স্বামীজীর প্রাতরাশ শেষ হ'লে তিনি নিজেই তাঁকে ধর্ম মহাসম্মেলনের অফিসে নিয়ে যাবেন। এই মহিলার নাম মিসেস্ জর্জ ডাব্লিউ. হেইল। ইনি, ওঁর স্বামী ও সন্তানরা সকলেই স্বামীজীর অকৃত্রিম অনুরাগী হয়েছিলেন। স্বামীজীও মিসেস হেইলকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি স্বামীজীর মনে এই স্থির ধারণার সৃষ্টি করলো যে, ভগবান্ তাঁকে এক বিরাট কর্মের জন্য সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ে চলেছেন।

মিসেস হেইলের সহায়তায় সহজেই স্বামীজী প্রতিনিধিরূপে গৃহীত

হলেন। এখন তিনি প্রতিনিধিদের জন্যে নির্দিষ্ট গৃহে বাস করতে লাগলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেব প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলন আধুনিক বিশ্বেব দরবারে সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মকে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই সম্মেলন পাশ্চাত্য জগৎকে প্রাচ্যের প্রাচীন চিন্তা ও ধর্মসমূহ সম্পর্কে সচেতন ক'বে তুলেছিল। এই সম্মেলনে সাত থেকে দশ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি আসন গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন জগৎবরেণ্য দার্শনিক ও সাধক। বিভিন্ন প্রতিনিধিব প্রায় সহস্রাধিক নিবন্ধ এই সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে একটি বিজ্ঞান বিভাগও ছিল। এই বিজ্ঞান বিভাগে স্বামীজী একাধিক ভাষণ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি মিঃ মেরুইন-মারী স্নেল স্বামীজীব অনুরাগী বন্ধু ও হিন্দু ধর্মের ঐকান্তিক সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন।

চিকাগোব মিচিগান অ্যাভেন্যুতে আর্ট ইনস্টিট্যুটের নবনির্মিত হল অব কলম্বাসে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা দশটা বিশ্ব-ধর্ম মহাসম্মেলন শুরু হয়। খ্রীষ্টান জগতের বহু বিখ্যাত আর্চবিশপ, বিশপ প্রভৃতি ধর্মযাজকরা উপস্থিত ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ধর্ম-নেতা কার্ডিন্যাল গিবন এই সভার উদ্বোধন করেন।

তাঁর দক্ষিণে ও বামে প্রাচ্যের বহু ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে কলকাতার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইয়ের নাগরকর, জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে গুজরাটের বীরচাঁদ গান্ধী, থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে অ্যানী বেসান্ট ও চক্রবর্তী।

বিবেকানন্দ কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আসেননি—তিনি এসেছিলেন সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিরূপে। তাঁর পরিধানে ছিল এক জমকালো মহার্ঘ লাল রঙের পোশাক ও হলদে পাগড়ি। লাল রঙের পোশাকটি কমলারঙের রজ্জু দিয়ে কোমরে এঁটে বাঁধা ছিল। স্বামীজীর দিব্যকান্তি, ভাবময় মূর্তি ও সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ প্রথম থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রতিনিধিরা মিছিল ক'রে এসে সভামঞ্চে যে যার স্থান গ্রহণ করেছিলেন। সভাগৃহের নিচে বিরাট হলে ও উপরে বিরাট গ্যালারিতে আমেরিকার সুশিক্ষিত ও বিশিষ্ট ছ-সাত হাজার নরনারী সমবেত হয়েছিলেন।

সঙ্গীত, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ভাষণ দিয়ে সভাব উদ্বোধন হ'লো। তারপর সভাপতি একে একে প্রতিনিধিদের পরিচয় দিলেন, প্রতিনিধিরাও একে একে অগ্রসর হয়ে তাঁদের ভাষণ দিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও অসংখ্য সুশিক্ষিত বিশিষ্ট নরনারীর এই সভায় ভাষণ দিতে সকলেরই সঙ্কোচ ও শঙ্কা হওয়ার কথা। স্বামীজীও ঐরূপ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, My heart was fluttering and tongue nearly dried up.—আমার বুক দুরুদুরু করতে লাগলো, জিভ প্রায় শুকিয়ে গেল। তিনি সকালের অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে পারলেন না। তিনি অধিকাংশ সময়ই নীরব প্রার্থনায় মগ্ন রইলেন এবং মাঝে মাঝে বক্তাদের কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে উঠলেন। সভাপতি বার বার তাঁকে ভাষণ দেওয়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু বার বার তিনি বললেন, "এখন না, পরে।" স্বামীজী ভাষণ দেবেন কিনা সভাপতির এমন সংশয়-ও হ'লো। শেষ পর্যন্ত অপরাহ্নে সভাপতির অনুরোধে স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর মুখমণ্ডল অগ্নিপ্রভায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। তিনি একবার সভাগৃহটি দেখে নিলেন। মুহূর্তে সভা নিস্তব্ধ হ'লো। স্বামীজী দেবী সরস্বতীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে শুরু করলেন—Sisters and Brothers of America. এই কটি কথা উচ্চারণ

করবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সভাগৃহে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। শত শত দর্শক হর্ষধ্বনি ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। করতালিতে সমগ্র সভাগৃহ কম্পিত হ'তে লাগলো। স্বামীজী নিজেও বিচলিত হলেন। পুরো দু মিনিট এমনি অবস্থা চললো। পুনরায় নিস্তব্ধতা ফিরে এলে স্বামীজী পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম সম্প্রদায়ের—বৈদিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের—প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর নবীনতম জাতিকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। তাঁর জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বরে সভাগৃহ স্পন্দিত হতে লাগলো। তিনি হিন্দুধর্মকে সকল ধর্মের জননী, the Mother of Religions, ব'লে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, হিন্দুধর্ম পৃথিবীকে সহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতা শিক্ষা দিয়েছে। বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন উৎস থেকে উত্থিত হয়ে একই সমুদ্রের পানে ধাবিত হয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম তার নিজ নিজ পথে একই ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়ে তাঁতেই মিলিত হয়েছে। মানুষ সোজা, আঁকাবাঁকা, ঘুর যে পথেই আসুক না কেন, সেই পথের শেষে আছেন ভগবান্। স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরের সেই জীবন্ত বিগ্রহের পদতলে ব'সে যে বাণী লাভ করেছিলেন, তাই তিনি বিশ্ব মহাসভায় ঘোষণা করলেন। মাত্র পনেরো মিনিট তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ভাষণই সেদিনকার সর্বোত্তম ভাষণরূপে স্বীকৃত পেলো। স্বামীজী সম্মেলনের প্রধানতম আকর্ষণ হয়ে উঠলেন।

পরবর্তী কয়েকদিনে তিনি প্রায় আরো দশ-বারো বার ভাষণ দিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি বললেন, "আমাদের মতবিরোধ হয় কেন" (Why we disagree) সম্পর্কে। ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল—"ধর্মসাধনই ভারতের আশু প্রয়োজন নয়। তার আশু প্রয়োজন ভাত কাপড়।" ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি বললেন, "গোঁড়া হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত এবং বর্তমান ভারতের বিভিন্ন ধর্ম" সম্পর্কে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল "হিন্দুধর্মের সার কথা"। ২৬শে সেপ্টেম্বর—"বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের

পরিণত রূপ"। এ ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতা দুটি দেন তিনি ১৯শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর। ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁর বক্তৃতাব বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুধর্ম'। ২৭শে সেপ্টেম্বরে তিনি সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দেন।

বর্বরদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বস্তুপূজা থেকে শুরু ক'রে আধুনিকতম বিজ্ঞানের মতবাদগুলি পর্যন্ত মানব-মনের সকল প্রকার বিশ্বাসের সমন্বয়ে গঠিত স্থান ও কালের একটি সর্বকালীন ও সর্বজনীন বিশ্বধর্মের কথা তিনি বার বার বলতে থাকেন। তিনি বললেন, "এই ধরনের একটি ধর্ম দেন, সকল জাতি আপনার অনুসরণ করবে।" তিনি বললেন, "যিনি হিন্দুব ব্রহ্ম, যিনি জরথুস্ত্রপন্থীদের অহুর-মাজদা, যিনি বৌদ্ধদেব বুদ্ধ, যিনি ইহুদীদের জিহোবা, যিনি খ্রীষ্টানদের দিব্য পিতা, তিনি আপনাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ মহৎ ধারণা কার্যকর করতে শক্তি দেন।" সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে তিনি বললেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হ'তে হবে না, হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রীষ্টান হ'তে হবে না। প্রত্যেকে অপরের আধ্যাত্মিক আলোক অধিগত করবেন, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাবেন না, বিকাশের নিজ মূলনীতি অনুসারে সকলেই বিকাশ লাভ করবেন। ...যদি বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন পৃথিবীকে কিছু দেখিয়ে থাকে, তবে তা হ'লো এই; তা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করছে যে, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, বদান্যতা পৃথিবীর কোন বিশেষ ধর্মের একার সম্পত্তি নয়, এবং প্রত্যেক ধর্মসাধন পদ্ধতিই অতিশয় উন্নত চরিত্রের নরনারীর জন্ম দিয়েছে। এই প্রমাণ সত্ত্বেও কেউ যদি স্বপ্নেও ভাবেন যে, কেবল মাত্র তাঁর নিজের ধর্মটিই টিকে থাকবে, আর সকল ধর্ম ধ্বংস হবে, তবে আমি তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করুণা করি এবং তাঁকে দেখিয়ে দিতে চাই যে তাঁর প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের ধ্বজায় শীঘ্রই লেখা থাকবে—সংগ্রাম নয় সহযোগিতা, ধ্বংস নয় গ্রহণ, মতানৈক্য নয়—মতৈক্য ও শান্তি।")

বিবেকানন্দের এই বাণীই মহাসম্মেলনের বাণী হয়ে উঠলো। মহাসম্মেলনের প্রাণপুরুষ হয়ে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যান্য প্রতিনিধিরা সকলেই লিখিত বক্তৃতা পড়তেন। কিন্তু বিবেকানন্দ মুখে মুখেই ভাষণগুলি দিতেন। সেগুলিতে যেন যুক্তি, প্রেম ও জ্বালার বন্যা নামাতেন। হাজার হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতেন। সকাল দশটায় সভার অধিবেশন শুরু হ'তো, মাঝে সামান্য বিশ্রামের পর রাত দশটা পর্যন্ত চলতো সভা। শ্রোতাদের সভায় আটকে রাখবার জন্যে সভার পরিচালকমণ্ডলী বিবেকানন্দের ভাষণটি শেষের দিকে দিতেন। অনেক সময় শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে দলে দলে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করলে সভাপতি ঘোষণা করতেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ আছে পরে। অমনি সকলে উপবিষ্ট হতেন, সকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার জন্যে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন।

বিবেকানন্দ রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন। কাগজে কাগজে তাঁর বর্ণনা ও প্রশংসা বেরুলো, তাঁর ভাষণগুলি অনেক কাগজে পুরো ছাপা হ'লো। শিকাগোর পথে পথে তাঁর পূর্ণায়তন চিত্র শোভা পেতে লাগলো, হাজার হাজার পথিক সেই চিত্রগুলিকে নতশিরে নমস্কাব জানালো। ত্রিশ বৎসর বয়সে আলেকজাণ্ডার কৃপাণের সাহায্যে দিগ্‌বিজয় করেছিলেন, ত্রিশ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দ কৃপার বাণীর সাহায্যে বিশ্ববিজয় করলেন। তিনি যে খ্যাতি ও গৌরবের অধিকারী হলেন, তা অন্য যে কোনও মানুষকে সন্তুষ্ট করতে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি কেঁদে ফেললেন, তিনি দেখলেন, তাঁর নিঃসঙ্গ, স্বাধীন সন্ন্যাস-জীবন শেষ হ'লো। এখন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত জনসাধারণের, প্রতিটি মুহূর্ত অপরের। কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি তাঁর মনে পড়লো, নিজের জন্যে নয়, অপরের জন্যেই তাঁর আসা। তিনি যে বটবৃক্ষের মতো হবেন।

এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার মধ্যেও ভারতের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হ'তে থাকে। তাঁর নিজের কোন অভাব ছিল না। চিকাগোর সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিদের প্রাসাদোপম ভবনের দ্বার ছিল তাঁর জন্যে অবারিত। এখানে তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে বিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকার ওই অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে তাঁর দরিদ্রা ভারতমাতার জন্যে প্রাণ কাঁদতো। তাঁর উপাধান অশ্রুতে সিক্ত হয়ে উঠতো। তিনি গভীর রাত্রে ভূলুণ্ঠিত হয়ে আর্তকণ্ঠে বলতেন, "মাগো, কি হবে আমার এই নামে? আমার দেশজননী যে দুঃখদৈন্যে কাঁদছে। কোটি কোটি ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্যে মরছে। আর এরা এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে ব্যক্তিগত সুখের জন্যে। মাগো, কি করব আমি, আমায় পথ দেখিয়ে দে।" এখন থেকে একদিকে ভারতের ধর্ম প্রচার এবং অন্য দিকে ভারতের কোটি কোটি মানুষের দুঃখদৈন্য দূর করবার চেষ্টাই হয়ে উঠলো তাঁর জীবনের সাধনা। এজন্যে তিনি তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি শেষ কণা পর্যন্ত নিঃশেষ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি চাইলেন ভারত সম্পর্কে এই ধনী দুনিয়ায় ভ্রান্ত ধারণা দূর ক'রে মানসিক ঐশ্বর্য ও আর্থিক দারিদ্র্যের সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলবেন। এই সময় একটি বিখ্যাত বক্তৃতা প্রতিষ্ঠান তাঁকে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। তিনি এতে সহজেই সম্মত হলেন। কারণ হিন্দু-ধর্মের সুষ্ঠতা সম্পর্কে প্রচার এবং দরিদ্র ভারতবাসীর সেবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ, দু-ই এতে হবে ব'লে তিনি মনে করলেন। স্বামীজী আমেরিকার বিখ্যাত নগরগুলিতে ভারতের ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। তিনি চিকাগো, আইওয়া, দে মোয়াঁ, মেম্ফিস, ইণ্ডিয়াপলিস, মিনিয়াপলিস, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাফেলো, বোস্টন, কেম্‌ব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে ঝটিকাবর্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন।

কিন্তু এই বক্তৃতা-সফরগুলি সব সময়ে তাঁর পক্ষে খুব আনন্দদায়ক ছিল না। বক্তৃতার পর বক্তৃতার চাহিদা তাঁর শরীরের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টান গির্জাগুলির পক্ষ থেকেও ভাষণ দানের জন্মে প্রায়ই ডাক আসতো। একজন খ্রীষ্টান তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি খ্রীষ্টধর্ম এতো স্মুন্দরভাবে বুঝলেন কি ক'রে? উত্তরে তাঁকে স্বামীজী বলেছিলেন, "খ্রীষ্ট প্রাচ্যেরই মানুষ ছিলেন ব'লে।" বিবেকানন্দ খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টের বাণীগুলি সম্পর্কে অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু তিনি খ্রীষ্টান সভ্যতার ক্রটি-বিচ্যুতিগুলিকে স্মুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন, অনেক কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের লোকদের শেখাও, পড়াও, পোশাক পরাও, পয়সা দাও কি জন্মে? আমাদের দেশে এসে আমাদের পূর্বপুরুষদের আমাদের ধর্মকে, আমাদের সব কিছুকে নিন্দা করতে, গালাগাল দিতে।" তিনি বলেন, "তোমরা যতোই আস্ফালন করো, তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম কোথা তরবারির বিনা সাহায্যে সফল হয়েছে? সারা তুনিয়ায় আমাকে একটা জায়গা দেখাও। সারা খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে একটা দৃষ্টান্ত দেখাও। আমি তুটো চাইনে। আমি জানি, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কিভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁদের হয় ধর্মান্তরিত নয় নিহত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না ...কেবল আমরাই আছি! কেন? কারণ, আমরা অন্যান্য সকলকে খুন করেছি।...তোমাদের ধর্ম বিলাসের নামে প্রচারিত হয়।...আমি এখানে এসে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই ভণ্ডামি মাত্র। এই জাতি যদি বেঁচে থাকতে চায়, তবে তাকে খ্রীষ্টের কাছে ফিরে.যেতে হবে। ভগবান ও যক্ষের পূজা একসঙ্গে করা যায় না। এই সমস্ত ধনসম্পদ্ খ্রীষ্ট থেকেই এসেছে? খ্রীষ্ট এ কথা অস্বীকার করতেন। এই বিস্ময়কর ধনসম্পদ্ ও খ্রীষ্টকে যদি তোমরা যুক্ত করতে পারো, ভালো। যদি না পারো, তবে তাঁর কাছে ফিরে যাও, এইসব নিরর্থক প্রচেষ্টা বাদ দাও। খ্রীষ্টহীন হয়ে প্রাসাদে

বাস করবার চেয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে ছিন্ন বাস পরিহিত হয়ে বাস করতে প্রস্তুত হওয়াও শ্রেয়।" তিনি ডেট্রয়েটে একবার বললেন, "কোথা তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম ? এই স্বার্থান্ধ সংগ্রামের মধ্যে এবং অবিরাম ধ্বংসপ্রবণতার মধ্যে যিশু খ্রীষ্টের স্থান কোথা ? সত্যি, তিনি যদি আজ এখানে আসতেন, তবে তাঁর মাথা রাখবার মতো একটুকরো পাথরও পেতেন না।"

বিবেকানন্দের এই ধরনের উক্তিগুলি যে খ্রীষ্টান প্রচারকদের ক্ষিপ্ত ক'রে তুলবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? তারা তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করতে, তাঁর সুনাম নষ্ট করতে, তাঁব চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতে সচেষ্ট হ'লো। এমনকি সুন্দরী তরুণীদের দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করতেও চেষ্টা করলো। কিন্তু মূর্খ তারা, জানত না, সকল নিন্দা, ভয় ও প্রলোভনের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। প্রকৃত ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানরা ও ধর্মযাজকরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, অনেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ ও অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। দেশের অসংখ্য নরনারী বিবেকানন্দের অনুরাগী ও হিন্দুধর্মের গভীর তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে দেখেও খ্রীষ্টান প্রচারকরা ভীত হয়েছিল। তাই তাদের আক্রমণের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছিল। ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল। বিবেকানন্দ যে তাদের ধর্মান্তরণের পথে একটি প্রধান অন্তরায় তা তারা বুঝেছিল।

বিবেকানন্দ শীঘ্রই দেখলেন যে, বক্তৃতা সংস্থাটি তাঁকে অর্থোপার্জনের জন্য ব্যবহার করছে, কেবল তাই নয়, ঠকাচ্ছেও। যেমন, যেখানে একটি বক্তৃতায় তারা পেতো প্রায় আড়াই হাজার ডলার আর স্বামীজীকে দিত মাত্র দুশো ডলার। গোড়ার দিকে তারা স্বামীজীকে এক-একটি বক্তৃতার জন্যে ন শ ডলার পর্যন্ত দিয়েছিল। কিন্তু পরিমাণটা ক্রমেই কমতে লাগলো। কয়েক সপ্তাহ বাদে স্বামীজী ঐ সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকায় তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ ভারতে

এসে পৌঁছতে লাগলো। ভারতের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলিতে মার্কিন সংবাদপত্রসমূহের সংবাদগুলি ছাপা হ'তে লাগলো। বরানগরে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীরাও এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর কীর্তির কথা জানলেন। যদিও তাঁরা জানতেন না যে, এই বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ তাঁদেরই নরেন, তবু কেমন যেন অন্তরে অনুভব করলেন, ইনি তিনিই। বিশ্ব ধর্মমহাসম্মেলনের ছ মাস বাদে তিনি নিজেই তাঁদের সংশয় দূর করলেন। তাঁদের আনন্দের সীমা রইলো না। নরেন একদিন ছুনিয়া কাঁপিয়ে দেবে—ঠাকুরের সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁদের মনে পড়লো।

ভারতের জনসাধারণও আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। ভারত আজ জগৎসভায় আপন আসন সুনির্দিষ্টভাবে লাভ করলো। ঘরে ঘরে স্বামীজীর নাম শোনা যেতে লাগলো। মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে উৎসাহের ও উদ্দীপনার ঝড় বইলো সবচেয়ে বেশি। অসংখ্য সভাসমিতি ক'রে ভারতের সর্বত্র থেকে স্বামীজীকে অভিনন্দন জানানো হ'লো। রামগড়ের রাজা ভাস্কর সেতুপতি, খেতরির মহারাজা অজিত সিং সকলেই তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন পাঠালেন। কলকাতার নাগরিকরা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাউন হলে একটি সভায় মিলিত হলেন। এই সভার সভাপতি রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে বাংলার বিশ্ববিজয়ী সন্তানকে অভিনন্দন জানালেন।

৭
আমেরিকায় দু বছর

স্বামীজীর স্পষ্টবাদিতা যে এক শ্রেণীর লোককে ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত করবে, তাতে আশ্চর্য কি। আমেরিকার বিখ্যাত সংশয়বাদী দার্শনিক ও বাগ্মী রবার্ট ইঙ্গারসলের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয়ে বহুবার তর্কবিতর্ক ও আলোচনাও হয়েছিল। ইঙ্গারসল একবার স্বামীজীকে এখানে খুব বেশী সাহসী ও স্পষ্টবাদী না হ'তে উপদেশ দিয়েছিলেন। স্বামীজী প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কেন এ কথা বলছেন। তার উত্তরে ইঙ্গারসল বলেছিলেন, "পঞ্চাশ বছর আগে আপনি যদি এ দেশে ধর্মপ্রচার করতে আসতেন, তবে আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হ'তো বা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ'তো। তার অনেক পরে এলেও আপনাকে ইটপাটকেল মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'তো।" মার্কিন জাতির মধ্যে কিছুদিন পূর্বেও এইরকম ধর্মোন্মত্ততা ও কুসংস্কার ছিল জেনে স্বামীজী বিস্মিত হয়েছিলেন। যাই হ'ক স্বামীজী ইঙ্গারসলের পরামর্শ শোনেননি, কারণ তিনি জানতেন, সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতা সমার্থক। যে সত্যের সন্ধান করতে চায়, যে সত্যের সন্ধান দিতে চায়, তার রেখে ঢেকে কিছু বলবার বা করবার উপায় কি ?

বক্তৃতা সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেও স্বামীজী জনসভায় ও ঘরোয়া বৈঠকে নিয়মিত বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তিনি সপ্তাহে গড়ে বারো-তেরোটি বক্তৃতা দিতেন। এতে তাঁর শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তাঁর ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। অনেক সময় তিনি অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করেন। বক্তৃতার পরে সামান্য বিশ্রামের

সময়েও তাঁকে ভাবতে হ'তো পরবর্তী বক্তৃতায় তিনি কি বলবেন। নিদ্রার ঘোরেও তিনি অনেক সময় পরদিন কি বলবেন, তা শুনতে পেতেন। কে যেন চীৎকার ক'রে তাঁকে কথাগুলি বলত। অনেক সময় তন্দ্রাঘোরে তিনি বোধ করতেন, কে যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে আর শুয়ে শুয়ে তিনি শুনছেন। অনেকসময় দুটি কণ্ঠস্বরকে তিনি তর্কবিতর্ক করতে শুনতেন আর দেখতেন পরদিন বক্তৃতায় তিনি এই শোনা কথাগুলিরই হুবহু পুনরুক্তি করছেন। এর মধ্যে এমন অনেক কথা থাকতো, যা তিনি পূর্বে কখনও শোনেননি বা চিন্তা করেননি। তাঁর বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করতো, "স্বামীজী, আপনি কাল রাতে কার সঙ্গে তর্ক করছিলেন?" স্বামীজী মৃদু হেসে জবাব এড়িয়ে যেতেন। তাঁর কাছে এটা অলৌকিক, এমনকি অস্বাভাবিক, কিছু ছিল না।

এই সময়ে এবং পরে পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী নিজেকে অসামান্য যৌগিক শক্তির অধিকারী বোধ করতেন। আপনা থেকে তাঁর মধ্যে যৌগিক শক্তির বিকাশ ঘটছিল, অথচ সে শক্তিকে তিনি কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি এই শক্তির প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে সামান্য স্পর্শের দ্বারা তার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারতেন। অনেক দূরবর্তী স্থানে বা কালে কি ঘটছে বা ঘটবে, তাও তিনি বলতে পারতেন। তিনি নিমেষে কারও অখণ্ড অতীত জীবন ও বর্তমান চিন্তার কথা বুঝতে পারতেন। একবার চিকাগোর এক ধনী তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি যা বললেন, তা যদি সত্য, তবে আপনি কই আমার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন দেখি।" স্বামীজী এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ ক'রে লোকটির চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালেন। মুহূর্তে লোকটির সেই হাস্যপরিহাসের ভঙ্গিটি চ'লে গেল। সে চীৎকার করে উঠলো, "এ আপনি কি করছেন, স্বামীজী? আমার সমস্ত ভেতরটা আলোড়িত হচ্ছে এবং আমার

জীবনের গোপনীয় যা কিছু যেন স্পষ্টভাবে বাইরে উঠে আসছে।" বিখ্যাত গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে খুব মানসিক অশান্তির মধ্যে ছিলেন। স্বামীজী যখন চিকাগোতে ছিলেন, তখন মাদাম কাল্‌ভে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে যান। প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীজী মাদাম কাল্‌ভেকে তাঁর জীবন সম্পর্কে এমন সব কথা বলেন, যা তিনি নিজে ছাড়া কেউ আর জানত না। মাদাম কাল্‌ভে বিস্মিত হন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে মাদাম কাল্‌ভের জীবনে অভাবিত পরিবর্তন আসে। তাঁর মানসিক অশান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয় এবং তিনি পুনরায় হাসিখুশী হয়ে ওঠেন। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে প্রথম যেদিন স্বামীজীর সঙ্গে মিসেস ফাংকে ও মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেদিনও স্বামীজী তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে যা দেখেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

দৈনন্দিন প্রচারকার্যের দ্বারা স্বামীজী আমেরিকায় যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন স্থায়ী কিছু করতে। সেজন্যে প্রয়োজন ছিল তাঁর কয়েকজন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের, যারা তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কেবল ব্যাপক বক্তৃতাদানের দ্বারা তা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুললেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ডেট্রয়েটে বক্তৃতা দিতে যান। এখানে তিনি ছ সপ্তাহ থাকেন। এখানে চার সপ্তাহ তিনি মিচিগানের প্রাক্তন রাজ্যপাল মিস্টার জন ব্যাগলির বিধবা পত্নীর অতিথিরূপে ছিলেন। পরবর্তী দু সপ্তাহ তিনি বিশ্ব মেলা কমিশনের প্রেসিডেণ্ট মার্কিন সেনেটের ভূতপূর্ব সদস্য ও স্পেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত টমাস পামারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ডেট্রয়েটে তিনি ইউনিটারিয়ান চার্চে বহু বক্তৃতা দেন। যখন চিকাগোতে থাকতেন, তখন তিনি মিঃ জর্জ ডাব্লিউ হেইলের গৃহে অতিথিরূপে থাকতেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে তিনি কখনো

চিকাগোতে, কখনো নিউ ইয়র্কে, কখনো বোস্টনে বক্তৃতা দিয়ে কাটান। জুন মাসটা তিনি চিকাগোতে থাকেন। এর পর কিছুদিন নিউ ইংলণ্ডের গ্রীন একারে 'গ্রীন একারে' সম্মেলনে যান ও সেখানে কতিপয় বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি একদল প্রকৃত আগ্রহী ছাত্র পান। এই ছাত্ররা তাঁর কাছে ভারতীয় রীতি অনুসারে একটি বৃক্ষতলে ব'সে তাঁর কাছে নিয়মিত পাঠ নিতে আরম্ভ করেন। গ্রীন একারে স্বামীজী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। এর পর তিনি কিছুদিন বোস্টন, চিকাগো ও নিউ ইয়র্ক শহরে এবং শহরের উপকণ্ঠগুলিতে বুদ্ধিজীবীদের সংস্থাসমূহে ও সৌখিন সমাজের মজলিসে বক্তৃতা দেন। অক্টোবরের শেষে তিনি বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনে যান। নভেম্বর মাসে তিনি আবার নিউ ইয়র্কে আসেন। এই সময়ে স্কুল অব কম্প্যারেটিভ রিলিজন্স্-এর পরিচালক ডঃ লুইস জেন্স্ স্বামীজীকে ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কতিপয় বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানান। ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি থেকেই আমেরিকায় স্বামীজীর স্থায়ী কাজের সূচনা হয়।

স্বামীজী খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, করতালি, হর্ষধ্বনি, সংবাদপত্রের প্রশস্তি প্রভৃতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি স্থায়িভাবে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে চাইলেন। তিনি ঐ সময়ে নিউ ইয়র্কে একটি ভাড়াবাড়ির দ্বিতলে একটি সাধারণ কক্ষে বাস করতেন। যাঁরা ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ওই কক্ষে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। স্বামীজী চাইলেন, এঁদের মধ্য থেকে তাঁর প্রকৃত কতিপয় শিষ্য গড়ে তুলতে। স্বামীজী বিনা ফীতে তাঁর নিজের বাসায় ক্লাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। এজন্যে যা ব্যয় হ'ল, তা তিনি বক্তৃতা-সফরে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে মেটাতে লাগলেন। এখানে বহু কৌতূহলী ও কতিপয় প্রকৃত আগ্রহী ছাত্র এলো। ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে

লাগলো। স্বামীজী মেঝেতে বসতেন এবং তাঁকে ঘিরে বসতো তাঁর ছাত্ররা; ঘরে তিলধারণের ঠাঁই থাকতো না। ছাত্রের ভীড় শেষে উপচে পড়তো ঘরের বাইরে বারান্দায় ও সিঁড়িতে। সিঁড়ির ধাপগুলি নিয়মিত প্রথম শ্রেণীর গ্যালারি হয়ে উঠতো। স্বামীজী এখানে পাঠ দেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেব ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত। প্রতিদিন সকালে এবং প্রতি সপ্তাহে কয়েকটি সন্ধ্যায় স্বামীজী পাঠ দিতেন। তিনি কয়েকজন নির্বাচিত ছাত্রকে ধ্যান ও যোগাভ্যাসেব পাঠও দিতেন। অনেক সময় তিনি নিজেও সমাধিস্থ হয়ে যেতেন এবং তাঁর সমাধি ভাঙতে বেশ সময় লাগতো। এইসব ক্ষেত্রে স্বামীজী অধৈর্য হয়ে উঠতেন। এই সময়ে তিনি নিজেব মধ্যে যোগীর চেয়ে গুরুকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন।

স্বামীজী তাঁর প্রচারকার্যে দ্রুত সাফল্য লাভ করলেও তাঁকে যথেষ্ট প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অতিশয় অনুবক্ত হ'লেও সংকীর্ণমনা খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাঁর তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করছিল। অনেকে তাঁব ব্যক্তিগত চরিত্রেও কলঙ্ক আরোপ করছিল। তাঁকে যাঁবা নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করতেন, তাঁদের কাছে অনেক সময় তাঁর সম্পর্কে নানা অলীক কলঙ্ককর কাহিনী বর্ণনা ক'রে চিঠিপত্র আসতো। অনেক সময় এইসব চিঠিপত্রে কাজও হ'তো। স্বামীজী আমন্ত্রিত হয়ে কোন বাড়িতে গিয়ে দেখতেন, সেখানে তাঁর জন্যে দ্বার রুদ্ধ। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐসব ব্যক্তির ভুল ভাঙতো এবং পরে তাঁরা এসে স্বামীজীর কাছে মার্জনা চাইতেন।

স্বামীজী তাঁর এই অবিরাম কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ভারত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। তিনি নিয়মিত মাদ্রাজ ও উত্তর ভারতের শিষ্যদের পত্র লিখতেন এবং কর্মে ও সেবায় উদ্দীপিত ক'রে তুলতেন। নিউ ইয়র্কে নিয়মিতভাবে কাজ শুরু করবার পরে তিনি তাঁর মাদ্রাজের শিষ্যদের বেদান্ত প্রচারের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেন। এজন্যে তিনি আমেরিকার বক্তৃতা-লব্ধ

অর্থ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা তাঁদের পাঠান। এইভাবে বিখ্যাত 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার উদ্ভব হয়।

স্বামীজী এইসময় নিউ ইয়র্কে তাঁর ছাত্রদের 'রাজযোগ' শিক্ষা দেন। ছাত্রদের তিনি সাত্ত্বিক আহার ও নিষ্কলুষ জীবনযাত্রা সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেন। দেহ ও মনের যোগাযোগ সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব আমেরিকার বহু বিখ্যাত চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করে। এঁদের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স্‌ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'রাজযোগ' রচনা করেন। তাঁর লিপিকার ব্রুকলিনের মিস্‌ এস. ই. ওয়াল্‌ডো (ভগিনী হরিদাসী) লিখেছেন, "স্বামীজী যখন আমাকে তাঁর কথাগুলি ব'লে যেতেন তখন তাঁকে দেখলে মনে অনুপ্রেরণা জাগতো। তিনি সূত্রের ওপর তাঁর টীকাগুলি বলতে বলতে প্রায়ই গভীরভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, তখন আমাকে দীর্ঘসময় অপেক্ষা ক'রে থাকতো হ'তো। তারপর ধ্যানভঙ্গ হ'লে তিনি যেসব ব্যাখ্যা দিতেন, সেগুলিতে বিষয়গুলি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো।"

ইতিমধ্যেই অনেকে স্বামীজীর অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন এমন কয়েকজন শিষ্য, যাঁদের তিনি সন্ন্যাসীরূপে কাজে নিয়োগ করতে পারেন। ইতিমধ্যেই তিনি এরকম দুজন শিষ্য পেয়েছিলেন—মাদাম মারী লুইস এবং লেওন ল্যাণ্ড্‌স্‌বার্গ। মাদাম মারী লুইস ছিলেন ফরাসী মহিলা। তিনি পঁচিশ বছর নিউ ইয়র্কে ছিলেন এবং আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আমেরিকায় জড়বাদী ও সমাজবাদী রূপে সুপরিচিতা ছিলেন। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন মানহাটান উদারনৈতিক ক্লাবের সদস্যা। তিনি কি সংবাদপত্রে, কি বক্তৃতামঞ্চে, সর্বত্রই একজন প্রগতিশীল, নির্ভীক ও সংগ্রামী মহিলারূপে পরিচিতা ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি তার একান্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন

এবং পরে স্বামীজী তাঁকে স্বামী অভয়ানন্দ নামে দীক্ষা দেন। লেওন ল্যাণ্ড্স্বার্গ ছিলেন একজন দেশত্যাগী রুশ ইহুদী। তিনি নিউ ইয়র্কের বহু বিখ্যাত কাগজে সাংবাদিকরূপে দীর্ঘদিন কাজ করেন। তিনিও স্বামীজীর একান্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং স্বামীজী তাঁকে স্বামী কৃপানন্দ নামে দীক্ষা দেন। স্বামীজীর প্রতি আরও যাঁরা একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিসেস ওলি বুল, ডঃ অ্যালান ডে, মিস এস্. ই. ওয়াল্ডো, অধ্যাপক ওয়াইসম্যান, অধ্যাপক ওয়াইট ও ডঃ স্ট্রীট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিউ ইয়র্কের ধনীসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট ও মিসেস লেগেট এবং মিস্ জোসেফিন ম্যাকলয়েড ছিলেন স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বামীজী ডিক্সন সোসাইটিতে বহুবার বক্তৃতা দেন। এই সোসাইটির সদস্যরা স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বিখ্যাত বৈদ্যুতবিজ্ঞানী নিকলাস টেল্সা স্বামীজীব মুখে সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা শুনে ভারতীয় দর্শনের উৎসাহী ছাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান সাংখ্য দর্শনের মধ্যে তার বহু সমস্যার মীমাংসা পেতে পারবে। পরে (১৮৯৬) বিশ্ববিখ্যাতা ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড স্বামীজীর বাণী ও আদর্শেব প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী হন। বিখ্যাত গায়িকা মাদাম কাল্ভেও স্বামীজীর একান্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন।

নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর ক্লাসগুলি অসামান্য সাফল্য লাভ করে। অনুরাগী ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এতোই বৃদ্ধি পায় যে স্বামীজীকে নিচের তলায় একটি বড় হল ভাড়া নিতে হয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বামীজীর কাজ অনেকখানি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ভক্তরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন। স্বামীজীও তাঁর শিক্ষালয়ের বাইরে বহু বক্তৃতা দিয়ে অর্থসংগ্রহ করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দটি ছিল স্বামীজীর জীবনের সর্বাধিক কর্মব্যস্ত বৎসর। কয়েকমাস অক্লান্ত

পরিশ্রমের পর স্বামীজী দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করতে থাকেন। এই সময়ে নিউ হ্যাম্প্‌শায়ারের পার্সি থেকে তাঁর বন্ধু ও ভক্তরা তাঁকে পাইন-অরণ্যে ঘেরা পার্সিতে কিছুদিন বিশ্রামের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তাই বাকী গ্রীষ্মকাল তিনি নিউ ইয়র্কে ক্লাস বন্ধ রেখে পার্সি যেতে মনঃস্থ করেন। কিন্তু তাঁর অনেক শিষ্য তাঁকে পার্সি থেকে ফিরে এসে গ্রীষ্মকালেই ক্লাস শুরু করতে অনুরোধ জানান। ফলে স্বামীজী সমস্যায় পড়েন। কিন্তু সমস্যাটির একটি সহজ সমাধান হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে সেণ্ট লরেন্স নদীর বৃহত্তম দ্বীপ থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে মিস ডাচার নামে তাঁর এক শিষ্যার একটি ছোট বাড়ি ছিল। মিস ডাচার স্বামীজীকে এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যকে থাকবার জন্যে এই বাড়িটি দিতে চান। স্বামীজী পার্সিতে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দু-চারদিন কাটিয়ে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যেতে রাজী হন। মিস্ ডাচার ইতিমধ্যে স্বামীজীর জন্যে ঐ বাড়িটির পাশে আরও একটি ছোট বাড়ি তৈরি ক'রে দেন। নদীতীরে একটি পাহাড়ের উপর এই বাড়িটার পরিবেশ ছিল মনোরম। বাড়িটির চারিদিকে নীচে ছিল সবুজ বনভূমি, বনভূমির পরে সেণ্ট লরেন্সের সুবিস্তৃত জলরাশি ও তার মধ্যে দ্বীপাবলী। স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জন, বহির্জগৎ যেন ছবির মতো দেখা যায়। পাখীর গান, ঝিঁঝিঁর ডাক, বাতাসের শব্দ, এই নির্জনতাকে আরও পরিস্ফুট ক'রে তোলে। এই স্থানটিকে স্বামীজীর আরও ভালো লাগে এই কারণে যে, এই বহির্জগৎ থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্ন স্থানে প্রকৃত আগ্রহী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আসবে না। এখানেই সুদূর ডেট্রয়েট থেকে এসে মিসেস ফাংকে ও মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল এক ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগময় রাতে বন ও পাহাড় ভেঙে তাঁর সঙ্গে এসে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, রামকৃষ্ণের সেই দ্বাদশ বালক ভক্তের মতো বারোজন ছাত্রই এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। স্বামীজী এঁদের তাঁর প্রকৃত অনুগামী

বলতেন। স্বামীজী এখানে সংঘজীবনের আদর্শ অনুসরণ করতে এবং প্রত্যেককে গৃহকর্মে নিজ নিজ অংশ নিতে বলেন। তিনি নিজে প্রায়ই রান্নার ও পরিবেশনের ভাব নিতেন। ঐ সময়ে তিনি হাস্যপরিহাসে যে কতো নিপুণ, তা প্রকাশ পেতো। শিষ্যরা তাঁর কাজে চলনে বলনে হেসে লুটোপুটি খেত।

১৯শে জুন সকালে বাইবেল দিয়ে তিনি এখানে তাঁর পাঠদান শুরু করেন। ৬ই আগস্ট তাঁব পাঠদান শেষ হয় এবং ৭ই আগস্ট তিনি নিউ ইয়র্ক যাত্রা করেন। এই সাত সপ্তাহ তিনি যে পাঠ দিয়েছিলেন, আলাপ-আলোচনা কবেছিলেন, তার অধিকাংশই মিস্ ওয়াল্‌ডো টুকে রেখেছিলেন, সেগুলি পবে Inspired Talks নামে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হয়। গঙ্গাতীবের সেই দক্ষিণেশ্বরের মতোই একটি অপার্থিব আবহাওয়া ছিল এই সেণ্ট লরেন্সেব তীরে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে। স্বামীজীর এই সাত সপ্তাহ পরম আনন্দে কেটেছিল। তিনি এখানে একবার দক্ষিণেশ্ববেব মতোই নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়েছিলেন। এখানে দুজনকে তিনি সন্ন্যাসীরূপে এবং কয়েকজনকে ব্রহ্মচারীরূপে দীক্ষিত করেন। রামকৃষ্ণের মতোই প্রথম দর্শনে তিনি ভক্তদের চিনবার শক্তি অর্জন করেছিলেন। তাই মিসেস ফাংকে ও মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলকে তাঁদের আসবার পরদিনই তিনি ব্রহ্মচারীরূপে দীক্ষা দেন।

এক বছর আগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসেই স্বামীজী প্রথম ইংলণ্ড যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কেবল আমেরিকায় নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আমেরিকায় একান্ত ব্যস্ত থাকায় তা এতোদিন সম্ভব হয়নি। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের দিনগুলির পরে তাঁর এই ধারণা দৃঢ় হ'লো যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমেরিকায় তাঁর বাণী ও আদর্শ প্রচার অব্যাহত থাকবে। তাই এখন তিনি ইংলণ্ড যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

৮

ইংলণ্ডে

আমেরিকায় মিস্ হেনরিয়েটা মুলার ও মিঃ ই. টি. স্টার্ডি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই ইংলণ্ড থেকে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। তাঁরা দুজনেই তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্যে স্বামীজীকে অনুরোধও জানিয়েছিলেন। স্বামীজীর নিউ ইয়র্কবাসী এক বন্ধুও এই সময়ে প্যারিসে গিয়েছিলেন। তিনি স্বামীজীকে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীজীর নিজেরও কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। সমুদ্র ভ্রমণে তাঁর ক্লান্ত দেহমন সজীব হয়ে উঠবে, এমনও মনে হয়েছিল তাঁর। তাই তিনি আগস্ট মাসের (১৮৯৬) মাঝামাঝি নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়ে আগস্ট মাসের শেষাশেষি প্যারিসে পৌঁছলেন। প্যারিসে তিনি অল্প কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসমতো তিনি প্যারিসের জাদু-ঘরগুলি, গির্জা ও ভজনালয়গুলি, কলা-প্রদর্শনালয়গুলি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তাঁর বন্ধু প্যারিসের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামীজী এই কয়েক দিনে ফরাসী জাতি, ফরাসী সংস্কৃতি, ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেললেন।

প্যারিস থেকে তিনি ইংলণ্ডে পাড়ি দিলেন। ইংলণ্ড ভ্রমণের কথা তিনি অনেকদিন থেকে ভাবলেও এবং ইংলণ্ডে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে আশা পোষণ করলেও প্রথমে ইংলণ্ড তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে তাঁর কিছুটা সংশয় ছিল। তিনি ভারতীয়, ইংলণ্ড

শাসিত-শোষিত একটি দেশের অধিবাসী। শাসক জাতি অহংকারীই হয়ে থাকে ; তাই ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর প্রচারকে স্পর্ধা ব'লে উপেক্ষা করবে কিনা কে জানে! কিন্তু শীঘ্রই তাঁর সকল সংশয় দূর হ'লো। মিঃ স্টার্ডি ও মিস ম্যুলার সহ বহু বন্ধু তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। একে একে এইসব বন্ধুদের গৃহে তিনি আতিথ্যও গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন বিশ্রামের পরই তাঁর কাজ শুরু হ'লো। তিনি দিনের বেলা দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়ালেও সকালে ও সন্ধ্যায় ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হতেন। তাঁর খ্যাতি দ্রুত আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো। ইংলণ্ডের বহু বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁর সাক্ষাৎকারে এতোই প্রীত ও বিস্মিত হলেন যে, সংবাদপত্রগুলি তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো। ফলে রাতারাতি এই 'ভারতীয় যোগী' সম্পর্কে লণ্ডনবাসীদের কৌতূহল ও আগ্রহের সীমা রইলো না। সকল স্তরের লোকই স্বামীজীর সান্নিধ্য পেতে চাইলো। লেডি ইসাবেল মার্গেসনের মতো সম্ভ্রান্ত মহিলারাও তাঁর বৈঠকগুলিতে নিয়মিত যোগ দিতে লাগলেন।

স্বামীজী আবার বিপুল কর্মশক্তি নিয়ে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে বহু ঘরোয়া বৈঠক করলেও তাঁর বন্ধুরা লণ্ডনের জনসাধারণের উদ্দেশে তিনি যাতে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে পারেন, তার ব্যবস্থা করলেন। ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যায় লণ্ডনের অন্যতম শৌখিনতম স্থান পিকাডিলিস্থ প্রিন্সেস্ হলে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা হ'লো। এই সভায় লণ্ডনের সকল স্তরের অসংখ্য মানুষ ভীড় ক'রে এলেন, তাঁদের মধ্যে লণ্ডনের কয়েকজন খ্যাতনামা চিন্তানায়কও ছিলেন। স্বামীজী সভায় 'আত্মজ্ঞান' সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শ্রোতাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করলো। পরদিন লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহ স্বামীজীর প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হ'লো। ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর জীবন ও বাণীকে এইভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে দেখে স্বামীজী আনন্দিত হলেন।

এই জনসভায় বক্তৃতার পর তিনি মাসখানেক মাত্র ইংলণ্ডে ছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করলেন। এখানেই তিনি মিস্ মার্গারেট নোবলের মতো একজন অনুরাগিনী শিষ্যা পেয়েছিলেন, যিনি পরে ভারতকে তাঁর স্বদেশ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতারূপে ভারতবাসীর জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মিস্ মার্গারেট ছিলেন সুশিক্ষিতা আধুনিকা তরুণী। তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতিনী। শিক্ষার আধুনিকতম রীতিগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও উৎসাহিনী। তিনি ছিলেন সুলেখিকা। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা মনীষীদের বন্ধু ও স্নেহভাগিনী। স্বামীজীর ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে গভীর ভাবে কৌতূহলী ক'রে তুললো। নভেম্বর মাসের এক রবিবারে ওয়েস্টএণ্ডের এক সান্ধ্য মজলিসে মিস্ নোব্‌ল স্বামীজীকে প্রথম দেখেন। তারপর থেকে তিনি প্রায় স্বামীজীর সকল বৈঠকেই যোগ দিতে থাকেন। তিনি স্বামীজীর বক্তব্যগুলিকে গোড়ার দিকে বিচার ক'রে দেখেন এবং অনেক বক্তব্য সহজে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে তর্কও করেন। কিন্তু স্বামীজী এতে অসন্তুষ্ট হন না। তিনি মিস্ নোব্‌লের মধ্যে একটি বিচারশীল বিশুদ্ধ মনের সন্ধান পেয়েছিলেন। মিস্ নোব্‌লের এই দ্বিধা ও সংশয় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। স্বামীজী আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার আগেই মিস্ নোব্‌ল স্বামীজীকে 'গুরুদেব' ব'লে ডাকতে শুরু করেন।

স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে আসতে মনঃস্থ করেছিলেন, তখন তাঁর ধারণা ছিল, এবার গিয়ে ইংলণ্ডে ক্ষেত্রটা তৈরি ক'রে আসবেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এসে তিনি যে সাফল্য লাভ করলেন, তা তাঁর সকল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল। ইংলণ্ডে হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি বহু উৎসাহী বন্ধু লাভ করলেন। ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষ ও সম্ভ্রান্ত সমাজ, উভয়ই তাঁকে সাদরে স্থান দিলো। কিন্তু

এবার তিনি বেশিদিন ইংলণ্ডে থাকতে পারলেন না। আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত চিঠি লিখছিলেন। ইংলণ্ডের বন্ধুরাও তাঁকে এতো তাড়াতাড়ি ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজী ভাবলেন, ইংলণ্ডে এবারে তিনি যে বীজ বপন ক'রে গেলেন, তা অঙ্কুরিত হ'তে থাক, ইতিমধ্যে তিনি আমেরিকায় আরও কিছু কাজ ক'রে আসবেন। বোস্টনের এক ধনী মহিলা স্বামীজীকে আগামী শীতকালে নিউ ইয়র্কে তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে আমেরিকায় কাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

স্বামীজী ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্বে যাঁরা তাঁর চিন্তাধারায় উদ্দীপিত হয়েছেন, তাঁদের নিয়মিতভাবে ভগবদ্‌গীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র পাঠের জন্য নিয়মিত মিলিত হ'তে পরামর্শ দিলেন। তারপর তিনি তাঁর অসংখ্য অনুরাগী বন্ধু ও ভক্তের কাছে বিদায় নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন এবং ৬ই ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছলেন।

৯

আবার আমেরিকায়

স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে তাঁর শিষ্যরা, বিশেষতঃ স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ, বেদান্ত প্রচারের কাজ সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা কেবল নিউ ইয়র্কেই নিয়মিত সভাসমিতি করছিলেন না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরেও স্বামীজীর বাণী ও বেদান্ত প্রচার করছিলেন। তাঁরা বাফেলো ও ডেট্রয়েটের মতো কয়েকটি স্থানে নূতন প্রচারকেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। ফিরে আসার পর স্বামীজী নিউ ইয়র্কের থার্টি-নাইন্‌থ্‌ স্ট্রীটে দুটি প্রশস্ত কক্ষ নিয়ে তাঁদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করলেন। এখানে রইলেন স্বামীজী ও কৃপানন্দ। এই দুটি কক্ষে প্রয়োজন হ'লে দেড়শ লোক বসতে পারত। যে ভদ্রমহিলা অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি পেছিয়ে গেলেন। কিন্তু স্বামীজী কখনও কোনও ব্যক্তির বদান্যতার ওপর নির্ভর করতেন না। তাই তাঁর কাজ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হ'লো না।

তিনি শিষ্যদের নিয়ে পুনরায় ক্লাস শুরু করলেন। এবার তিনি বিশেষভাবে 'কর্মযোগের' পাঠ দিলেন। কর্মযোগ সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত পাঠগুলি পরে 'কর্মযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকের মতে, এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। স্বামীজী কখনও লিখিত ভাষণ পড়তেন না, তাই তাঁর অমূল্য ভাষণগুলি যাতে রক্ষা করা যায়, সেজন্য তাঁর শিষ্যরা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিক থেকে একজন স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ করেন। কিন্তু দেখা গেল, স্টেনোগ্রাফার স্বামীজীর সঙ্গে সমান তালে চলতে পারেন না, বিশেষতঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্টেনোর জ্ঞান না থাকায় তাঁর অসুবিধা হয়। স্টেনোগ্রাফার

বদলেও কোনও ফল পাওয়া গেল না। হঠাৎ জে. জে. গুডুইন নামে এক ভদ্রলোককে এই কাজে নিয়োগ করা হ'লো। গুডুইন ইংলণ্ড থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন। তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের প্রতিটি কথা প্রতিটি অক্ষর অনুলেখন নিতে পারতেন। গুডুইন ছিলেন নিতান্ত সংসারী মানুষ, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এল। স্বামীজী গুডুইনকে তাঁর অতীত জীবনের অনেক কথা ব'লে দেন। গুডুইন স্বামীজীর একান্ত অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। এখন থেকে গুডুইন স্বামীজীর নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠলেন; তিনি ছিলেন স্বামীজীর পরিচারক, সেক্রেটারী, স্বামীজীর নিজেব ভাষায়, তাঁর দক্ষিণ হস্ত। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ডে ও ভারতেও গিয়েছিলেন। ভারতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে স্বামীজী বোস্টনে যান এবং মিসেস্ ওলি বুলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান থেকে ফিরেই তিনি নিউ ইয়র্কের হার্ডেম্যান হলে ৫ই জানুয়ারি থেকে প্রতি রবিবার প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি ব্রুকলিনের মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে এবং নিউ ইয়র্কের পিপল্স্ চার্চেও অনেকগুলি ভাষণ দেন। বক্তৃতাগুলি শুনবার জন্যে দলে দলে মানুষ আসতে থাকে এবং শ্রোতাদের আগ্রহ ও উৎসাহ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। স্বামীজী এই প্রকাশ্য বক্তৃতাদানের সময়েও দিনে দুবার ক'রে ক্লাস নিতেন। ক্লাসগুলিতে ছাত্রের সংখ্যা আশাতীত রূপে বাড়ে। যাঁরা প্রকাশ্য জনসভায় যেতেন, তাঁরাও পরে এখানে আসতেন।

হার্ডেম্যান হলে স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিতেন, তখন সেখানে তিল ধারণের স্থান থাকতো না। তিনি বিদ্যুৎ-বাগ্মী (lightning orator) আখ্যা পেয়েছিলেন। শ্রোতাদের স্থান সংকুলান করবার

জন্যে পরে ম্যাডিসন স্কোয়ারে গার্ডেন নামে এক প্রকাণ্ড হল ভাড়া নিতে হয়। এখানে তিনি 'ভক্তিযোগ', 'বাস্তব ও আপাতঃ মনুষ্য', 'আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি দেন। এই সময়ে তিনি তাঁর ক্লাসগুলিতে 'ভক্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগ' 'সাংখ্য ও বেদান্ত' সম্পর্কে বহু বক্তৃতা দেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি (১৮৯৬) তারিখে 'আমার গুরু' বক্তৃতাটি দিয়ে তিনি ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে তাঁর বক্তৃতামালা শেষ করেন। এই বক্তৃতাটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতারূপে অমর হয়ে আছে।

এই সময়েই (১৩ই ফেব্রুয়ারি) তিনি ডঃ স্ট্রীটকে সন্ন্যাসীরূপে দীক্ষা দেন। ডঃ স্ট্রীট যোগানন্দ নামে পরিচিত হন। অনেক মার্কিন তরুণ-তরুণীকে স্বামীজী এই সময় মন্ত্র দেন।

ইতিমধ্যে তাঁর 'রাজযোগ', 'ভক্তিযোগ' ও 'কর্মযোগ' সম্পর্কে পাঠদান সমাপ্ত হয় এবং বক্তৃতাগুলি মিঃ গুডুইনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়। তাছাড়া রবিবারে প্রদত্ত স্বামীজীর বহু বক্তৃতা ইতিমধ্যে পুস্তিকাকারে বেরোয়।

নিউ ইয়র্কে কাজ শেষ ক'রে স্বামীজী আমন্ত্রণ পেয়ে ডেট্রয়েটে যান এবং সেখানে দু-সপ্তাহ বক্তৃতা দেন। ২৫শে মার্চ তারিখে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাত্রদের সমাবেশে বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বামীজীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ দিতে চান। কিন্তু স্বামীজী সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন, বলেন, তিনি সন্ন্যাসী।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তিনি তাঁর বেদান্ত প্রচারের আন্দোলনকে একটি সংস্থায় সংহত করেন। এইভাবে 'বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্কের' উদ্ভব হয়। এই সংস্থায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে নিজের ধর্মমত পরিবর্তন না ক'রে সদস্য হওয়ার

আমন্ত্রণ জানানো হয়। সহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতাই হয় সংস্থার আদর্শ। সোসাইটির সদস্যরা 'বেদান্তিন্' নামে পরিচিত হন এবং বেদান্ত সাহিত্য পাঠ, প্রচার ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবার জন্যে নিয়মিতভাবে মিলিত হ'তে থাকেন। স্বামীজীর 'রাজযোগ', 'ভক্তিযোগ' ও 'কর্মযোগ' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি ব্যাপক প্রচারলাভ করে। সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে সেগুলি উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হয় এবং আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক ও দেহতাত্ত্বিকরা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

এইরকম একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বামীজী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবধারার মিলন ঘটাতে চান। তিনি ভারত থেকে এখানে প্রচারের জন্য কিছুসংখ্যক গুরুভাইকে আনান। আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে তাঁর কিছুসংখ্যক শিষ্যকে তিনি পাঠাতে চান ভারতে। ভারতীয় গুরুভাইরা আমেরিকার ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন; আর মার্কিন ও ইংরেজ শিষ্যরা ভারতে বয়ে যাবেন আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংঘ ও সহযোগের বাণী প্রচার করতে। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখনই তিনি স্বামী সারদানন্দকে আসবার জন্যে লিখেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁর আসতে বিলম্ব হচ্ছিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালেই ইংলণ্ড থেকে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে শীঘ্র ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। স্বামীজীও সেখানে সত্বর একবার যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন। এত শীঘ্র বেদান্ত সোসাইটি স্থাপনের এ-ও একটা কারণ ছিল। স্বামীজী ভেবেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহর নিউ ইয়র্কে এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান শহর লণ্ডনে দুটি ঐ ধরনের সংস্থা স্থাপন করতে পারলে সমস্ত ইংরেজীভাষী দুনিয়ায় তাঁর প্রচার-কার্য সহজ হয়ে উঠবে। তাই স্বামীজী লণ্ডন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। লণ্ডন যাত্রার পূর্বে তিনি বেদান্ত সোসাইটির কাজকর্মের

ভার তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে গেলেন। মিস্ ওয়াল্‌ডো বা ভগিনী হরিদাসীই রাজযোগের দর্শনে ও অনুশীলনে সর্বাধিক নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। তাই সোসাইটির আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব তাঁরই ওপর ন্যস্ত হ'লো। তারপর রইলেন কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ, যোগানন্দ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী শিষ্য। নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ধনী মিঃ ফ্রান্সিস এচ. লেগেটকে স্বামীজী বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলেন। এ ছাড়া রইলেন বহু উৎসাহী কর্মী ; যেমন মিস্ মেরী ফিলিপ্‌স্, মিসেস আর্থার স্মিথ, মিঃ ও মিসেস ওয়াল্টার গুডইয়ার, ও বিখ্যাত গায়িকা মিস্ এমা থার্স্‌বি। তিনি স্বামী সারদানন্দকে দ্রুত ইংলণ্ডে মিঃ স্টার্ডির ঠিকানায় চলে আসতে লিখলেন। তারপর ১৫ই এপ্রিল তারিখে নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডনে রওনা হয়ে গেলেন।

১০

আবার ইংলণ্ডে—ইউরোপে

বিবেকানন্দ লণ্ডনে পৌঁছে দেখলেন, স্বামী সারদানন্দ ইতি-মধ্যেই পৌঁছে গেছেন। কয়েক বছর যাবৎ কোন গুরু ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। তাই সারদানন্দজীকে দেখে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। সারদানন্দজী তাঁকে ভারতের সকল সংবাদই দিলেন, আলমবাজারের নূতন মঠের ও গুরুভাইদের কথা বললেন। স্বামীজীও তাঁর গুরুভাইকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে জানালেন। স্বামীজী সারদানন্দের সঙ্গে লণ্ডনের সেণ্ট জর্জস্ রোডে মিস মুলার ও মিঃ স্টার্ডির অতিথিরূপে রইলেন। অচিরেই তাঁর ঘরোয়া বৈঠক ও প্রকাশ্য ভাষণ শুরু হয়ে গেল এবং দলে দলে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, ঔপমিক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থীরা ও সত্যসন্ধানীরা এসে তাঁর গৃহে ভীড় করতে লাগলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের গোড়াতেই স্বামীজী নিয়মিতভাবে তাঁর ক্লাস শুরু করলেন এবং 'জ্ঞানযোগ' সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন। মে মাসের শেষের দিকে তিনি পিকাডিলিতে রয়েল ইন্‌স্টিট্যুট অব পেইন্টার্স ইন্ ওঅটার-কলার্স-এর একটি গ্যালারিতে প্রতি রবিবারে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এখানে তিনি 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা', 'বিশ্ব ধর্ম' ও 'বাস্তব ও আপাতঃ মনুষ্য' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। জুন মাসের শেষভাগ থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে বক্তৃতা দেন। এখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ' ও 'সিদ্ধি'। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে তিনি পাঁচটি ক'রে নিয়মিত ক্লাস

ও প্রতি শুক্রবারে প্রশ্নোত্তরের ক্লাস নিতে থাকেন। তা ছাড়াও ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বৈঠকখানায় ও বহু বিখ্যাত ক্লাবে বক্তৃতা দেন। তিনি মিসেস এনী বেসাণ্ট, মিসেস মার্টিন, মিসেস হাণ্ট, ক্যানন উইল্‌বারফোর্স প্রভৃতির গৃহেও বক্তৃতা দেন। ইংলণ্ড-বাসী ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ভীড় করতে থাকেন। ১৮ই জুলাই তারিখে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড-বাসী হিন্দুদের লণ্ডন হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি সভায় মিলিত হন। তাঁরা স্বামীজীকেই ঐ সভার সভাপতি করেন। এই সভায় বহু ইংরেজ নরনারীও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী 'হিন্দুগণ ও তাদের প্রয়োজন' সম্পর্কে ভাষণ দেন। মিঃ স্টার্ডি এই সময় 'নারদ-সূত্রের' ইংরেজী অনুবাদ করছিলেন। স্বামীজী তাঁকে সাহায্য করেন।

২৮শে মে তারিখে স্বামীজী বিখ্যাত প্রাচ্যবিশারদ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌ ম্যুলারের নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর গৃহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌ ম্যুলারের চরিত্র ও পাণ্ডিত্য স্বামীজীকে মুগ্ধ করে। কয়েকদিন বাদে, ৬ই জুন, স্বামীজী 'ব্রহ্মবাদিন্‌' কাগজে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। ইতিপূর্বে ম্যাক্‌স্‌ ম্যুলার 'নাইনটিন্থ্‌ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় 'প্রকৃত মহাত্মা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তা প'ড়ে স্বামীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ম্যাক্‌স্‌ মুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন স্থির করেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যুলার বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং তখন থেকে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে যা কিছু সংবাদ ও তথ্যাদি পেয়েছেন, তা সাগ্রহে পাঠ করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনার ইচ্ছা তাঁর আছে, তিনি উপযুক্ত উপাদান পেলে তা লিখতে পারেন। স্বামীজী এ বিষয়ে অধ্যাপক ম্যুলারকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। তিনি অবিলম্বে সারদানন্দকে রামকৃষ্ণ

সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ভারত থেকে সংগ্রহ ক'রে অধ্যাপক ম্যুলারকে দিতে বললেন। অল্পদিনের মধ্যেই ম্যাক্স্ ম্যুলার রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' প্রকাশিত হয় এবং তা পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর প্রচারকার্যে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ ম্যুলারকে কথা প্রসঙ্গে বলেন, "অধ্যাপক, আজ হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণের পূজা করছে?" অধ্যাপক উত্তরে বললেন, "রামকৃষ্ণের পূজা যদি না করবে, তবে কার পূজা করবে?" অধ্যাপক ম্যুলার স্বামীজীকে ও মিঃ স্টার্ডিকে দিবাভোজে আপ্যায়িত করেন। তারপর তিনি তাঁকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বিখ্যাত বডলেয়ান লাইব্রেরী দেখান। এই বৃদ্ধ নিজে স্বামীজীকে রেলস্টেশনে পৌঁছে দিতে আসেন। স্বামীজী আপত্তি জানালে তিনি বলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সাক্ষাৎ তো প্রতিদিন পাওয়া যায় না!" কেবল রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি নয়, ভারত ও তার সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি এই মনীষীর শ্রদ্ধা ও গভীর প্রীতি দেখে স্বামীজী বিস্মিত হলেন। স্বামীজী তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বললেন, "তাহ'লে আমি হয়তো আর দেশে ফিরতে পারব না; আপনাদেরই আমার সৎকার করতে হবে।" স্বামীজী ও অধ্যাপক ম্যুলারের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উভয়ের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ না হ'লেও তাঁদের মধ্যে নিয়মিত পত্রবিনিময় চলতো।

এবার মিস্ ম্যুলার, মিঃ স্টার্ডি ও মিস্ নোবলের সঙ্গে স্বামীজীর সৌহার্দ আরও নিবিড় হয়েছিল। তাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এবার মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গেও স্বামীজীর পরিচয় হ'লো। তাঁরা শীঘ্রই স্বামীজীকে গুরুরূপে বরণ করলেন। স্বামীজী মিসেস সেভিয়ারকে 'মা' ব'লে সম্বোধন করতেন। স্বামীজী ইংলণ্ডে কাজের মাধ্যমে যাঁদের পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিস্ নোবল, মিঃ গুডুইন, মিঃ সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ারকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

লণ্ডনে অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই সেভিয়ার দম্পতি ও মিস্ ম্যুলার তাঁকে ইউরোপ ভ্রমণে নিয়ে যেতে চাইলেন। স্বামীজী সহজেই সম্মত হলেন। সুইজারল্যাণ্ডের তুষারাবৃত পার্বত্যভূমি তাঁকে হিমালয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জুলাই মাসের শেষভাগে তাঁরা ডোভার অতিক্রম ক'রে ক্যালে বন্দরে পৌঁছলেন। ক্যালে থেকে গেলেন প্যারিসে। প্যারিসে একদিন থেকেই তাঁরা সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনেভা যাত্রা করলেন। জেনেভার একটি হ্রদের তীরে সুন্দর হোটেলে তাঁরা কয়েকদিন রইলেন। তারপর তাঁরা প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে শামুনিক্সে গেলেন। সেখানে তুষারাবৃত মঁ ব্লাঁ পর্বত দেখে স্বামীজী আনন্দে অধীর হলেন। তিনি পর্বতারোহণ করতে চাইলেন। কিন্তু তা সুনিপুণ পর্বতারোহীর পক্ষে ছাড়া বিপজ্জনক জেনে নিরস্ত হলেন। তবে একটিও হিমবাহ পার না হ'লে তাঁর ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যাবে, মনে করলেন স্বামীজী। কয়েকদিন বাদে তাঁরা সকলে মের-দ্য-গ্লাস হিমবাহ পার হয়ে একটি গ্রামে এলেন। এই হিমবাহ পার হওয়ার সময়ই স্বামীজীর সর্বপ্রথম মাথা ঘোরে। এতে ভয়ংকর বিপদ ঘটতে পারতো। কিন্তু নিরাপদেই তাঁরা পর্বতশীর্ষে একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। এই গ্রামটি দেখে স্বামীজীর হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত গ্রামগুলির কথা মনে পড়লো। তিনি তাঁর সঙ্গীদের কাছে এই রকম একটি মনোরম স্থানে একটি মঠ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেন। তাঁর এই ইচ্ছা স্মরণ ক'রেই মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার পরে আলমোড়ায় অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

আরও কয়েকটি গ্রাম দেখে তাঁরা আল্‌প্‌সের কোলে একটি পার্বত্য গ্রামে এসে দু সপ্তাহ থাকেন। এখানে দু সপ্তাহ বিশ্রামের ফলে স্বামীজীর দেহমন পুনরায় সতেজ ও সজীব হয়ে ওঠে। এই সময়ে জার্মানির কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ, প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পল ডয়সন স্বামীজীকে আমন্ত্রণ

জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি স্বামীজীর লণ্ডনের ঠিকানা থেকে ঘুরে এখানে এসেছিল। স্বামীজী জার্মানি সম্পর্কেও অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন। তাই স্বামীজী সঙ্গীদের নিয়ে কিয়েল যাত্রা করলেন। মিস্ ম্যুলার অবশ্য প্রয়োজনে সঙ্গে যেতে পারলেন না।

পথে সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানির বিভিন্ন স্থান দেখে তাঁরা কিয়েলের পথে অগ্রসর হলেন। হাইডেলবার্গ, কব্‌লেন্‌ৎস্, কোলন, বার্লিন প্রভৃতি স্থানগুলি স্বামীজীকে মুগ্ধ করলো। স্বামীজী কিয়েলে একটি হোটেলে পৌঁছেছেন শুনে অধ্যাপক ডয়সন স্বামীজীকে ও তাঁর সঙ্গী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারকে পবদিন প্রাতর্ভোজনেব জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। অধ্যাপক ডয়সন ও স্বামীজী পরস্পরের সঙ্গে আলাপে অতিশয় মুগ্ধ হলেন। এক সময় অধ্যাপক দেখলেন যে, স্বামীজী একটি কাব্যগ্রন্থ পড়ছেন। অধ্যাপক স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কোন সাড়া পেলেন না। পরে স্বামীজী যখন জানলেন যে, অধ্যাপক তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলছিলেন, তখন তিনি মার্জনা চাইলেন এবং বললেন যে, বইখানিতে মগ্ন থাকায় তিনি শুনতে পাননি। স্বামীজীর এই কৈফিয়তে অধ্যাপক সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁদের মধ্যে আবার আলাপ-আলোচনা শুরু হ'লো। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী কাব্যগ্রন্থটির বহুঅংশ অনর্গল উদ্‌ধৃত ক'রে সেগুলির ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। অধ্যাপক ডয়সন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। খেতবিব মহারাজাও একদিন এইবকম হয়েছিলেন। স্বামীজী অধ্যাপক ডয়সনকে বললেন যে, ভারতীয় যোগীদের মনঃসংযোগের ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, এই অবস্থায় তাঁরা বহিঃপ্রকৃতি থেকে এমন বিচ্ছিন্ন থাকেন যে, তাঁদের দেহে ঐ সময় একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার রাখলেও তা তাঁরা বুঝতে পারবেন না।

স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা আরও দু-একদিন কিয়েলে থাকেন। অধ্যাপক ডয়সন তাঁদের শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে

স্বামীজীকে নিয়ে যান। তিনি আশা করেছিলেন, স্বামীজী কিছুদিন কিয়েলে থাকবেন এবং তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রালোচনার দুর্লভ সুযোগ পাবেন। কিন্তু স্বামীজী লণ্ডনে তাঁর কাজ শেষ ক'রে ভারতে ফিরবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাই অধ্যাপক ডয়সনই স্বামীজীর সঙ্গে লণ্ডন যাত্রা করলেন। তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছে জন্‌স্ উডে তাঁর বন্ধুর গৃহে রইলেন এবং স্বামীজী গেলেন মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে তাঁদের হ্যাম্প্‌স্টেডের বাড়িতে

স্বামীজী সারদানন্দকে নানা বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে আমেরিকা পাঠালেন। কয়েকদিন হ্যাম্প্‌স্টেডে সেভিয়ার-দম্পতির গৃহে কাটাবার পর স্বামীজী আবার বৈঠক ও বক্তৃতা দান শুরু করলেন। স্বামীজীর আগ্রহী শ্রোতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মিঃ স্টার্ডি ৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি সুপরিসর কক্ষ ভাড়া নিলেন। ভারত থেকে স্বামী অভেদানন্দও এসে পৌঁছলেন। সেভিয়ার-দম্পতি স্বামীজী ও স্বামী অভেদানন্দের জন্যে ১৪ গ্রে কোর্ট গার্ডেন্‌সে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। স্বামীজী ইংলণ্ডে তাঁর অনুপস্থিতিতেও উপযুক্তভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে তুললেন। কারণ, এই বৎসরের শেষের দিকে তিনি ভারতে ফিরতে মনঃস্থ করছিলেন।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামীজী ঘরোয়া বৈঠকে ও প্রকাশ্য সভায় বহু বক্তৃতা দিলেন। এই সময়ে তিনি বেদান্তের অন্যতম দুরূহ বিষয় মায়া সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডের আরও বহু দার্শনিক, লেখক প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

২৭শে অক্টোবর তারিখে ব্রুথ্‌স্‌বেরি স্কোয়ারে একটি ক্লাবে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামীজী নিজে না গিয়ে স্বামী অভেদানন্দকে পাঠান। অভেদানন্দের এই প্রথম বক্তৃতা দান হ'লেও অভেদানন্দ আশাতীত ভাবে সফল হন। ইংলণ্ডে কাজ সম্পর্কে স্বামীজী কতকটা নিশ্চিন্ত

হ'তে পারেন। আমেরিকায় সারদানন্দজীর সাফল্যও তাঁকে নিরুদ্‌বেগ ক'রে তোলে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বামীজীর মন ক্রমেই ভারতের দিকে আকৃষ্ট হ'তে থাকে। তিনি তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের কথা সেভিয়ার-দম্পতিকে বলেন। তিনি মিসেস্ ওলি বুলকেও এ সম্পর্কে জানান। মিসেস বুল তাঁকে ভারতে তাঁর কাজের জন্যে একটি কার্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থ দিতে চান। কিন্তু স্বামীজী তা নিতে অস্বীকার করেন, বলেন, পরে প্রয়োজন হ'লে জানাবেন।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ স্বামীজী মিসেস সেভিয়ারকে অবিলম্বে নাপল্‌স্ থেকে ভারতযাত্রী কোন জাহাজে চারখানি টিকিট কিনতে বলেন। তিনি নাপল্‌স্ পর্যন্ত স্থলভাগেই যাবেন, কারণ, তিনি সমুদ্রযাত্রা কিছুটা কমাতে চান। সেভিয়ার-দম্পতিও ভারতে যাবেন এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে ভারতে কাটাবেন, এই তাঁদের সংকল্প ছিল। তাই তাঁরা দ্রুত প্রস্তুত হন। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে নাপল্‌স্ থেকে সিংহলগামী একটি জাহাজে তাঁরা স্বামীজীর নির্দেশ মতো টিকিট কেনেন। স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজের শিষ্যগণকে পত্র লিখে তাঁর আসন্ন প্রত্যাবর্তনের এবং মাদ্রাজে ও কলকাতায় দুটি প্রচাবকেন্দ্র খুলবার ইচ্ছার কথা জানান। সেই সঙ্গে জানান যে, সেভিয়ার-দম্পতি হিমালয়ে একটি প্রচারকেন্দ্র খুলবেন। এখন ভারত সম্পর্কে নানা পরিকল্পনায় তাঁর মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তিনি মিস্ ম্যুলার ও মিস্ নোবলকে ভারতীয় নারীর সেবায় আত্মদানের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। তাঁরা উভয়েই সানন্দে তাতে রাজী হন। সোভিয়ার দম্পতি তাঁদের গহনা, আসবাবপত্র, ছবি, বই, সমস্ত কিছু বিক্রি ক'রে দিয়ে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ স্বামীজীর হাতে তুলে দেন। মিঃ গুডুইন ব্রহ্মচারী রূপে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। মিস্ ম্যুলার ও তাঁর সঙ্গিনী মিস্ বেলও পরে ভারতে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে

মিলিত হবেন, স্থির হ'লো। স্বামীজী দেখলেন, তাঁর জীবনের সর্বাধিক প্রিয় স্বপ্ন—স্বদেশকে পুনরুজ্জীবিত করা—বাস্তবে রূপায়িত হ'তে চলেছে।

ইংলণ্ডে স্বামীজীর শিষ্যরা তাঁদের প্রিয়তম গুরুদেবকে বিদায় দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। মিঃ স্টার্ডি সসমারোহে একটি বিদায়-সংবর্ধনা সভার আয়োজন করলেন। ১৩ই ডিসেম্বর পিকাডিলিতে রয়েল সোসাইটি অব পেইণ্টার্স ইন ওঅটর কলার্সে এই মহতী সভার আয়োজন হ'লো। স্বামীজীর বন্ধু, ভক্ত ও অনুরাগীরা দলে দলে এসে সমবেত হলেন। সভাপতিরূপে মিঃ স্টার্ডি তাঁদের প্রিয়তম গুরুদেবকে বিদায়-অভিনন্দন জানালেন। স্বামীজী অভিভূত হয়ে পড়লেন, তিনি বেদনাক্লিষ্ট চিত্তে বললেন, yes, yes, we shall meet again ; we shall.

১৬ ডিসেম্বর স্বামীজী ও সেভিয়ার-দম্পতি স্থলপথে ইউরোপের মধ্য দিয়ে নাপল্‌স্ যাত্রা করলেন। মিঃ গুডুইন গেলেন জলপথে সাদাম্প্‌টন থেকে। তিনি নাপল্‌সে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবেন। লণ্ডন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী যেন হঠাৎ ভারমুক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সেভিয়ার-দম্পতিকে বললেন, "এখন আমার একমাত্র চিন্তা—ভারত। আমি ভারতের পানে চেয়ে আছি।" চার বছর পরে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ফিরে চললেন ভারতের উদ্দেশে।

ডোভার, ক্যালে ও মণ্ট চেনি হয়ে ট্রেন যোগে তাঁরা ইতালির মিলানে পৌঁছলেন। এখানে স্বামীজী অমর শিল্পী লিওনার্দো ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্র নৈশভোজ দেখেন। মিলান থেকে তাঁরা যান পিশায়। পিশা থেকে ফ্লোরেন্সে। ফ্লোরেন্সে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মার্কিন সুহৃদ্ মিঃ ও মিসেস হেইলের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ফ্লোরেন্স থেকে স্বামীজী রোমে যান। এখানে তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন। রোম তার প্রাচীন কীর্তির স্মৃতি বুকে নিয়ে স্বামীজীকে আকর্ষণ করে। স্বামীজী রোমের সকল দ্রষ্টব্য স্থান ও প্রাচীন

ধ্বংসাবশেষগুলি ঘুরে দেখেন। রোম থেকে তাঁরা নাপল্‌সে পৌঁছেন। জাহাজ ছাড়তে দেরি থাকায় স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা বিস্যুভিয়াস আগ্নেয়গিরি, পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখেন।

৩০শে ডিসেম্বর (১৮৯৬) নাপল্‌স্ থেকে জাহাজ ছাড়লো। জাহাজে স্বামীজী ও সেভিয়ার-দম্পতি মিঃ গুড়ুইনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

১১

ভারতের পথে

পুরো পক্ষকাল কাটলো সমুদ্রে। সমুদ্র যাত্রাকালে স্বামীজী বিশ্রাম লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। নাপল্‌স্‌ থেকে পোর্ট সৈয়দের মাঝামাঝি জায়গায় ভূমধ্যসাগরের বক্ষে তিনি একটি আশ্বর্য স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, পক্ক-গুম্ফশ্মশ্রুধারী ঋষিতুল্য এক বৃদ্ধ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, 'এই স্থানটি লক্ষ্য কর। তুমি এখন ক্রীট দ্বীপের নিকটে এসেছ। এই ক্রীট দ্বীপেই খ্রীষ্টধর্মের সূত্রপাত হয়।' বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, 'যে সব থেরাপিউটি (Therapeutae) এখানে বাস করতেন, আমি তাঁদেরই একজন।' বৃদ্ধ যেন আরও কি একটা কথা বললেন, জাগ্রতাবস্থায় স্বামীজীর তা ঠিক মনে পড়লো না। 'থেরাপিউটি' শব্দের অর্থ নিশ্চয় থেরা বা স্থবিরের পুত্রগণ বা শিষ্যগণ —অর্থাৎ বৌদ্ধ। স্বপ্নে বৃদ্ধ আরও বলেছিলেন, 'যে সত্য ও আদর্শের কথা আমরা প্রচার করেছিলাম, খ্রীষ্টানরা তাকেই যিশুখ্রীষ্টের বাণী ও শিক্ষা ব'লে প্রচার করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিশুখ্রীষ্ট ব'লে কোন ব্যক্তি কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। এই ব্যাপারটি প্রমাণ করবার উপযোগী বহু তথ্যই এই স্থানটি খনন করলে পাওয়া যাবে।' স্বামীজী জেগে উঠলেন এবং ধাবমান জাহাজটি এখন কোথায়, তা জানবার জন্যে ডেকে ছুটে গেলেন। জাহাজের অফিসার তখন সময় কত জেনে বললেন, জাহাজ এখন ক্রীট দ্বীপ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলছে। স্বামীজী চমকে উঠলেন। যিশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে স্বামীজীর মনে কোনদিন কণামাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু

এই ঘটনাটির পর তিনি ভাবতে লাগলেন। যাই হ'ক, খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তির পশ্চাতে যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল, এমন একটি ধারণা তাঁব হ'লো। স্বামীজী তাঁর এই স্বপ্নের কথা তাঁর এক ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুকে লিখে জানান এবং এই স্বপ্নের মধ্যে কোনও সত্য আছে কিনা সন্ধান কবতে অনুরোধ করেন। স্বামীজীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান্' পত্রিকায় এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, 'ইংরেজরা ক্রীট দ্বীপে খননকার্য চালিয়েছিলেন এবং তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে অনেক প্রমাণপত্র পেয়েছেন।' যিশুর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সংশয় জাগুক বা না জাগুক, মৃত্যুকাল পর্যন্ত মেরীমাতার পুত্রের প্রতি স্বামীজীর সেই গভীর শ্রদ্ধাভক্তি এতোটুকুও হ্রাস পায়নি।

জাহাজে স্বামীজীব একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনারী তাঁকে প্রায়ই হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে তুলনামূলক বিতর্কে আহ্বান করতো। তারা পদে পদে যুক্তিতে স্বামীজীর কাছে পরাজিত হ'তো এবং ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে নানা নিন্দাবাদ করতো। একবার স্বামীজীর পক্ষে এটা অসহ্য হয়ে উঠলো, তিনি মিশনারীটির কলাব চেপে ধরে বললেন, 'ফের যদি তুমি এবকম করো, তবে তোমাকে আমি সমুদ্রে ফেলে দেবো।' মিশনারীটি অসম্ভব বকম ভয় পেয়ে গেল। সেই থেকে তার চালচলন একেবারে বদলে গেল এবং সে স্বামীজীর প্রতি সেই থেকে গদগদ হয়ে উঠলো। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে পরে স্বামীজী একবার কলকাতায় তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, 'কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে, তবে তুমি কি করবে?' শিষ্যটি বললেন, 'আমি তাকে ঠেঙিয়ে উচিত শিক্ষা দেব।' স্বামীজী বললেন, 'তোমার দেশের প্রকৃত জননী তোমার ধর্মকে তুমি যদি মায়ের মতো ভালোবাসো, আর কেউ যদি সেই ধর্মকে অপমান ক'রে হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে, তবে তুমি কি করবে? অথচ রাত্রিদিন তোমাদের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটছে, আর

তোমরা নির্বিকার আছ। কোথায় তোমাদের ধর্মবিশ্বাস? কোথায় তোমাদের ধর্মাত্মবোধ?'

এই সমুদ্রযাত্রাকালে একটি মজার ঘটনাও ঘটেছিল। এডেনে জাহাজ বাঁধলে স্বামীজী ঐ স্থানটি ভালোভাবে দেখবার জন্যে তিন মাইল অভ্যন্তরে চলে যান। সেখানে হঠাৎ তিনি দেখতে পান, একটি লোকে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। স্বামীজী তাঁর ইংরেজ সঙ্গীদের ফেলে রেখে দ্রুত লোকটির কাছে এগিয়ে যান। লোকটি ছিল ভারতীয়, এখানে পানের ব্যবসা করে। স্বামীজী লোকটিকে 'ভাই' সম্বোধন ক'রে তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললেন, তারপর বললেন, 'ভাই, তোমার হুঁকোটা একবার দেবে?' লোকটি হুঁকো বাড়িয়ে দিলে স্বামীজী তা নিয়ে আনন্দে তামাক খেতে লাগলেন। তিনি কতো বছর হুঁকোয় তামাক খাননি! তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা স্বামীজীর এই বালকসুলভ কাণ্ড দেখে হেসে আকুল হলেন। লোকটি স্বামীজীর পরিচয় পেয়ে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো।

১৫ই জানুয়ারি তারিখে জাহাজটি সিংহলের উপকূলে এসে পৌছল এবং নারিকেল-বৃক্ষরাজিশোভিত কলম্বো পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করল। তখন সিংহল বৃটিশ ভারতের অঙ্গ ছিল। স্বামীজী কলম্বোর বালুধূসর সৈকতে ভারতে পদার্পণ করলেন। সিংহল, এই তাঁর রামায়ণের লঙ্কা! সিংহলের মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রে স্বামীজীর হৃদয় আনন্দে নেচে উঠলো। কিন্তু তিনি তখনও জানতেন না যে, তাঁর সমুদ্রযাত্রার বিশ্রামের দিনগুলি শেষ হয়েছে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সিংহলের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দ এসে পৌঁছেছেন তাঁকে দেখবার জন্যে। অন্যান্য শিষ্যরাও মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে আসছেন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার একটি আবহাওয়া চারদিকে। স্বামীজী বুঝলেন, আর বিশ্রাম নয়। আবার কর্ম। এবার কর্মস্থান ভারতবর্ষ।

১২

বিজয়-উৎসব

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন আধুনিক কালের ভারতীয় ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সমগ্র ভারতবর্ষ তার দিগ্‌বিজয়ী পুত্রকে অভিনন্দন জানাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। স্বামীজী ভারতের উদ্দেশে ইউরোপ ত্যাগ করেছেন, এই সংবাদ পৌঁছামাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভারতের মহানগরীগুলিতে অভ্যর্থনা কমিটি গ'ড়ে উঠেছিল। স্বামী শিবানন্দ মাদ্রাজে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলেন। বাংলা ও উত্তর ভারতে অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বামীজীর শিষ্যরা দলে দলে মাদ্রাজে উপস্থিত হচ্ছিলেন। সংবাদপত্রগুলি স্বামীজীর বর্ণনায় বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। সাড়া পড়ে গিয়েছিল দিক থেকে দিগন্তরে।

স্বামীজী কলম্বোয় যে বাংলোতে ছিলেন (পরে এর নাম হয় বিবেকানন্দ লজ), সেখানে দর্শনার্থীরা দলে দলে ভীড় ক'রে এলেন। এঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলেই ছিলেন। পরদিন ১৬ই জানুয়ারি, সন্ধ্যায় ফ্লোরাল হলে অগণিত শ্রোতা ও দর্শনার্থীর উদ্দেশে স্বামীজী ভাষণ দিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'পুণ্যভূমি ভারত'। পরদিন তিনি সারাদিন অসংখ্য দর্শনার্থীর সঙ্গে আলাপ করলেন। সন্ধ্যায় গেলেন মহাদেবের মন্দিরে। অসংখ্য নরনারী শিশু চললো তাঁর সঙ্গে, পথের ধারে বহু স্থানে জনতা তাঁকে মাল্যদান করলো, ফল উপহার দিলো। দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে দীপ জ্বালিয়ে রাখা ও ফল সাজিয়ে রাখা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। যে পথে স্বামীজীর শোভাযাত্রা গিয়েছিল, সেই পথের দুধারে গৃহের দ্বারে দ্বারে মঙ্গলদীপ জ্বালানো

হ'লো, ফলসম্ভার সাজিয়ে রাখা হ'লো। মন্দিরে তাঁকে জনতা 'জয় মহাদেব!' ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানালো। মন্দিরে স্বামীজী উপাসনা সেরে এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ শেষ ক'রে বাংলোয় ফিরলেন। বাংলোয় এসে দেখলেন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। রাত দুটো পর্যন্ত স্বামীজী এঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি মিঃ চেলিয়ার মাঙ্গলিক সজ্জায় সুসজ্জিত গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এখানে হাজার হাজার লোক তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁরা স্বামীজীকে জয়ধ্বনি, পুষ্পবর্ষণ ও মাল্যদান ক'রে সংবর্ধনা জানালো। স্বামীজী এখানে ভগবান রামকৃষ্ণের একটি প্রতিকৃতি দেখে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। মিঃ চেলিয়ার গৃহে বহু মহাপুরুষের চিত্র দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। সন্ধ্যায় তিনি কলম্বোর পাবলিক হলে জনসভায় বেদান্ত-দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদের মর্মকথা প্রাঞ্জল-ভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং বেদের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ তুলে ধরলেন। সভায় অনেক ভারতীয় ইউরোপীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত ছিলেন। সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে তিনি এই দাসসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন ক'রে দিলেন।

১৯শে জানুয়ারি সকালে তিনি ট্রেনযোগে কলম্বো থেকে কাণ্ডি গেলেন। কাণ্ডিতেও তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হ'লো। কাণ্ডি থেকে মেটালো, সেখান থেকে একটি সুসজ্জিত গাড়িতে ক'রে তাঁকে অনুরাধাপুরম্ নিয়ে যাওয়া হ'লো। পথে গাড়িটির একটি চাকা ভেঙে যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে। স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের বারো মাইল পথ হেঁটে যেতে হয়। পরে তাঁরা গোযানে ক'রে প্রায় আট ঘণ্টা বিলম্বে অনুরাধাপুরে উপস্থিত হন। এখানে তিনি পবিত্র বোধিবৃক্ষতলে বারো সহস্র শ্রোতা ও দর্শনার্থীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করেন। কিন্তু এই সময় স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা

ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ও হৈহল্লা ক'রে সভা পণ্ড ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম হয়। স্বামীজী সমবেত হিন্দু জনতাকে শান্ত ও সংযত হতে বলেন এবং তিনি পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ সকলের পূজাই ঈশ্বরের পূজা, এই কথা ব'লে সংক্ষেপে ভাষণ শেষ করেন। অতঃপর তাবা অনুরাধাপুরম্ ত্যাগ করে ১২০ মাইল দূরে জাফ্না অভিমুখে রওনা হন। সুরম্য অরণ্যপথ অতিক্রম ক'রে তাঁরা জাফ্না দ্বীপে পৌছেন। সন্ধ্যায় মশাল-মিছিল ক'রে স্বামীজীকে হিন্দু কলেজের সুশোভিত সভামঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা পথে দশ-পনেরো হাজার লোক তাঁর সঙ্গে যায়। জাফ্নায় হিন্দু কলেজে ভাষণদানের পর স্বামীজীর সিংহল-সফর শেষ হয়।

অতঃপর স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা পঞ্চাশ মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে পামবান রোডে উপনীত হন। এখানে রামনাডের রাজা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। স্বামীজী জাহাজ থেকে রাজার নিজস্ব জলযানে ওঠেন। স্বামীজী জলযানটিতে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করেন। রাজার সঙ্গে স্বামীজীর মিলনদৃশ্যটি মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে, কারণ রাজারই উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় স্বামীজী পাশ্চাত্য জগতে অভিযান করেছিলেন। স্বামীজী স্থলভূমিতে পদার্পণ করলে পামবানের অধিবাসীরা তাঁকে বিপুল অভিনন্দন জানায়। এখানে সংবর্ধনাসভায় স্বামীজী বলেন, রাজনীতি নয়, সামরিক শক্তি নয়, ধর্মই, কেবল ধর্মই, ভারতের মেরুদণ্ড। তিনি পামবানের অধিবাসীগণ ও রামনাডের রাজাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করেন। সভাশেষে স্বামীকে রাজকীয় শকটে ক'রে রাজার বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গ ও কর্মচারীগণ এই রাজকীয় যানটি সারা পথ টেনে নিয়ে যান। স্বামীজী তিনদিন পামবানে

ছিলেন। পামবানে পৌঁছবার পরদিন তিনি রামেশ্বরমের বিখ্যাত মন্দিরে যান। পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি সন্ন্যাসীরূপে ক্ষতবিক্ষত চরণে ও ক্লান্তদেহে পদব্রজে এই মন্দিরে এসেছিলেন। আজ তিনি রাজকীয় শকটে :মন্দিরে চলেছেন, পথের দুদিকে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভীড়। তিনি মন্দিরের সমীপবর্তী হ'লে মন্দিরের ধ্বজা ও আসাসোটা ও বাদ্যসহ হাতী, উট, ঘোড়া ও মানুষের একটি বিরাট শোভাযাত্রা তাঁর প্রত্যুদ্গমন করলো। মন্দির-প্রাঙ্গণে স্বামীজী তীর্থমাহাত্ম্য ও উপাসনা সম্পর্কে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। তিনি হিন্দুদের কেবল মন্দিরে মূর্তির মধ্যে নয়, দুঃস্থ, দুর্বল ও রুগ্ণের মধ্যেও শিবকে প্রত্যক্ষ করতে বললেন। পরদিন রামনাডের রাজা এই বিশেষ উপলক্ষ্যে এক হাজার দরিদ্র নরনারীকে অন্নবস্ত্র দিলেন। তিনি স্বামীজীর দিগ্‌বিজয়ের স্মারকরূপে চল্লিশ ফুট উঁচু একটি সুরম্য বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করলেন। পামবান থেকে তাঁরা পৌঁছলেন রামনাডে। কামান-গর্জনে স্বামীজীর আগমন উদ্‌ঘোষিত হ'লো। আতসবাজির আলোকে ও বর্ণচ্ছটায় আকাশ ছেয়ে গেল। স্বামীজী রাজকীয় শকটে অর্ধপথ যাওয়ার পর তাঁকে রাজকীয় শিবিকায় আরোহণ করানো হ'লো। মহাসমারোহে স্বামীজী শঙ্কর-ভিলায় পৌঁছলেন। সেখানে সামান্য বিশ্রামের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো সভাগৃহে। সেখানে হাজার হাজার দর্শনার্থী ও শ্রোতা বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে অভিনন্দন জানালো। রাজা ভাস্কর সেতুপতি স্বামীজীর অশেষ গুণাবলী কীর্তন ক'রে সভার উদ্বোধন করলেন। রাজভ্রাতা রাজা দনীকর সেতুপতি অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন। তারপর স্বামীজীকে তাঁরা কারুকার্যখচিত একটি নিটোল স্বর্ণপেটিকা উপহার দিলেন। স্বামীজী ধর্ম, জাতীয় জীবনের আদর্শ ও মাতৃভূমির প্রতি নরনারীর কর্তব্য সম্পর্কে সমবেত জনতাকে সজাগ ক'রে দিলেন। রামনাডের রাজা সভাশেষে ঘোষণা করলেন যে, স্বামীজীর শুভাগমনকে স্মরণীয় করবার জন্যে রামনাডের জনসাধারণ

মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ সাহায্য তহবিলে মুক্তকণ্ঠে যেন দান করেন। স্বামীজী রামনাডে খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলেও বক্তৃতা দেন। তাঁর সম্মানে রামনাডের রাজা একটি বিশেষ দরবারের আয়োজন করেন। স্বামীজী রামনাডের রাজাকে 'রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তারপর স্বামীজী সঙ্গীদের নিয়ে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি পরমাকুডি, মনমাদুরা, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে যাত্রাভঙ্গ করলেন। ঐ সকল স্থানে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হ'ল। মাদুরায় তিনি মীনাক্ষীর মন্দির দর্শন করলেন। মাদুরা থেকে তাঁরা গেলেন কুম্ভকোণামে। কুম্ভকোণামের পথে প্রতি স্টেশনে জনতা তাঁকে জয়ধ্বনি ক'রে অভিনন্দন জানাল। ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোরে হাজার হাজার দর্শনার্থী ভীড় করল। কুম্ভকোণামেও স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্যে বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল। মাদ্রাজের পথে সকল শহরেই স্বামীজীকে অভিনন্দন জানানো হ'ল। নায়াভরমে সমগ্র রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম জনতায় ভরে গেল। মাদ্রাজেব অদূরে সেই ছোট স্টেশনে কয়েক শত লোক স্বামীজীর দর্শনাভিলাষে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজী যে ট্রেনে আসছিলেন, সেটি থ্রু ট্রেন হওয়ায় তাঁরা স্টেশনমাস্টারকে ট্রেনটি স্টেশনে থামাতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্টেশনমাস্টাব তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। ট্রেনটি স্টেশনের অনতিদূরে পৌছলে তাঁবা সকলেই রেললাইনের উপর শুয়ে পড়েন। ট্রেনটি থামতে বাধ্য হয়। স্বামীজীর জনধ্বনিতে সারা স্টেশন মুখরিত হয়ে ওঠে। স্বামীজী অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি কিছুক্ষণের জন্যে দর্শনার্থীদের সম্মুখে আসেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ করেন। অবশেষে স্বামীজী মাদ্রাজে এসে পৌছেন।

স্বামীজীর প্রতীক্ষায় মাদ্রাজ শহর উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন হয়েছিল। শহরের সমস্ত রাজপথগুলি ছিল সুসজ্জিত। নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য বিজয়-তোরণ। বড় বড উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত নানা প্রকার ধ্বনি শোভা

পাচ্ছিল চারদিকে। কয়েকদিন যাবৎ অভ্যর্থনা ও ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলির কর্মব্যস্ততার সীমা ছিল না। সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর বন্দনা-গানে। স্বামীজী পৌঁছার দিন সকাল থেকেই দলে দলে নরনারী পতাকা, ফুল, মালা প্রভৃতি নিয়ে রেল-স্টেশনে গিয়ে জড় হ'লো।/ অবশেষে স্বামীজীকে নিয়ে ট্রেনটি যখন মাদ্রাজ স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করলো, তখন প্রচণ্ড হর্ষধ্বনিতে ও জয়ধ্বনিতে মাদ্রাজের আকাশ-বাতাস কম্পিত হ'লো—মাদ্রাজের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এমনটি আর ঘটেনি। স্বামীজীকে প্রাথমিক সংবর্ধনা জানাবার পর তাঁকে এক বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো। তাঁর গাড়ির ঘোড়াগুলি খুলে দিয়ে মাদ্রাজের নাগরিকগণ তাকে টেনে নিয়ে চললেন। পথের দুই ধারে কাতারে কাতারে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে জয়ধ্বনি সহকারে নমস্কার জানালো। সারাক্ষণ পথে পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগলো। অনেকে স্বামীজীকে ফল ও নারিকেল উপহার দিলো। তাঁকে দেখবার জন্যে পথের দুই দিকে গৃহগুলির জানালা, বারান্দা ও ছাদ মানুষে পূর্ণ হয়ে গেল। শোভা-যাত্রাটি স্বামীজীকে নিয়ে একটি ঘুরপথে মিঃ বিল্লিগিরি আয়েঙ্গারের প্রাসাদোপম বিশাল বাসভবন 'ক্যাসল কার্নানে' গিয়ে পৌঁছলো। স্বামীজী গাড়িতে কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে নতশিরে দর্শনার্থীদের অভিনন্দন ও নমস্কার গ্রহণ করলেন। ক্যাসল কার্নানে মহিলারা তাঁকে ধূপধূনো দিয়ে ও আরতি ক'রে অভ্যর্থনা জানালেন। হাইকোর্টের উকিল শ্রীকৃষ্ণমাচারিয়া সংস্কৃত ভাষায় মাদ্রাজ বিদ্বান মনোরঞ্জিনী সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানালেন। পরে কানাড়ী ভাষাতেও অভিন্দন জানানো হ'লো। অনুষ্ঠান শেষে বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার স্বামীজীকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার জন্য চ'লে সকলকে যেতে বললেন। বিশাল জনতা অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্তিপূর্ণভাবে দূরে সরে গেল।

অবস্থানের কয়দিনই দিবারাত্রি ক্যাসল কার্নানের আশেপাশে

অসংখ্য মানুষ ভীড় ক'রে রইলো। মাদ্রাজের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর নরনারীই স্বামীজীকে দেখতে এলো। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা ক্যাসল কার্নানে এলেন, যেন তাঁরা মন্দিরে দেবমূর্তি দেখতে আসছেন এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে। তাঁরা স্বামীজীর পদতলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানালেন। সকলেই স্বামীজীকে সম্বন্ধ-স্বামী বা শিবের অবতার ব'লেই বিশ্বাস করেছিলেন। স্বামীজী মাদ্রাজে নয় দিন ছিলেন। তাঁকে ইংরেজী, সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগুতে ২৪টি অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর পৌছবার তৃতীয় দিনে অপরাহ্নে তাঁকে মাদ্রাজ নগরীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। ভিক্টোরিয়া হলে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অগণিত নরনারীর ভীড়ে ভিক্টোরিয়া হলের সমগ্র প্রাঙ্গণ এবং সংলগ্ন সকল রাজপথ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জনতা থেকে হলের বাইরে সভা করবার জন্যে দাবী আসতে লাগলো। ইতিমধ্যে ভিক্টোরিয়া হলের অভ্যন্তরে স্থান ছিল না এবং সেখানে সভা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বাইরের অগণিত মানুষের দাবী স্বামীজীর কানে গেল। তিনি এই অগণিত নরনারীকে হতাশ করতে পারলেন না। তিনি সভাকক্ষ থেকে বাইরে এসে জনতার বিপুল হর্ষধ্বনি ও জয়ধ্বনির মধ্যে একটি শকটে চ'ড়ে জনতার উদ্দেশে তাঁর ভাষণ দিলেন। তিনি পরে ভিক্টোরিয়া হলে আরও দুটি ও অন্যত্র দুটি জনসভায় বক্তৃতা দেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামীজী বেদনাবিধুর মাদ্রাজ ত্যাগ ক'রে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কয়েকদিন অবিরাম ব্যস্ততায় স্বামীজী ক্লান্ত বোধ করছিলেন, তাই তিনি ট্রেনে না গিয়ে সমুদ্রপথেই রওনা হলেন। জাহাজে কয়েকদিন বিশ্রাম পেয়ে পুনরায় তিনি প্রফুল্ল ও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলেন।

স্বামীজীকে কলকাতায় বিপুল সংবর্ধনা জানাবার জন্যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সভাপতিত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত

হয়েছিল। স্বামীজী মাদ্রাজ ত্যাগ করবার সময় থেকেই কয়েকদিন স্বামীজীর সংবর্ধনার আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হয়। জাহাজ যতোই বাংলাদেশের উপকূলভাগের নিকটবর্তী হ'তে লাগলো, স্বামীজী ততোই জন্মভূমিতে পদার্পণ করবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন। জাহাজ হুগলী নদীর মধ্যে প্রবেশ করলে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে সেগুলির পরিচয় দিতে লাগলেন। বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি তাঁর এই স্থানগুলি কতোই না পরিচিত!

অবশেষে কলকাতা বন্দরে জাহাজ এসে পৌছলো। শিয়ালদা স্টেশন থেকে একটি বিশেষ ট্রেন এসেছিল তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সকাল প্রায় সাড়ে সাতটার সময়ে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা ট্রেনে চড়লেন। হাজার হাজার লোক ট্রেনটির আগমনের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিল। ট্রেনের হুইশিল কানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত মানুষের হর্ষধ্বনিতে সারা অঞ্চল প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। ট্রেনটি থামলে স্বামীজী যুক্তকরে জনতার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। যারা কাছে ছিল, তারা তাঁর পদধূলি নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। যারা দূরে ছিল তারা 'জয় বিবেকানন্দ!' 'জয় রামকৃষ্ণ!' ধ্বনি দিতে লাগলো। মানুষের উত্তাল তরঙ্গ ঠেলে অভ্যর্থনা কমিটির লোকের স্বামীজীর কাছে অতিকষ্টে পৌছলেন এবং তাঁকে অপেক্ষমান একটি ল্যাণ্ডোতে তুললেন। মাল্যে ও পুষ্পস্তবকে গাড়িটি পূর্ণ হয়ে গেল। স্বামাজী ও সেভিয়ার-দম্পতি গাড়িতে বসতে না বসতেই ছাত্ররা গাড়ির ঘোড়াগুলি খুলে দিল এবং নিজেরাই গাড়ি টানতে লাগলো। বাদ্যভাণ্ডসহ এক বিরাট মিছিল স্বামীজীকে নিয়ে রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের দিকে অগ্রসর হ'লো। পেছনে অদূরে চললো সংকীর্তনের দল। তোরণে তোরণে এবং পত্রপুষ্প-সজ্জায় সারক্যুলার রোড ও হ্যারিসন রোড সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সারক্যুলার রোডের একটি তোরণে লেখা

ছিল 'সুস্বাগত বিবেকানন্দ!' হ্যারিসন রোডে একটি তোরণে লেখা ছিল 'জয় রামকৃষ্ণ!' রিপন কলেজের কাছে একটি তোরণে লেখা ছিল—'সুস্বাগত!' সমস্ত কলেজটি অগণিত মানুষে ভরে গিয়েছিল। ছাদে, বারান্দায়, জানালায়, লোকের ভীড়ে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মিছিলটি যখন রিপন কলেজের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চললো, তখন মানুষের চাপে মানুষ পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হ'লো।

রিপন কলেজে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানানো হ'লো এবং স্বামীজী তার উত্তরে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। অভ্যর্থনা কমিটি এক সপ্তাহ পরে জনসভায় অভিনন্দন জানাবার আয়োজন করেছেন ব'লে ঘোষণা করা হ'লো। অতঃপর স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের রায় পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদোপম ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'লো। বিকাল চারটেয় স্বামীজী ও ইউরোপীয় শিষ্যদের কাশীপুরে ভাগীরথীতীরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হ'লো। এখানেই স্বামীজীর ও তাঁর বন্ধুদের সাময়িকভাবে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

দিনের পর দিন হাজার হাজার দর্শনার্থী কাশীপুর বাগান-বাড়িতে গিয়ে জড় হ'লো। স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের অভিনন্দন ও আমন্ত্রণ জানিয়ে রোজ শত শত পত্র ও তারবার্তা আসতে লাগলো। স্বামীজী সারাদিন কাশীপুব বাগানবাড়িতে থাকতেন এবং রাত্রিতে চ'লে যেতেন আলমবাজার মঠে। স্বামীজীর বিন্দুমাত্র বিশ্রাম ছিল না। অগণিত দর্শনার্থীকে দর্শন দেওয়া ও তাদের সঙ্গে আলাপ করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে স্বামীজীকে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বৃটিশ ভারতের তৎকালীন রাজধানীর সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। সভায় কমপক্ষে পাঁচ-ছয় হাজার লোক

উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক রাজা-মহারাজা, অনেক সন্ন্যাসী, অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয়ান, কলকাতার বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং শত শত কলেজের ছাত্র। সভায় রাজা বিজয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতিত্ব করলেন। তিনি স্বামীজীকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে বর্ণনা করলেন। স্বামীজীকে একটি রৌপ্য পেটিকায় ক'রে অভিনন্দনপত্রটি দেওয়া হ'লো। স্বামীজী এই অভিনন্দনের উত্তরে যে বক্তৃতা দিলেন, তা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতারূপে গণ্য হয়েছে। এই বক্তৃতায় তিনি দেশ-প্রেমকে এক অভিনবরূপে প্রকাশ করলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতাররূপেও ঘোষণা করলেন।

স্বামীজীর আগমনের কয়েকদিন পরেই, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ছিল রামকৃষ্ণের জন্মতিথি। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ভক্তরা প্রতি বৎসরই সমারোহের সঙ্গে এই উৎসব পালন করতেন। এবার স্বামীজী উপস্থিত থাকায় হাজার হাজার দর্শক এই উৎসবে যোগ দিলেন। স্বামীজী নগ্নপদে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শত শত দর্শক 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় বিবেকানন্দ' ধ্বনি দিতে লাগলেন। স্বামীজী মন্দিরে প্রবেশ ক'রে মাতৃমূর্তির সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি শ্রীরাধাকান্তজীর মন্দিরে গেলেন এবং সেখান থেকে তাঁর জীবনের পবিত্রতম তীর্থস্থান শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করলেন। সর্বত্রই শত শত ভক্ত তাঁর পশ্চাতে ধাবিত হ'তে লাগলো। চারদিকে সংকীর্তন ও জয়ধ্বনির মধ্যে স্বামীজী পঞ্চবটীতে এলেন এবং সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে রচিত একটি স্তোত্র পাঠ করলেন। পঞ্চবটীতে রামকৃষ্ণের বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁদের মধ্যে নাট্যকার ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারপর স্বামীজী রামকৃষ্ণের অপর সাধনাপীঠ বিল্ববৃক্ষতলে গেলেন। অতঃপর তিনি ভক্তদের সঙ্গে আলাপ ক'রে কাটালেন। বিকালের দিকে আলমবাজার মঠে গেলেন।

নাগরিক অভিনন্দনের কয়েকদিন বাদে পুনরায় তিনি কলকাতার স্টার থিয়েটারে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, বেদ ও উপনিষদ্‌ই ভারতের সকল ধর্মের ভিত্তি। এই ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হ'লেই হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হ'তে পারবে। এই বক্তৃতাটিও স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলির অন্যতম।

১৩

কর্মক্ষেত্র বাংলা—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা

স্বামীজী কলকাতায় অবস্থানকালে বেশির ভাগ সময় কাশীপুরের বাগানবাড়ি ও আলমবাজার মঠে থাকলেও তিনি একে একে রামকৃষ্ণের সকল ভক্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। গুরুভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হ'লে তিনি দীর্ঘ নিঃসঙ্গ পর্যটন ও প্রবাসের পর পরম আনন্দ লাভ করতেন। কেবল তাই নয়, তিনি যে মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাকে ব্যাপকভাবে কার্যে রূপায়িত করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের মিলন ও সহযোগিতা।

কাশীপুরে শীলেদের বাগানবাড়িতে অসংখ্য অতিথি আসতেন। আসতেন অনেক জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী, সংশয়ী পণ্ডিত, ভক্ত দর্শনার্থী। স্বামীজী তাঁদের সকলের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা করতেন, চিরদিনই এই আলাপ-আলোচনা ছিল তাঁর বীজ বপনের একটি প্রধান উপায়।

স্বামীজী একদিন এক তরুণের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তরুণটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটি থেকে এসেছিল। সে বললো, 'আমি অনেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু সত্য কী বুঝতে পারিনি।' স্বামীজী তাকে সস্নেহে বললেন, 'আমারও একদিন ঐ অবস্থা ছিল। বলো দেখি, তুমি কার কাছে কি উপদেশ পেয়েছ এবং সেগুলি কিভাবে পালন করেছ।' তরুণটি বললে, 'থিওজফিক্যাল সোসাইটি আমাকে পূজো ও জপ করতে বলেছিল। আমি তা করেছিলাম। কিন্তু মনে কোন শান্তি পাইনি। তারপর আমাকে একজন ধ্যান করতে বলেছিলেন। আমি তা করতে চেষ্টা

করেছিলাম, কিন্তু মনকে কোনরকমে শান্ত ও সংযত করতে পারিনি। আমি ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে চোখ বুজে যতোক্ষণ পারলাম বসে রইলাম, কিন্তু মনে শান্তি পেলাম না।' স্বামীজী বললেন, 'বৎস, যদি তুমি আমার কথা শুনতে চাও, তবে আগে তোমার ঘরের দরজা-জানলা খুলে দাও, আর চোখ বুজে না থেকে দু চোখ মেলে চারদিকে তাকাও। দেখবে শত শত দরিদ্র, অসহায়, রুগ্ণ মানুষ আছে তোমার বাড়িব আশেপাশে। তুমি যথাসাধ্য তাদের সেবা করো।...আমার উপদেশ হ'লো যদি মনে শান্তি চাও, তবে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করো।' তরুণটি বললে, 'কিন্তু ধরুন, কোন বোগীকে সেবা করতে গিয়ে অনিদ্রা ও অনিয়মিত আহাব বা অন্যান্য অনিয়মের ফলে যদি শরীর ভেঙে যায়—।' স্বামীজী তীব্রকণ্ঠে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'তোমার কথা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের মতো লোকেবা যাবা নিজেদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে, তারা কোনদিনও বোগীব সেবা করতে পাববে না।'

একদিন এক অধ্যাপক তাঁকে বললেন, 'আপনি যে সেবা, দাক্ষিণ্য ও জগৎ-হিতেব কথা বলছেন, তা, যতো হ'লেও, 'মায়া'-র অন্তর্গত। আব বেদান্ত অনুসারে, মানুষের লক্ষ্য হ'লো মায়াব বন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্তিলাভ করা। তা'হলে যা মনকে পার্থিব বস্তুতে নিয়োগ করে, তেমন কথা ব'লে লাভ কি?' স্বামীজী মুহূর্তকালও ইতস্ততঃ না ক'রে বললেন, 'মুক্তিও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা মুক্ত, এই শিক্ষাই কি বেদান্ত দেয় না? তবে আত্মার মুক্তিব জন্যে চেষ্টা করার অর্থ কি?'

একবার এক গো-রক্ষা সমিতির প্রতিনিধি স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। স্বামীজীর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়, তা স্বামীজীর আদর্শ, মানবিকতা ও দেশাত্মবোধকে স্পষ্ট ক'রে চিত্রিত করে।

স্বামীজী ঃ আপনাদের সংঘের লক্ষ্য কি?

প্রতিনিধি ঃ আমরা গোমাতাদের কিনে নিয়ে তাদের কশাইদের

হাত থেকে রক্ষা করি। আমরা অনেক আশ্রম করেছি, যেখানে বৃদ্ধ, অসুস্থ ও অক্ষম গোরুকে আশ্রয় দিয়ে তাদের সেবাযত্ন করা হয়।

স্বামীজী: উদ্দেশ্য মহৎ। আপনাদের টাকা আসে কোথা থেকে?

প্রতিনিধি: আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের সাহায্যেই এই কাজ হয়। ব্যবসায়ীরাই আমাদের প্রধান সমর্থক ও সংঘের পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা প্রচুর অর্থ দিয়ে এই সংঘকে সাহায্য করেন।

স্বামীজী: মধ্য ভারতে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে বিবরণ দিয়েছে, তাতে জানা গেছে সেখানে অনাহারে ন লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনাদের সংঘ কি এইসব অনাহারী মানুষদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন?

প্রতিনিধি: আমরা দুর্ভিক্ষ বা ঐ ধরনের কিছুতে সাহায্য দিই না। আমাদের লক্ষ্য হ'লো, কেবল গোমাতাদের রক্ষা করা।

স্বামীজী: যখন লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী ও স্বধর্মী ভয়ানক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মৃত্যু বরণ করছে, তখন এইসব দুর্ভাগ্য প্রাণীকে এক মুঠো অন্ন দিয়ে সাহায্য করা কি আপনারা কর্তব্য মনে করেন না?

প্রতিনিধি: না। দুর্ভিক্ষ হয়েছে তাদের কর্মের, পাপের ফলে। যেমন কর্ম তেমন ফলের একটা দৃষ্টান্ত।

স্বামীজী: মশায়, যে সংঘ মানুষের জন্য দরদ বোধ করে না, যে সংঘ চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাদ্যাভাবে মরতে দেখেও তাদের একমুষ্টি অন্ন দিতে অগ্রসর হয় না, যে সংঘ পশুপক্ষীর রক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে, সে রকম সংঘের প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি নেই। এই ধরনের কোনও সংঘের দ্বারা কণামাত্র জনহিত হ'তে পারে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। 'মানুষ কর্মফলে মরছে, সুতরাং তাদের মরতে দাও!' এই ধরনের নিষ্ঠুর কথা বলতেও

আপনাদের লজ্জাবোধ হ'লো না ? যদি কর্মের তত্ত্বের এই রকম ব্যাখ্যা আপনারা করেন, তবে অপরের মঙ্গল সাধনের জন্যে চেষ্টা ক'রে লাভ কি ? আপনাদের কাজ সম্পর্কেও এই নীতি প্রযোজ্য হ'তে পারে—গোরুগুলি কশাইদের হাতে প'ড়ে খুন হচ্ছে, কারণ এই জন্মে বা পূর্বজন্মে তারা এই রকম কর্মই করেছে ; সুতরাং তাদের জন্যে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রতিনিধি : অবশ্য, আপনি যা বলছেন, তা সত্যি। তবে কিনা শাস্ত্রে বলেছে—'গোরু আমাদের মা।'

স্বামীজী : (মৃদু হাস্যে) গোরু যে আমাদেব মা, তা আমি বেশ বুঝেছি। গোরু ছাড়া আর অন্য কে এমন বুদ্ধিমান্ সন্তানদের জন্ম দেবে ?

স্বামীজী আমেবিকায় ও ইংলণ্ডে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। সুতবাং তিনি বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণেব উল্লেখ করেন নি, এইরকম একটা ধারণাব বশবর্তী হয়ে একদল বৈষ্ণব স্বামীজীর সঙ্গে তকরার করতে এসেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীব কথা শুনে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। স্বামীজী বললেন, "বাবাজী, একবাব আমেরিকায় শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। এই বক্তৃতা একটি ধনী সুন্দরী তরুণীব উপব এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তিনি সর্বস্ব ত্যাগ ক'বে একটি নির্জন দ্বীপে চলে গিয়েছিলেন এবং দিনের পর দিন কৃষ্ণধ্যানে অতিবাহিত করেছিলেন।"

একদিন এক জিজ্ঞাসু দর্শনার্থীকে তিনি বললেন, "আমি যখন সাধনা-স্তরে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন নির্জন গুহায় আমি ধ্যান ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, অনেক সময় মুক্তি লাভ না করলে অনশনে দেহত্যাগ করব, এমন সংকল্পও করেছি। কিন্তু এখন আমি মুক্তির কথা ভাবি না। যতোক্ষণ এই বিশ্বে একটি মানুষও মুক্তিলাভ না ক'রে থাকবে, ততোক্ষণ আমি মুক্তি চাই না।"

স্বামীজী বলতেন, "মুক্তি নয়, শক্তি, শক্তি! শক্তিই একমাত্র কথা যা উপনিষদের প্রতিটি লাইন আমার কাছে ঘোষণা করেছে।"

ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনার প্রশ্নে একাধিকবার তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গেও মতানৈক্য ঘটেছিল। মঠে তাঁর গুরুভাইরা ধ্যান তপস্যা ইত্যাদির দ্বারা মুক্তিলাভের সাধনাকেই সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ বলে মেনে এসেছিলেন। স্বামীজী সন্ন্যাসধর্মের যে অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন, তা তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথ রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথ থেকে স্বতন্ত্র ব'লেও মনে করলেন অনেকে। কিন্তু স্বামীজী ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবসেবার আদর্শকে, সকল মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাবার আদর্শকে তুলে ধরলেন। তবুও তাঁর গুরুভাইরা যখন নিঃসংশয় হ'তে পারলেন না, তখন তিনি বললেন, যাঁরা নিজেদের একজন অবতারের প্রিয় শিষ্য ব'লে মনে করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত মুক্তির চেষ্টা নিরর্থক। কারণ, তাঁদের মুক্তি তো আগেই সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। স্বামীজীর গুরুভাইরা তাঁর এই যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারলেন না। কেবল তাই নয়, স্বামীজীর প্রতি তাঁদের অখণ্ড বিশ্বাস ও ভালোবাসা তাঁদের স্বামীজীর মতাদর্শকে নিঃসংশয়ে মেনে নিতে বাধ্য করলো। স্বামীজী তাঁর এই মতাদর্শের কথা আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে প্রতিটি পত্রে তাঁর শিষ্য ও সতীর্থদের ব'লে এসেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ আগেই তাঁর ডাকে প্রতীচ্যে স্বামীজীর কাজে সাহায্যের জন্যে গিয়েছিলেন। যে রামকৃষ্ণানন্দ বারো বৎসরের মধ্যে একদিনও মঠের বাইরে যাননি, ঠাকুরের পূজা-উপাসনায় ব্যস্ত ছিলেন, তিনিও স্বামীজীর ডাকে মাদ্রাজে দক্ষিণ ভারতে বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র খুলবার জন্যে বেরিয়ে গেছেন। অখণ্ডানন্দ গেছেন মুর্শিদাবাদ; সেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে বাঁচাবার জন্যে। অখণ্ডানন্দ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই খেতরিতে এই ধরনের সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, জনসাধারণের শিক্ষার জন্যে তিনি বিদ্যালয় খুলতেও চেয়েছিলেন।

অন্যান্য গুরুভাইরাও সকলেই স্বামীজীর আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুসারে দেশে-বিদেশে কাজ করবার জন্যে এগিয়ে এলেন। এই আদর্শ ও পরিকল্পনার ফলেই ধীরে-ধীরে দেশের সর্বত্র মঠ ও সেবাশ্রম গড়ে উঠেছিল, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় আর্তত্রাণের জন্যে অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

কলকাতায় আসবার পর নানারকম পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। ডাক্তাররা তাঁকে কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন, কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কিছুদিন দার্জিলিঙে বেড়াতে গেলেন। মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আগেই দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মিঃ গুডুইন, ডাঃ টার্নবুল, মিঃ আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচারিয়ার, সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার প্রভৃতি অনেকে পরে স্বামীজীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। দার্জিলিঙে তাঁরা মিঃ ও মিসেস এম. এন. ব্যানার্জীর অতিথি রূপে রইলেন। বর্ধমানের মহারাজা তাঁর 'রোজ ব্যাঙ্ক' নামে পরিচিত বাসভবনের একাংশও স্বামীজীর ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিলেন। স্বামীজী এখানে কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম নেন। তাঁকে দেখবার জন্য খেতরির রাজা সুদূর রাজপুতানা থেকে কলকাতা এলে স্বামীজী কলকাতা আসেন। তাছাড়া আর একবার কলকাতায় কিছু কাজকর্মের ব্যাপারে দু-সপ্তাহের জন্যে তিনি এসেছিলেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভালো যাচ্ছিল না। ডাক্তাররা তাঁকে গভীর চিন্তা, এমনকি পড়াশুনো থেকেও বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর পক্ষে তা ছিল অসম্ভব। প্রায় দু মাস দার্জিলিঙে থেকেও স্বামীজীর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হ'লো না।

স্বামীজী যখন বিদেশে ছিলেন, তখন চারজন যুবক আলমবাজার মঠে যোগ দিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মচারীরূপে ছিলেন। তাঁরা স্বামীজীর

কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা নেওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। স্বামীজী তাঁদের যোগ্যতা বিচার ক'রে সানন্দে সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁদের একজন প্রথম জীবনে দুশ্চরিত্র ছিলেন এই কারণ দেখিয়ে অন্যান্য গুরুভাইরা আপত্তি তুললেন। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বললেন, "সে কি! আমরা যদি পাপীদের কাছ থেকে সরে যাই, তবে কে তাদের রক্ষা করবে? তাছাড়া, সে যখন সৎ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মঠে আশ্রয় নিয়েছে, তখন তার অভিপ্রায় যে মহৎ, তা বোঝা যাচ্ছে। আমাদের তাকে সাহায্য করতেই হবে। আর, কেউ যদি মন্দ হয়, অসচ্চরিত্র হয়, আর তোমরা যদি তার চরিত্র পরিবর্তন করতে না পারো, তবে গেরুয়া পরেছ কেন?—গুরুর ভূমিকাই বা নিয়েছ কেন?" স্বামীজী তাঁদের সাড়ম্বরে দীক্ষা দিলেন। তাঁরা বিরজানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নিত্যানন্দ নামে পরিচিত হলেন।

স্বামীজী কলকাতায় এলে প্রায়ই বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে থাকতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের জন্য এই গৃহের দ্বার অবারিত ছিল। এখানে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যরা স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে এসে মিলিত হলেন। স্বামীজী কিছুদিন যাবৎ ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের সহযোগিতায় আধ্যাত্মিক ও মানবিক কাজকর্ম সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করবার জন্যে একটি সংস্থা স্থাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনার কথা তিনি সমবেত সকলকে জানালেন। উপস্থিত সকলেই স্বামীজীর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এইভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা হ'লো। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও কর্মসূচী বিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহীত হ'লে পদাধিকারীদেরও নির্বাচন করা হ'লো। স্বামীজী নিজে হলেন এই সংস্থার জেনারেল প্রেসিডেন্ট এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ হলেন যথাক্রমে কলকাতা কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট। স্থির হ'ল, প্রতি রবিবার

বলরামবাবুর বাড়িতে মিলনের অধিবেশন বসবে, গীতা-উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মালোচনা হবে। প্রথম তিন বৎসর বলরামবাবুর বাড়িতেই অধিবেশন বসেছিল।

এই মিশন ও তার কর্মপন্থা পাশ্চাত্য প্রভাবিত, এবং তা রামকৃষ্ণের আদর্শানুযায়ী নয় ব'লে কেউ কেউ মনে করলেন। একদিন সন্ধ্যে-বেলা স্বামীজী বলরামবাবুর বাড়িতে তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে লঘু আলাপে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় তাঁর একজন গুরুভাই (স্বামী যোগানন্দ) এই প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন, "স্বামীজী ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত প্রচার করছেন না, স্বামীজীব কর্মপন্থার সঙ্গে রামকৃষ্ণের বাণীর সামঞ্জস্য নেই।" তিনি বলতে লাগলেন, ঠাকুর ভগবৎ-লাভের জন্যে ভক্তির উপর জোর দিতেন, আর স্বামীজী ক্রমাগত কাজ করতে, প্রচাব করতে, দরিদ্র ও বোগীর সেবা করতে বলছেন। এইসব কাজে মন বাইরের দিকে যায়, তাতে সাধনার প্রবল অন্তরায় দেখা দেয়। তারপর স্বামীজীর সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা, তাঁর সংঘ সংগঠন সম্পর্কে ধারণা, তাঁর দেশপ্রেম, এইসব আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি প্রভৃতি রামকৃষ্ণের ত্যাগাদর্শের বিরোধী। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইয়ের এইসব মন্তব্য লঘুভাবে নিয়েই রসিকতা ক'রে বললেন, "তুমি কি জান! তুমি একটি মূর্খ। যেমন গুরু, তেমন চেলা। 'ক' অক্ষর দেখে কৃষ্ণনাম মনে পড়লো, আর প্রহ্লাদের বিদ্যা ফুরিয়ে গেল। তোমরা হ'লে ভক্তের দল, কতকগুলি ভাবপ্রবণ নির্বোধ। তোমরা ধর্মের কি বোঝ? তোমরা সব শিশু। তোমরা হাত জোড় ক'রে উপাসনা করতেই পারো: 'প্রভু হে! তোমার নাকটি কি সুন্দর! তোমার চোখ দুটি কি মিষ্টি!' এই ধরনের যতো অর্থহীন সব কথা। আর তোমরা ভাবো, তোমাদের মুক্তি ঠেকায় কে, শেষ সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসে তোমাদের হাত ধ'রে বৈকুণ্ঠে তুলে নেবেন। পড়াশুনো, প্রচার, মানবহিতকর কাজ, এসব তোমাদের মতে মায়া, রামকৃষ্ণ নাকি এগুলি নিজে করতেন না। কারণ, ঠাকুর

একজনকে বলেছিলেন, 'আগে ভগবানের সন্ধান করো, তাঁকে পাও। জগতের হিত করতে যাওয়া স্পর্ধার কথা।' ভগবানকে পাওয়া যেন এতো সহজ কাজ! ভগবান যেন একদল নির্বোধের হাতের পুতুল হওয়ার জন্যেই বসে আছেন।"

স্বামীজী বলতে বলতে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলতে লাগলেন, "তোমরা ভাবো, তোমরা আমার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশি বোঝ! তোমরা ভাবো, জ্ঞান হ'লো শুষ্ক পাণ্ডিত্য মাত্র, তা আমাদের হৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলিকে নাশ ক'রে মরুময় পথে লাভ করা যায়। তোমাদের ভক্তি আহম্মকের ভাবুকতা মাত্র, তা মানুষকে নির্বীর্য ক'রে তোলে। তোমরা রামকৃষ্ণকে যেমনটি বুঝেছ, তেমনটি প্রচার করতে চাও। তোমরা তো রামকৃষ্ণের কিছুই বোঝ না। সরে যাও! কে তোমার রামকৃষ্ণের তোয়াক্কা করে? কে তোয়াক্কা করে তোমার ভক্তির আর মুক্তির? কে তোয়াক্কা করে তোমার শাস্ত্রের? আমি যদি আমার তমসাচ্ছন্ন দেশবাসীকে জাগাতে পারি, তাদের নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করাতে পারি, তাদের কর্মযোগে অনুপ্রাণিত ক'রে প্রকৃত 'মানুষ' ক'রে তুলতে পারি, তবে আমি লাখো বার হাসতে হাসতে নরকে যেতেও রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ বা অপর কারো চেলা নই; যে নিজের মুক্তির কথা চিন্তা না ক'রে অপরের সেবায়, সাহায্যে আত্মদান করবে, আমি তারই ভৃত্য।"

আবেগে স্বামীজীর সারা দেহ কাঁপতে লাগলো, তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো। তিনি বৈঠকখানা থেকে ছুটে তাঁর শোবার ঘরে চ'লে গেলেন। গুরুভাইরা সকলে ভয় পেয়ে গেলেন, এইভাবে স্বামীজীর সমালোচনা করবার জন্যে তাঁরা অনুতাপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে তাঁদের কয়েকজন স্বামীজীর শয়নকক্ষে সতর্ক পদক্ষেপে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, স্বামীজী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন, তাঁর সারা

দেহ কঠিন হয়ে উঠেছে, দু চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে, সারা গায়ে রোমাঞ্চ হয়েছে। তিনি ভাব-সমাধিতে মগ্ন। ঘণ্টাখানেক পরে স্বামীজী উঠলেন, তারপর মুখচোখ ধুয়ে আবার বৈঠকখানায় ফিরে এলেন। ঘরের সেই শঙ্কিত স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, "যার হৃদয়ে ভক্তি আসে, তখন তার মন ও স্নায়ুগুলি এমন কোমল হয়ে যায় যে তা ফুলের ঘা-ও সইতে পারে না। তোমরা কি জানো, আমি আজকাল একটা উপন্যাসও পড়তে পারি না? আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বেশিক্ষণ ভাবতে বা বলতে পারি না। আমার ভেতরের ভক্তির প্রবল স্ফুরণকে আমি সর্বদা দমিয়ে রাখতে চাই। আমি নিজেকে ক্রমাগত জ্ঞানের লৌহশৃঙ্খল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করি। কারণ, স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্য এখনও শেষ হয়নি। বিশ্বের কাছে আমার বাণী প্রচার এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তাই আমি যখনই দেখি, ভক্তির বন্যা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে আসছে, তখনও আমি তাকে প্রচণ্ডরূপে আঘাত করি, কঠোর জ্ঞান আঁকড়ে ধ'রে নিজেকে অটল রাখি। আমার যে অনেক কাজ বাকী আছে। আমি রামকৃষ্ণের গোলাম, তিনি যে তাঁর কাজ আমাকে দিয়ে সম্পন্ন করবার জন্য রেখে গেছেন, সে কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি যে আমাকে বিশ্রাম করতে দেবেন না।"

'নরেন যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন সে মহাসমাধি লাভ করবে।' ঠাকুরের এই কথাগুলি গুরুভাইদের সকলের মনে পড়লো। তাঁরা এই প্রসঙ্গে ছেদ টানবার উদ্দেশ্যে তাঁকে ছাদে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এখন থেকে তাঁরা সকলেই স্বামীজী সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতেন।

১৪

উত্তর ভারতে

স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমে খারাপ হচ্ছে দেখে সকলেই ভয় পেলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড থেকে মিস্ ম্যুলার এসে পৌঁছেছিলেন। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী আলমোড়া যেতে রাজী হলেন। তিনি কয়েকজন গুরুভাই ও শিষ্য সঙ্গে নিয়ে ১১ই মে কলকাতা থেকে রওনা হলেন। স্বামীজীকে পথে লখ্নৌয়ে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হ'লো। লখ্নৌয়ে তিনি একরাত্রি কাটালেন। সেখান থেকে গেলেন কাঠগোদাম। কাঠগোদাম থেকে গেলেন আলমোড়ার নিকটবর্তী লোদিয়ায়। লোদিয়ায় তাঁর জন্যে অগণিত নরনারী অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে স্বামীজীকে সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। শোভাযাত্রাটি যখন বাজারে গিয়ে পৌঁছলো, তখন মনে হ'লো যেন ঐ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোভাযাত্রায় যোগ দিলো। বাড়ির ছাদ ও জানালা থেকে অবিরলধারে ধান্য ও পুষ্প বৃষ্টি হ'তে লাগলো। শহরের কেন্দ্রস্থলে তিন হাজার লোকের বসবার উপযোগী একটি প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছিল। এখানে স্বামীজীকে বিপুল জয়ধ্বনি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে অভিনন্দন জানানো হ'লো। পণ্ডিত জাওলা দত্ত যোশী প্রথমে সংবর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে হিন্দীতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। তারপর লালা বদরী সাহার পক্ষ থেকে পণ্ডিত হরিরাম পাণ্ডে দ্বিতীয় অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন। তারপর একজন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় স্বামীজীর গুণকীর্তন ক'রে একটি অভিনন্দন-পত্র পড়লেন। স্বামীজী অভিনন্দনের উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি হিন্দুর চিন্তাধারায় হিমালয়ের প্রভাব ও

হিমালয় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বললেন। তিনি বললেন, ত্যাগের সনাতন সত্যের প্রতীকরূপে হিমালয় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বামীজী আলমোড়া থেকে বিশ মাইল দূরে স্থানীয় ধনী লালা বদরী সাহার বাগানবাড়িতে রইলেন। এখানে হিমালয়ের কোলে তাঁর কর্মক্লান্তি কিছুটা দূর হ'লেও তিনি বিশ্রামের অবকাশ পেলেন না। কারণ দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে দর্শনার্থীদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় কাটাতে হ'তো। তা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেল।

স্বামীজীর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারীরা দীর্ঘকাল যাবৎ কুৎসা প্রচার করছিল। ভারতে স্বামীজীর অসামান্য জনপ্রিয়তা তাদের আরও ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো। এমনকি বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের সভাপতি ডঃ ব্যারোজও তাতে যোগ দিলেন। তিনি স্বামীজীর স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের প্রায় সমকালেই ভারতে এসেছিলেন। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে নিজে সাক্ষাৎ করবার সময় না পেলেও ভারতবাসী যাতে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখায়, সেজন্য তিনি ভারতবাসীদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর বাণী তখন ভারতবাসীকে এমন উদ্দীপিত ও সম্মোহিত করেছিল যে, তারা ডঃ ব্যারোজের বক্তৃতায় কর্ণপাত করেনি। ফলে ডঃ ব্যারোজ আমেরিকায় ফিরে স্বামীজীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করলেন। তিনি বলতে লাগলেন, স্বামীজী নিম্নবর্ণের হিন্দু, সুতরাং ভারতে তাঁর বিশেষ প্রভাব নেই। ভারতে তাঁর অভিনন্দনের যেসব বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা। স্বামীজী মার্কিন মুলুকে ও ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচারে যে অসামান্য সাফল্যের কথা ভারতবাসীর কাছে বলছেন, তাও অলীক ও মিথ্যা। তিনি ভারতের শহরে শহরে মার্কিন নারীদের সম্পর্কে অনেক কুৎসিত মন্তব্য করেছেন, ইত্যাদি। আমেরিকার সংবাদ-

পত্রগুলিতেও ডঃ ব্যারোজের সুরে সুর মিলিয়ে স্বামীজীর নিন্দা ও সমালোচনা শুরু হ'লো। এতে স্বদেশে ও বিদেশে স্বামীজীর ভক্ত ও বন্ধুরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের অনেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানালেন। প্রত্যহ স্বামীজীর কাছে রাশি রাশি সংবাদপত্রের কাটিং ও চিঠি আসতে লাগলো। স্বামীজী এতে যথেষ্ট ব্যথা পেলেও বিস্মিত বা ভীত হলেন না। তিনি সমস্ত দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, কুসংস্কার ও নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তার এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই যে স্বাভাবিক, তা স্বামীজী জানতেন। অন্যদিকে স্বামীজীকে উৎসাহিত করবার মতো যথেষ্ট সংবাদও আসতে লাগলো। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসূচী কার্যে রূপান্তরিত হচ্ছিল। মুর্শিদাবাদে শত শত দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর ত্রাণকার্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁর অনুচর ও সহচরদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে স্বামীজীর স্বীয় শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দকে পাঠালেন। নিজেও সেখানে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসক ও বন্ধুরা তাঁকে বিরত করলেন। বিদেশে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ যে তাঁর আরব্ধ কর্মকে দ্রুত সম্প্রসারিত ক'রে চলেছেন, এ সংবাদও তিনি পেলেন। স্বামীজী আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি স্থানীয় জেলা স্কুলে সুন্দর হিন্দীতে বেদান্ত সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় ইংরেজদের অনুরোধে তিনি ইংলিশ ক্লাবেও একটি বক্তৃতা দিলেন।

আড়াই মাস কাটাবার পর তিনি আলমোড়া ত্যাগ করলেন। বেরিলিতে পৌঁছলে তাঁর জ্বর হ'লো। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আর্যসমাজের অনাথাশ্রম দেখলেন এবং সেবাকার্যে উৎসাহিত করবার জন্যে এখানে একটি ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। বেরিলিতে তিনদিন থাকার পর ১২ই আগস্ট তিনি বেরিলি ত্যাগ

করলেন। বেরিলি থেকে আম্বালায়। আম্বালায় তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন। এখানে তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। প্রত্যহ মুসলমান, ব্রাহ্ম, হিন্দু, আর্যসমাজী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে ধর্মালোচনা করলেন। এখানে মিঃ সেভিয়ার তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। আম্বালা থেকে স্বামীজী গেলেন অমৃতসরে। অমৃতসরে কিছুদিন থেকে গেলেন রাওলপিণ্ডি, মুরি ও বরমুলা। সেখান থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি নৌকাযোগে শ্রীনগর গেলেন। সেখানে তিনি প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কাশ্মীরের অতুলনীয় নিসর্গশোভা ও জলবায়ুর গুণে তাঁর স্বাস্থ্যেব উন্নতি হলো। ১১ই অক্টোবর তিনি রাজভবনে গেলেন। রাজা রামসিংহ তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁকে উচ্চাসনে বসিয়ে নিজে নিম্নে আসন গ্রহণ করলেন। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে প্রায় দুঘণ্টা কাল ধর্ম ও ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর নজর দেন। স্বামীজীর ভক্তরা নৌ-বাসে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ভেবে একটি হাউস-বোট খুঁজছিলেন। মহারাজার উজীর সাহেব স্বামীজীর জন্যে একটি হাউস-বোটের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। স্বামীজী কাশ্মীরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহু স্থান ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি পুনরায় মুরিতে উপস্থিত হলেন। স্থানীয় বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী অধিবাসীরা তাঁকে অভিনন্দনপত্র দিলে তিনি তার উত্তরে একটি বক্তৃতা দিয়ে সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করলেন। ১৬ই অক্টোবর স্বামীজী পৌঁছলেন রাওলপিণ্ডিতে। রাওলপিণ্ডিতে তিনি উকিল হংসরাজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এখানে আর্যসমাজী স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে তিনি আলাপ করেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গেও তিনি ধর্মালোচনা করেন। ১৭ই তারিখে তিনি একটি জনসভায় ইংরেজীতে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ১৯শে তারিখেও কালীবাড়ীতে আর

একটি সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ২০শে অক্টোবর রাত্রিতে তিনি কাশ্মীরের মহারাজার দ্বারা আহূত হয়ে জম্মু অভিমুখে রওনা হন। স্টেশনে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি রূপে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সন্ধ্যায় তিনি মহারাজার গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন এবং পরদিন কাশ্মীর রাজ্যের অন্যতম পদস্থ কর্মচারী বাবু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাশ্মীরের কোথাও একটি মঠ স্থাপন করা যায় কিনা সে সম্পর্কে আলাপ করেন। ২৩শে তারিখে তিনি মহারাজার সঙ্গে সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা আলোচনা করেন। অর্থহীন রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারকে আঁকড়ে থাকার নির্বুদ্ধিতার, অনুষ্ঠানসর্বস্বতার এবং সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধ কুসংস্কার অনুসরণের ফলে শত শত বৎসর ধ'রে ভারতের দাসত্বের উপর তিনি জোর দেন। তিনি বলেন, "ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি প্রকৃত পাপকার্যের জন্য আজকাল মানুষকে সমাজচ্যুত হ'তে হয় না ; আজকাল সামাজিক যতো অপরাধ ঢুকেছে ঐ খাদ্যের মধ্যে।" তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা সমর্থন করেন এবং বলেন যে, বিদেশ ভ্রমণ ছাড়া প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। তিনি আমেরিকায় ও ইউরোপে তাঁর বেদান্ত প্রচার এবং স্বদেশে তাঁর কর্ম-পরিকল্পনার কথাও তিনি বলেন। তিনি বলেন, "দেশের হিতসাধন করতে গিয়ে যদি আমাকে নরকে যেতে হয় তাকেও আমি সৌভাগ্য মনে করব।" পরদিন তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা কাশ্মীরের মহারাজাকে এতই মুগ্ধ করে যে, তিনি স্বামীজীকে পরদিনও বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী এখানে আর্যসমাজীদের সঙ্গেও শাস্ত্রালোচনা করেন। ২৫শে তারিখে মহারাজার ইচ্ছানুসারে তিনি একটি বিরাট সভায় বেদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রসমূহ সম্পর্কে প্রায় দুঘণ্টাব্যাপী একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। স্বামীজী এই সময় অধিকাংশ আলাপ ও বক্তৃতা সুন্দর হিন্দীতে করতেন। তাই মহারাজা তাঁকে হিন্দীতে কিছু লিখতে বলেন। স্বামীজী হিন্দীতে কয়েকটি নিবন্ধ লেখেন, সেগুলি প্রচুর প্রশংসা লাভ করে।

এই সময় শিয়ালকোট থেকে আমন্ত্রণ আসায় তিনি শিয়ালকোট অভিমুখে রওনা হন। শিয়ালকোটে তিনি বিশিষ্ট আইনজীবী লালা মূলচাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এখানে তিনি একটি ইংরেজী ভাষায় ও একটি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি স্ত্রী-শিক্ষাব উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই দেখে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বলেন এবং লালা মূলচাঁদ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উৎসাহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

শিয়ালকোট থেকে স্বামীজী গেলেন লাহোরে। লাহোর স্টেশনে বিশাল জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো এবং সেখান থেকে তাঁকে রাজা ধ্যান সিংহেব প্রাসাদে আনা হ'লো। পরে তিনি ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক বাবু এন. এন. গুপ্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। লাহোবে তিনি প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে 'আমাদের সমস্যা' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এখানে প্রায় দুহাজার লোক স্থানাভাবে ফিরে যায়। কয়েকদিন বাদে তিনি প্রোফেসর বোসের বেঙ্গল সার্কাসের প্যাণ্ডেলেও বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দেন। কয়েকদিন বাদে কলেজ ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভাতেও তিনি বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি প্রায় দুঘণ্টা কাল বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন। লাহোবে একটি ছোট্ট ঘটনা স্বামীজীর নিরহংকার চরিত্রটিকে প্রকাশ কবে। কৈশোরে স্বামীজীর ব্যায়ামের আখড়ার বন্ধু ছিলেন বেঙ্গল সার্কাসের মালিক মতিলাল বসু। মতিলাল-বাবু স্বামীজীর সম্মান ও জনপ্রিয়তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লে তিনি সংকুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তোমাকে কি ব'লে ডাকব, নরেন, না স্বামীজী?" স্বামীজী বললেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ মতি? তুমি কি দেখছ না, আমি সেই নরেনই আছি, আর তুমি সেই মতিই আছ?"

লাহোরে সনাতনী হিন্দুদের সঙ্গে আর্যসমাজী হিন্দুদের প্রবল রেষারেষি ছিল। সনাতনী হিন্দুরা স্বামীজীকে আর্যসমাজীদের নিন্দা

করবার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন। স্বামীজী কিন্তু এই দুই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও হৃদ্যতা স্থাপনের পথই প্রশস্ত ক'রে দেন। তিনি কেবল বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যেই নয়, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

এই লাহোরেই স্বামীজীর সঙ্গে একটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর পরিচয় হয়। তীর্থরাম পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভারতে ও আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তীর্থরাম স্বামীজীর এমন অনুরাগী হয়েছিলেন যে, তিনি স্বামীজীকে একটি সোনার পকেটঘড়ি উপহার দেন। স্বামীজী সেটি আনন্দে নেন এবং তীর্থরামের পকেটে ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন, "আমি এটা এখানে এই পকেটেই পরব।"

স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল। তাই লাহোরে তিনি কর্ম-ব্যস্ত দশদিন কাটিয়ে দেরাদুনে গেলেন। দেরাদুনে দিনদশেক তিনি কিছুটা বিশ্রাম করেন। এই সময় তাঁর প্রিয় শিষ্য খেতরির রাজার বারবার সানুনয় আমন্ত্রণ আসতে থাকে। ফলে তিনি দেরাদুন থেকে খেতরি রওনা হন। যাওয়ার পথে তিনি দিল্লী, আলোয়ার ও জয়পুর হয়ে যান। আলোয়ারে তাঁর বিরাট সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। আলোয়ারে তাঁর পরিব্রাজক জীবনের অনেকগুলি স্মরণীয় দিন কেটেছিল। স্বামীজী এখানে এসে বহু পরিচিত মুখ দেখতে পেলেন। তাঁকে যখন রেলস্টেশনে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছিল, তখন হোমরা-চোমরা বহু লোককে অতিক্রম ক'রে তাঁর দৃষ্টি পড়লো একটি দরিদ্র সংকুচিত মানুষের ওপর। তিনি সানন্দে চীৎকার ক'রে উঠলেন,—"রামস্নেহী! রামস্নেহী!" রামস্নেহী তাঁর কাছে এলে তিনি চিরপরিচিত বন্ধুর মতো তার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। শোভাযাত্রাকালে তিনি সুসজ্জিত শকটে চ'ড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে তাঁর চোখে পড়লো এক সাধারণ সন্ন্যাসী। তিনি অমনি চীৎকার ক'রে উঠলেন,—"সদানন্দ!

সদানন্দ! এখানে এসো।" তিনি সদানন্দকে তুলে নিয়ে নিজের পাশে বসালেন। এখানে রাজপ্রাসাদে ও রাজভোগে তাঁর মন ভরতো না। গতবারে তিনি এক বৃদ্ধার বাড়িতে ভিক্ষা নিয়েছিলেন। এবার তিনি সেই বৃদ্ধাকে বললেন, "মা, তোমার হাতের চাপাটি অনেকদিন খাইনি। একদিন খাবো।" তারপর শিষ্যদের নিয়ে একদিন বৃদ্ধার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধা তাঁদের খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, "আমি গরীব মানুষ, তোমাদের খাওয়াবার মতো খাবার পাবো কোথা বাবা?" স্বামীজী বললেন, "এমন অমৃতের মতো খাবার আমি অনেকদিন খাইনি মা!" তিনি শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন, "দেখ, কি বিশুদ্ধ এই মাতৃমূর্তি; আর কি বিশুদ্ধ এই আহার!"

জয়পুর থেকে স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন খেতরির রাজা। খেতরিতে স্বামীজীর আগমন ও খেতরির রাজার ইংলণ্ড ও ইউরোপ সফর শেষে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সারা শহর আনন্দে উদ্দীপনায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। সর্বত্র ভোজ, আলোকসজ্জা ও আতসবাজির ব্যবস্থা হয়েছিল। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে স্বামীজী এখানে বিশাল জনসভায় প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি প্রাচীন গ্রীক ও আর্য-সভ্যতার কথা বলেন এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় ভারতের প্রভাব বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। তিনি বেদ, বৈদিক উপাসনা প্রভৃতি সম্পর্কেও বলেন। তাঁর শরীর দুর্বল থাকায় তাঁকে বক্তৃতার মাঝে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয়। কিন্তু শ্রোতারা নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকেন। কয়েকদিন আনন্দ ও কর্মের মধ্যে খেতরিতে কাটে। তারপর স্বামীজী খেতরি থেকে কিষেণগড়, আজমীড়, যোধপুর ও ইন্দোর হয়ে খাণ্ডোয়ায় পৌছেন। খাণ্ডোয়ায় তিনি জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং খাণ্ডোয়া থেকে কলকাতা রওনা হন।

১৫

আবার বাংলাদেশে

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি স্বামীজী কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় ফিরেও তিনি বিশ্রামের অবকাশ পেলেন না। এই সময়ে শিষ্য ও ভক্তদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, ধ্যান, সঙ্গীত, পড়াশুনো ও পত্রবিনিময় ছাড়াও তিনি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের তাঁর আদর্শানুযায়ী কাজের জন্যে বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত ক'রে তোলার কাজে মন দিলেন। তিনি তাঁদের হিন্দুশাস্ত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত পাঠ দিতে লাগলেন।

এই সময়ে তিনি রামকৃষ্ণপুরে বাবু নবগোপাল ঘোষ কর্তৃক নবনির্মিত ভবনে রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি পূর্ণিমায় গুরুভাই ও শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে পোঁছেন এবং সেখান থেকে সারা পথ সংকীর্তন ক'রে নবগোপালবাবুর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। স্বামীজী নগ্নপদে, সাধারণ গেরুয়াবস্ত্র পরিধান ক'রে গলায় খোল নিয়ে গান গাইতে গাইতে সঙ্গীদের নিয়ে যখন অগ্রসর হলেন, তখন সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্যে অগণিত মানুষ ছুটে এলো। নবগোপালবাবুর বাড়িতে তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করা হ'লো। গৃহকর্ত্রী যখন স্বামীজীকে বললেন যে, তাঁরা দরিদ্র মানুষ, ঠাকুরের উপযুক্ত মন্দির তাঁরা তৈরি করতে পারেননি, তখন স্বামীজী বললেন, "মা, ঠাকুর জীবনে কোনদিন এমন মার্বেল পাথরে বাঁধানো ঘরে বাস করেননি। তিনি কুঁড়েঘরে জন্মেছিলেন, অতি দরিদ্র মানুষের মতোই জীবন কাটিয়েছিলেন। আর এমন ভক্তদের মাঝে যদি

তিনি বাস না করেন, তবে তিনি আর কোথা বাস করবেন? স্বামীজী সারা গায়ে ভস্ম মেখে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সম্মুখে ব'সে তাঁর আবাধনা করতে লাগলেন। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার সময়ে স্বামীজী রামকৃষ্ণস্তোত্রটি রচনা করেন ঃ

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব ধর্ম স্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

'হে ধর্মের স্থাপক, সর্বধর্মস্বরূপা, অবতারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, রামকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার।'

এই ফেব্রুয়ারি মাসেই মঠ আলমবাজার থেকে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। একেই বেলুড় মঠের সূচনা বলা চলে। এই বৎসরের (১৮৯৮) গোড়ার দিকে স্বামীজী মিস্ হেনরিয়েটা ম্যুলার প্রদত্ত অর্থে গঙ্গাতীরে বেলুড়ে একটি একতলা বাড়িসহ বিশ বিঘা জমি কেনেন। অবশ্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত এখানে স্থায়ী মঠের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। নৌকা মেরামতের জন্যে গঙ্গাতীরের এই স্থানটি ব্যবহৃত হ'তো। ফলে অত্যন্ত নিচু ও অসমতল ছিল। বাড়িটির সংস্কার ক'রে সেটিকে দ্বিতল করবার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া প্রয়োজন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মন্দির-নির্মাণের। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরনির্মাণ বাদে অন্যান্য ব্যয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ স্বামীজীকে তাঁর লণ্ডনের শিষ্যরা দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁর অন্যতমা আমেরিকাবাসিনী শিষ্যা মিসেস্ ওলি বুল যে অর্থ সাহায্য করেন, তাতে বেলুড় মঠে মন্দিরনির্মাণের ও ব্যয়নির্বাহের সমস্যা দূর হয় এবং স্বামীজীর মন থেকে একটি বোঝা নেমে যায়। মঠের পরিচালকগণের হস্তে লক্ষাধিক টাকার ধনসম্পত্তি অর্পিত হয়।

বেলুড় মঠের নির্মাণকার্য চলার কালে মঠ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতেই ছিল। ইতিমধ্যে স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায়

যথেষ্ট সাফল্য লাভ ক'রে কার্যব্যপদেশে মঠে এসেছিলেন। স্বামী শিবানন্দ ফিরে এসেছিলেন সিংহলে বেদান্ত প্রচারের কাজে যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়ে। স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুর থেকে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজ সেরে ফিরে এসেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ আশানুরূপ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের উপযুক্তরূপে শিক্ষিত ও পরিচালিত করছিলেন। এঁদের সকলকে নিজ নিজ কাজে আরও উৎসাহিত করবার জন্যে স্বামীজী মঠে একটি ঘরোয়া সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বামীজী এবং তাঁর আদেশে গুরুভাইরা একে একে বক্তৃতা করলেন। শেষে স্বামীজী প্রায় আধঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের 'উপস্থিত কর্তব্য ও আদর্শ' সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন।

এর কয়েকদিন বাদেই ঠাকুরের জন্মতিথি এলো। এবার উৎসবের ভার স্বামীজী নিজহাতেই নিলেন। এই উৎসবে স্বামীজী উচ্চবর্ণের অব্রাহ্মণ শিষ্যদেরও গায়ত্রী মন্ত্র ও উপবীত দেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ উপবীত ধারণ ও গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী ছিলেন না। স্বামীজী এই অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানেন।

ঐ উপনয়নের দিনই মঠের সন্ন্যাসীরা আনন্দে মত্ত হয়ে স্বামীজীকে ধ'রে শিব সাজিয়ে দেন। তাঁর কানে পরিয়ে দেন শাঁখের কুণ্ডল, শরীরে মাখিয়ে দেন ভস্ম, মাথায় পরিয়ে দেন আজানুলম্বিত জটাজাল, বাহুতে রুদ্রাক্ষের বলয় ও অঙ্গদ এবং গলায় তিননরী রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁর হাতে দেন ত্রিশূল। বিবেকানন্দের গৃহী-শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী বলেছেন, সে দৃশ্য বর্ণনা করবার নয়, তা দেখবার, উপলব্ধি করবার। যাঁরাই উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই বলেছেন, শিব নিজেই তরুণ তপস্বী রূপে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সন্ন্যাসীরাও সকলে ভস্ম মেখে ভৈরব সেজে তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন। স্বামীজী শ্রীরাম-স্তোত্র গাইতে গাইতে ভাবে বিভোর হয়ে যান। তাঁর দুই চক্ষু অর্ধোন্মীলিত হয়। তিনি পদ্মাসন হয়ে তানপুরা বাজাচ্ছিলেন। সকলেই সেই দৃশ্য দেখে ও গান শুনে ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের জীবনে এ ছিল এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

এই সময়ে যাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনগারিক ধর্মপাল। অতিথির পদপ্রক্ষালন ভারতীয় হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট রীতি। ধর্মপাল ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগে পড়েছিলেন এবং স্বামীজী তাঁর কর্দমাক্ত পদ প্রক্ষালন করতে চাইলে তিনি প্রবলভাবে বাধা দিলেন। স্বামীজীর এই বিনয়ে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ বিস্মিত হলেন।

ইতিপূর্বেই স্বামীজীর আইরিশ শিষ্যা মিস্ মার্গারেট নোবল ভারতে এসেছিলেন এবং স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ২৫শে মার্চ তারিখে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষা দেন। মিস্ নোবল এখন থেকে ভগিনী নিবেদিতারূপে পরিচিতা হন। ভগিনী নিবেদিতাই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যদেশীয়া মহিলা যিনি ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত হলেন। এই সময়ে স্বামীজী কলকাতায় প্রকাশ্য জনসভায় দু-একবার ছাড়া বক্তৃতা করেন নি। ১১ই মার্চ তারিখে মিস্ নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) স্টার থিয়েটারে ইংলণ্ডে আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভারতীয় প্রভাব সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। স্বামীজী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এনী বেসাণ্ট ও মিস্ ম্যুলারের উল্লেখ ক'রে মিস্ নোবলকে 'ভারতকে ইংলণ্ডের আর একটি উপহার' ব'লে বর্ণনা করেন। স্বামীজী এই সভায় মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ ম্যুলারকেও বলতে বলেন। মিস্ ম্যুলার সমবেত জনমণ্ডলীকে 'আমার প্রিয় বন্ধুগণ ও স্বদেশবাসিগণ' ব'লে সম্ভাষণ করেন। তিনি বলেন, তিনি ও স্বামীজীর অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যরা কেবল

আধ্যাত্মিক চৈতন্য ও ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্যই ভারতে আসেন নি, তাঁরা ভারতকে তাঁদের সহধর্মী ব্যক্তিদের বাসস্থান মনে ক'রেই এসেছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজীর অন্যতমা মার্কিন শিষ্যা মিস্ জোসেফিন ম্যাকলয়েডও ভারতে এসেছিলেন। মার্চমাসের গোড়ার দিকে তিনি ও মিসেস্ ওলি বুল বেলুড়ে ক্রীত একতলা বাড়িতে আশ্রয় নেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িস্থ মঠ থেকে স্বামীজী প্রায়ই তাঁর এই পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যাদের কাছে যেতেন ও তাঁদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতেন। পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যদের ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মে সুশিক্ষিত ক'রে তোলাকে স্বামীজী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব'লে মনে করতেন। কারণ, এঁদের মধ্য দিয়েই হিন্দু ধর্ম ও বেদান্ত যে বহির্বিশ্বে বিশেষভাবে প্রভাববিস্তার করবে, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। এঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ভারতেও অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং ভারতের জাতীয় চেতনার বিকাশে তাঁর দান ছিল অপরিসীম। ২৮শে জানুয়ারি তারিখে মিস্ নোবল ভারতে এসেছিলেন। তখন থেকেই তাঁকে ভারতের সেবার জন্য উপযুক্ত ক'রে তোলার কাজে স্বামীজী বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ভারতে কাজ করতে গেলে যে হিন্দু রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, কায়দাকানুন নিখুঁতভাবে জানতে হবে, সেকথা স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্য-শিষ্যাদের বুঝিয়ে ছিলেন। তাই তাঁরা যাতে হিন্দুদের খাদ্যে, পরিচ্ছদে, ভাষায় ও সাধারণ রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হন, সেজন্য তিনি চাপ দিতেন। ভারতকে বুঝবার জন্যে তিনি ক্রমাগত তাঁদের উৎসাহিত করতেন। এজন্যে তিনি প্রায়ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তুলনা ক'রে দেখাতেন। ১৮৯৮ সালের অনেকখানি সময়ই তিনি তাঁর পাশ্চাত্য-দেশীয় শিষ্য-শিষ্যাদের শিক্ষায় নিয়োগ করেছিলেন। পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যদের কেউ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'স্বামীজী, আপনাকে

আমি কিভাবে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারি?' স্বামীজী তখন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন, 'ভারতকে ভালবাস।'

৩০শে মার্চ তারিখে স্বামীজী পুনরায় বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং যান ও চিকিৎসকের পরামর্শ যথাসম্ভব মেনে চলেন। তিনি একটু সুস্থ-সবল হয়ে উঠতে না উঠতেই কলকাতায় প্লেগেব মহামারী দেখা দেওয়ার দুঃসংবাদ এসে পৌঁছে। প্লেগ-সংক্রান্ত সরকারী নূতন আইনকানুনে কলকাতার লোকে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। স্বামীজী এই অবস্থায় দ্রুত কলকাতায় ফিরে আসেন (৩রা মে)। তিনি বিপজ্জনক অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করেন। মঠে পৌঁছেই তিনি বাংলায় ও হিন্দীতে দুটি প্রচারপত্র রচনা করলেন এবং অবিলম্বে ত্রাণকার্য শুরু করবার জন্যে বললেন। একজন গুরুভাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে?" স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কেন, প্রয়োজন হ'লে মঠের জন্যে কেনা জায়গা বিক্রি ক'রে দেব।" আমরা সন্ন্যাসী, গাছতলায় শুতে ও ভিক্ষান্নে ক্ষুধানিবৃত্তি করতে আমাদেব সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।' অবশ্য, স্বামীজীকে এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হ'লো না। প্রয়োজনীয় অর্থের প্রতিশ্রুতি আসতে লাগলো। সরকারী প্লেগ আইন অনুসারে প্লেগ-রোগীদের পৃথক ক'রে রাখবার জন্যে তিনি বিরাট একটি জায়গায় বহু শিবির খুলবার ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থা এমনভাবে করা হ'লো যাতে হিন্দুদের সংস্কারে শিবিরে থাকতে বিন্দুমাত্র না বাধে। স্বামীজীর ডাকে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য দলে দলে কর্মী এসে পড়লো। প্লেগের ত্রাণকার্যে স্বামীজী যে দ্রুত সুচারু ব্যবস্থাপনা করলেন, তাতে একবাক্যে সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো। প্লেগ বন্ধ হ'লো। কিন্তু আবার তার প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়া পর্যন্ত স্বামীজী কলকাতায় রইলেন।

১৬

হিমালয়ের পথে

মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার আলমোড়ায় ছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে সেখানে যাওয়ার জন্য বারবার লিখছিলেন। ১১ই মে স্বামীজী হাওড়া স্টেশন থেকে আলমোড়ার উদ্দেশে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, মিসেস্ বুল, কলকাতায় মার্কিন কন্‌সাল-জেনারেলের পত্নী মিসেস্ প্যাটারসন, ভগিনী নিবেদিতা ও মিস্ জোসেফিন ম্যাক্‌লয়েড। যাত্রাপথে স্বামীজী তাঁর সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের বিভিন্ন শহর নগর ও তীর্থস্থানের ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁদের সম্মুখে ভারতের অবিনশ্বর অতীত যেন মূর্ত হয়ে উঠলো। ১৩ই মে তাঁরা নৈনিতাল পৌঁছলেন। এখানে স্বামীজীর সঙ্গে খেতরির মহারাজা সাক্ষাৎ করলেন। স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে কয়েকদিন কাটালেন। নৈনিতাল থেকে তাঁরা আলমোড়া গেলেন এবং স্বামীজী গুরুভাই ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের নিয়ে টমসন হাউসে সেভিয়ার-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তাঁর পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যরা অদূরে একটি পৃথক বাড়িতে রইলেন। স্বামীজী ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনায় কাটাতেন। তাঁর মানসকন্যারূপে পরিচিতা ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি এই সময়ে বিশেষভাবে শিক্ষিতা ক'রে তোলেন। এই সময়ে ওই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত এবং তিনি তখনও মনেপ্রাণে ছিলেন ব্রিটিশ। কিন্তু স্বামীজী চেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে প্রাচ্য-আদর্শে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত করতে এবং তাঁকে ভারতবর্ষকে

ভালোবাসতে শেখাতে। স্বামীজীর এই ইচ্ছাশক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য। ফলে ধীরে ধীরে ভগিনী নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন প্রাণ দিয়ে। বিদেশী ও অপরিচিত ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে ভগিনী নিবেদিতার এই দ্বিধা কিন্তু স্বামীজীর ভালো লাগতো। একদিন তিনি নিজেও ঠাকুরের কাছে তাঁর শিক্ষা এমনই দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। রামকৃষ্ণ যেমন নরেনের মধ্যে আগুন জ্বালাবার জন্মে তাঁর প্রতি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য দেখাতেন, তেমনি স্বামীজীও নিবেদিতার প্রতি মাঝে মাঝে ঔদাসীন্য দেখাতেন। তিনি কঠোরভাবে আঘাত দিতেন পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকে, ব্রিটিশ জাতিকে, নিবেদিতার স্বদেশপ্রীতিকে। গুরু ও শিষ্যার এই মানসিক বিরোধ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন : "এই সময় আমার সকল সযত্নলালিত চিন্তাধারণার ওপর নিত্য যে আক্রমণ ও তিরস্কারবর্ষণ চলতো, তার জন্মে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক সময় অকারণে দুঃখভোগ করতে হয়। দেখলাম, অনুকূল ভাবাপন্ন স্নেহশীল আচার্যের যে স্বপ্ন আমি দেখতাম, তার স্থলে এমন এক ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠেছে যিনি অন্ততঃ আমার প্রতি উদাসীন ও সম্ভবতঃ প্রতিকূলভাবাপন্ন; আর আমি এই যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম, তা যুক্তি দিয়েও বিচার করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।" তারপর এমন একটা সময় এলো, যখন আমাদের দলের একজন বর্ষীয়সী মহিলা ভাবলেন যে, আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি তার ফল সহজেই অনেক দূর গড়াতে পারে। তাই তিনি দয়া ক'রে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করলেন। স্বামীজী নীরবে সব শুনলেন, তারপর চ'লে গেলেন। সন্ধ্যায় তিনি ফিরে এলেন এবং আমাদের সকলকে এক সঙ্গে বারান্দায় দেখে সেই বর্ষীয়সী মহিলাটিকে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। একটা পরিবর্তন চাই। আমি আজ একাকী থাকবার জন্মে বনে যাচ্ছি।

যখন ফিরব, তখন শান্তি নিয়ে ফিরব। তারপর তিনি ফিরে আকাশে প্রতিপদের চাঁদ দেখতে পেলেন, হঠাৎ উচ্ছ্বাসে তাঁর কণ্ঠস্বর ভরে গেল, বললেন, "দেখ! মুসলমানরা প্রতিপদের চাঁদকে খুবই মর্যাদা দেয়। আমরাও এই প্রতিপদের চাঁদের সঙ্গে নূতন জীবন শুরু করি এস!" কথাগুলি ব'লেই তিনি হাত তুলে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নীরবে আশীর্বাদ জানালেন। এতোক্ষণ তাঁর সর্বাধিক বিদ্রোহিণী শিষ্যা তাঁর পদতলে নতজানু হয়ে পড়েছিল।...এটি নিসন্দেহে পুনর্মিলনের একটি আশ্চর্য মধুর মুহূর্ত ছিল।"

আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী স্থানীয় বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রীষ্ম কাটাবার জন্যে আগত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও তিনি আলাপ করেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে মিসেস্ অ্যানী বেসান্টের ছু'বার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। স্বামীজী অধিকাংশ সময় খুবই প্রফুল্ল থাকলেও মাঝে মাঝে জীবনযন্ত্রণার কথা বলতেন ও ধ্যানস্থ হতেন। নির্জনতার জন্যে তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করতেন। ২৫শে মে তারিখে তিনি বন্ধুবান্ধব ও শিষ্য-শিষ্যাদের ত্যাগ ক'রে একাকী আলমোড়া থেকে দশ মাইল দূরে শিয়াদেরীতে চ'লে যান এবং সেখানে অরণ্যের নিস্তব্ধতায় প্রতিদিন দশ ঘণ্টা ক'রে কাটান। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় তিনি ছাউনিতে ফিরে এসে দেখতেন, তাঁর জন্যে বহু লোক অপেক্ষা করছেন। তাই তিনি আবার আলমোড়া ফিরে আসেন। কিন্তু এবার তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল বোধ করতে থাকেন।

৩০শে মে তারিখে তিনি সেভিয়ার-দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে সপ্তাহকালের জন্যে আলমোড়া ত্যাগ করেন, কিছুটা নির্জনতালাভের জন্যেও বটে, অপর কিছুটা কার্যব্যপদেশেও বটে। ঐ সময়ে তিনি মঠের উপযোগী একটি জায়গা কিনবার চেষ্টা করছিলেন, অবশ্য তাঁর ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওখান থেকে আলমোড়ায় ফিরে তিনি পওহারী বাবার ও মিঃ গুড়ুইনের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পান। মিঃ গুড়ুইন

কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন, সেখানে টাইফয়েড রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুসংবাদ শান্তভাবে গ্রহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু ক্রমাগত তাঁর কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি যেন তা প্রতিরোধ করবার জন্যে ব'লে ওঠেন, "মানুষকে এই মায়া জয় করতেই হবে এবং জানতে হবে, যে মারা গেছে, সে আগের মতোই এখানে আমাদের পাশেই আছে। তাদের অনুপস্থিতি ও ও বিচ্ছেদ কল্পনামাত্র।' স্বামীজী মিঃ গুড়ুইনের মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি বার্তা পাঠান। সেই সঙ্গে পাঠান তাঁর স্বলিখিত একটি কবিতা।

স্বামীজী ক্রমেই অধীর ও অশান্ত হয়ে ওঠেন এবং অন্যত্র কোথাও নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে চান। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়, কয়েকদিনের জন্যে কাশ্মীর যাবেন। ১১ই জুন তারিখে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেন। সঙ্গে যান তাঁর শিষ্যারা ও মিসেস্ ওলি বুল। স্বামীজীর মাদ্রাজী ও বেদান্তবাদী তরুণ শিষ্য বি. আর. রাজমের মৃত্যু হ'লে তাঁর সম্পাদিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীজী এই ধরনের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি ক'রে ঐ 'প্রবুদ্ধ ভারত' যাতে পুনঃপ্রকাশ করা যায়, তার ব্যবস্থা করেন। সেভিয়ার-দম্পতির ব্যবস্থাপনায় ও স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় আলমোড়া থেকে কাগজটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। স্বামীজী আলমোড়া ত্যাগের পূর্বেই এই ব্যবস্থা ক'রে যান।

স্বামীজী সদলে রাওলপিণ্ডি থেকে মুরিতে পৌঁছেন। সেখানে তিনদিন বিশ্রাম ক'রে বরমুলা থেকে তাঁরা নৌকাযোগে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। কাশ্মীরের নিসর্গ-শোভা তাঁকে পুনরায় প্রফুল্ল ক'রে তোলে। তিনি কাশ্মীরের অতীত ইতিহাস, কণিষ্কের কাহিনী, অশোকের বৌদ্ধধর্ম-প্রচার, শিব ও সূর্যের উপাসনা প্রভৃতি বিষয় ও নিজের পরিব্রাজক জীবনের অসংখ্য কাহিনী বর্ণনা করতে সঙ্গীদের চিত্ত ভ'রে দেন। ২৫শে জুন তাঁরা শ্রীনগরে পৌঁছেন।

৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা-দিবস। ঐ দিনটি পালন ক'রে তিনি তাঁর মার্কিন শিষ্যাদের চমৎকৃত ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ৪ঠা জুলাই দিবসের অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। স্বামীজী স্বলিখিত To the Fourth July নামে কবিতাটি নিজে পাঠ ক'রে সকলকে মুগ্ধ করেন। এখানে স্মরণীয়, ঠিক পরবৎসর এই ৪ঠা জুলাই তারিখেই স্বামীজী লীলা-সংবরণ করেন।

৬ই জুলাই মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাক্লেয়ড শ্রীনগর থেকে বিশেষ কাজে গুলমার্গ গিয়েছিলেন। ১০ই জুলাই তাঁরা ফিরে শুনলেন যে, স্বামীজী কোথায় চলে গেছেন। অনেক খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জানলেন যে, স্বামীজী সোনামার্গের পথে অমরনাথ যাত্রা করেছেন। কিন্তু স্বামীজী অমরনাথযাত্রা সার্থক হ'লো না। অত্যন্ত গরম পড়ায় বরফ গ'লে পথ দুর্গম হয়ে উঠেছিল, ফলে স্বামীজীকে ফিরে আসতে হ'লো। ১৮ই জুলাই স্বামীজী সঙ্গীদের নিয়ে ইসলামাবাদে গেলেন। ২৩শে তারিখে তাঁরা সকলে মার্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেন।

২৫শে তাঁরা আচ্ছাবল যান। আচ্ছাবলে স্বামীজী তাঁর অমরনাথযাত্রার কথা ব্যক্ত করেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি সম্মতি দেন। পরে স্থির হয়, তাঁর অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশীয় সঙ্গীরা তাঁর সঙ্গে পহলর্গা পর্যন্ত যাবেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করবেন। ২৬শে তাঁরা অমরনাথের পথে বাওয়ান যাত্রা করেন। পথে অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হ'লো। কিছু সন্ন্যাসী তাঁদের ছাউনির কাছে স্বামীজীর ইউরোপীয় শিষ্যাদের ছাউনি ফেলায় আপত্তি করলে স্বামীজী রুষ্ট হলেন এবং তাঁদের এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করতে গেলেন। তখন একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে তাঁকে সবিনয়ে বললেন, "স্বামীজী! আপনার শক্তি আছে সত্য, কিন্তু তা প্রকাশ করা উচিত নয়।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে ছাউনি দূরে

সরিয়ে নিলেন। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার আচার-ব্যবহারে সন্ন্যাসীরা মুগ্ধ হলেন এবং ম্লেচ্ছ ব'লে তাঁর সম্পর্কে যে ঘৃণা ও বিরাগ-ভাব ছিল তা দূর হ'লো। তাঁরা স্বামীজীকে ও ভগিনী নিবেদিতাকে পুরোভাগে স্থান দিলেন। পথে অসংখ্য সন্ন্যাসী স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করলেন। তীর্থযাত্রীদের তদারকের ভারপ্রাপ্ত একজন মুসলমান তহসিলদার স্বামীজীর প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে, তিনি স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্যও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

অবশেষে তাঁরা পহলগামে এসে পৌঁছলেন। লিডার নদীর গর্জমান জলধারার পার্শ্বে একটি গভীর গহ্বরের পাদদেশে মেষপালক-অধ্যুষিত পহলগাম গ্রামটি অবস্থিত। এখানে তাঁরা বিশ্রাম ক'রে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। চন্দনওয়ারার কাছে স্বামীজী নিবেদিতাকে কয়েক হাজার ফুট উচ্চ প্রথম হিমবাহটি পায়ে হেঁটে পার হ'তে বললেন। এই দুর্গম পথযাত্রা ছিল দুশ্চর তপস্যার মতো। এ ছাড়াও স্বামীজী তীর্থযাত্রীর সমস্ত নিয়মকানুন নিখুঁতভাবে পালন ক'রে চললেন। তাঁরা আঠারো হাজার ফুট উচ্চে বহু তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ ও হিমবাহ অতিক্রম ক'রে পাঁচটি পার্বত্য নদীর সঙ্গমস্থল পঞ্চতরণীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই পঞ্চ-জলধারা অতিক্রম করবার সময়ে প্রচণ্ড শীতেও তীর্থযাত্রীদের প্রতিটি নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করতে হয়। স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে পাছে নিবেদিতা বাধা দেন, এই ভয়ে স্বামীজী তাঁর অগোচরে প্রতিটি নদীর তুষারশীতল জলে অবগাহন করলেন। ২রা আগস্ট রাত্রি দুটোয় জ্যোৎস্নাধোয়া তুষারাবৃত গিরিমালার শোভা দেখতে দেখতে তাঁরা অমরনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রথমে তাঁদের অনেকখানি পথ চড়াইয়ে ও পরে কিছুটা পথ উতরাইয়ে হাঁটতে হ'লো। পথ অতিশয় দুর্গম ও বিপদসংকুল, একটিমাত্র ভুল পদক্ষেপে নিশ্চিত মৃত্যু। এই দুর্গম পথ যখন শেষ হ'লো তখন সূর্য উঠেছে।

অদূরে অমরনাথের পবিত্র গুহা দেখা যাচ্ছে। তীর্থযাত্রীরা সকলে মুহুর্মুহু শিবনাম উচ্চারণ করতে করতে গলিত তুষার-ধারায় স্নান করতে লাগলেন। স্বামীজী নিবেদিতাকে অগ্রসর হ'তে ব'লে নিজেও অবগাহন করলেন। তারপর তিনি যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর দেহ আবেগে কম্পিত হচ্ছিল। তিনি ভস্মাবৃত দেহে, কৌপীন মাত্র পরে গুহায় প্রবেশ করলেন এবং চিরতুষার-গঠিত শিবলিঙ্গের সম্মুখে ভক্তিভরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। স্বামীজী ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে মূর্ছিতপ্রায় হ'য়ে পড়লেন। এই অপূর্ব দিব্য অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি পরে নীরব থাকতেন, কেবলমাত্র বলেছিলেন, শিব তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলেন। অন্য কোনও তীর্থে তিনি এত আনন্দানুভব করেন নি। এখানে তিনি নিজেকে কোনরকমে সংযত ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর বাম চক্ষে রক্ত জমে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা ক'রে বলেছিলেন, "আপনার হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে পারত, তা না হয়ে তা বর্ধিত হয়ে গেছে।" অমরনাথদর্শনে স্বামীজীর এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল সত্য, কিন্তু তার চেয়েও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর শিষ্যদের। স্বামীজী নিরবচ্ছিন্নভাবে শিবভাবে নিমগ্ন ছিলেন, তাঁর মুখে কয়েকদিন অবিরাম শিবনাম ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় নি।

পূর্বব্যবস্থানুযায়ী স্বামীজী প্রত্যাবর্তনের পথে পহলগামে পৌঁছে তাঁর অন্যান্য পাশ্চাত্য শিষ্যাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ৮ই আগস্ট তাঁরা শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হলেন। তাঁরা ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীনগরে ছিলেন। এই সময় এতোই নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি প্রায়ই একাকী নৌকায় ক'রে অন্যান্যদের ছেড়ে চলে যেতেন এবং একাদিক্রমে কয়েক দিন নিঃসঙ্গভাবে কাটাতেন। তাঁর অন্তর্মুখিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি মাঝে

মাঝে দেশের নানা সমস্যায় তাঁর কর্মাদর্শ, ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিষ্য ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য সকলপ্রকার সুব্যবস্থা করেন। মহারাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রায়ই স্বামীজীর খোঁজ-খবর নিতে ও তাঁর কাছে ধর্মালোচনা শুনতে আসতেন। মহারাজা স্বামীজীকে কাশ্মীরে একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচনের জন্যে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন। স্বামীজী একটি স্থান নির্বাচনও করেছিলেন এবং মহারাজা সানন্দে এই স্থানটি তাঁকে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরের ইংরেজ রেসিডেন্টের প্রতিকূলতায় তা সম্ভব হ'লো না। স্বামীজী সাময়িকভাবে এতে বিষণ্ণ হ'লেও স্বামীজী এ-কে মা জগদম্বার ইচ্ছা মনে ক'রে কাশ্মীরে মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। তাছাড়া, হিমালয় অঞ্চলে একটি মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা সেভিয়ার-দম্পতি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলে একটি স্থান সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করছিলেন।

অমরনাথ থেকে প্রত্যার্বতনের পর স্বামীজী মা জগদম্বার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। প্রায়ই রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতগুলি গাইতেন। অদ্বৈতচিন্তা তাঁকে যে শক্তি দিয়েছিল, মাতৃচিন্তায় এখন তা ভক্তিতে পরিণত হ'লো। তিনি তাঁর নৌকোর মুসলমান মাঝির বার বৎসর বয়স্কা কন্যাকেও গৌরীরূপে পূজা করলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যেদিকেই তাকাই, সেখানেই মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করি।" এই সময়ে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি নির্জন সন্ধ্যায় তিনি এক গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তিনি নৌকোয় একাকী ছিলেন। তিনি রাত্রির অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে এই অন্ধকারের আবরণ ভেদ ক'রে মাকে দেখতে চাইলেন। তাঁর সমস্ত দেহ যেন বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রবাহে স্পন্দিত হয়ে উঠলো। বাইরে সবকিছুই শান্ত, কিন্তু তাঁর ভেতরে যেন প্রলয়ের আলোড়ন

সৃষ্টি হ'লো। তিনি এই ভাবোন্মত্ত অবস্থায় 'মৃত্যুরূপা মাতা' কবিতাটি রচনা করেন।

কবিতাটি লেখবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর হাত থেকে কলম খসে পড়ল এবং তিনি মাটিতে সংজ্ঞাহীন হয়ে প'ড়ে গেলেন, তাঁর আত্মা ভাবসমাধিতে মগ্ন হ'লো।

এরপর থেকে মাতৃনামই সার হয়ে উঠলো। "ভীষণার পূজার দ্বারা ভীষণকে জয় করা ও অমৃতত্ব লাভ করা যায়। মৃত্যুকে ধ্যান কর! ভয়ংকরকে পূজা কর! মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। মার অভিশাপও আশীর্বাদ। হৃদয়কে শ্মশান ক'রে তুলতে হবে, দর্প, স্বার্থপরতার কামনা এই শ্মশানে ভস্মে পরিণত করতে হবে। তখনই, কেবল তখনই, মা আসবেন।" স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের বললেন।

তাঁর এই অভিজ্ঞতার পর স্বামীজী হঠাৎ ৩০শে অক্টোবর ক্ষীরভবানী গেলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ ক'রে গেলেন। এখানে তিনি সপ্তাহকাল ছিলেন। এখানে তিনি কঠোর তপশ্চর্যা করতে লাগলেন। ক্ষীরভবানীর মন্দিরে তিনি নিত্য হোম ও উপাসনা করতে লাগলেন, মাকে ক্ষীরের নৈবেদ্য সাজিয়ে ভোগ দিলেন। এখানে তিনি এক ব্রাহ্মণের শিশুকন্যাকে উমা কুমারী-রূপেও আরাধনা ক'রে বিশেষ সাধনা করলেন। প্রচার, পরিচালনা, কর্ম, সকল কিছুই তিনি ভুলে গেলেন। তিনি বিশুদ্ধ নগ্ন সন্ন্যাসী ছাড়া আর কিছুই রইলেন না। একদিন মন্দিরে উপাসনাকালে মায়ের জীর্ণ ভগ্নমন্দির দেখে তাঁর মনে হ'লো, এ মন্দির মুসলমানরা যখন ভগ্ন করেছিল, তখন হিন্দুরা কি বাহুবলে তা রক্ষা করতে পারেনি? আমি যদি তখন থাকতাম, তাহ'লে প্রাণ দিয়েও মায়ের মন্দির রক্ষা করতাম। কিন্তু সহসা স্বামীজী চমকিত হয়ে শুনলেন মার কণ্ঠস্বর: "যদিই বা অবিশ্বাসীরা আমার মন্দির অপবিত্র করে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না, আমি তোকে রক্ষা করি?" এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। পরদিন

স্বামীজী ভাবলেন, তিনি এখানে একটি নূতন মন্দির গ'ড়ে তুলবেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর চিন্তার মধ্যেই তিনি মায়ের কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেলেন, "বৎস! আমি চাইলে অসংখ্য মন্দির পেতে পারি। আমি মুহূর্তে এখানেই সাততলা সোনার মন্দিরও গড়ে তুলতে পারি।" পরে তিনি কলকাতায় তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "মার এই কণ্ঠস্বর শুনবার পর থেকে আমি পরিকল্পনা করবার কথা ছেড়ে দিয়েছি। মা যেমন চাইবেন, তেমনটিই হ'তে দাও।"

স্বামীজী ক্ষীরভবানীতে তাঁর সাধনা ও তপশ্চর্যার অপূর্ব ফল নিয়ে শ্রীনগরে ফিরলেন। প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি চললো। কিন্তু স্বামীজীর আর সেই স্পৃহা নেই, তিনি চান সন্ন্যাসীর জীবন, নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, আত্মবিস্মৃতি। "স্বামীজী মরে গেছে। সে কে যে, সে ছুনিয়াকে শেখাবার কথা ভাববে? এমনই হামবড়াসি। তাকে মার প্রয়োজন নেই। তারই প্রয়োজন মাকে। এটা যখন কেউ বোঝে, কাজও তার কাছে মায়া মাত্র হয়ে যায়।"

১১ই অক্টোবর সকলে বরমুলা পৌঁছলেন। বরমুলা পর্যন্ত নৌকাযাত্রাকালে স্বামীজী সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। তিনি নিঃসঙ্গ থাকতে চাইছেন। তাঁকে দেখে অত্যন্ত অসুস্থ ও অবসন্ন মনে হ'তে লাগলো। বরমুলা থেকে পরদিন সকালে লাহোর রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর ইউরোপীয় শিষ্যারা দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে চাইলে স্বামীজী আলমোড়া থেকে আগত স্বামী সদানন্দকে নিয়ে ১৮ই অক্টোবর কলকাতায় ফিরে এলেন। স্বামীজীকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তাঁর গুরুভাইদের ও শিষ্যদের আনন্দের সীমা রইলো না। কিন্তু স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভাবান্তর তাঁদের ব্যাকুল ক'রে তুললো।

১৭

বেলুড় ও কলকাতায়

স্বামীজী হাঁপানিতে ভুগছিলেন। ২৭শে অক্টোবর তারিখে তাঁর গুরুভাইদের বিশেষ অনুরোধে তিনি কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ আর. এল. দত্তকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করালেন। ডাঃ দত্ত অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্বামীজীকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক হ'তে বললেন। তাঁর বাঁ চোখে যে রক্ত জমে গিয়েছিল, তা সম্ভবতঃ ভয়ংকর মনঃসংযোগের ফলেই হয়েছিল। স্বামীজী ওটাকে আমল দিতে চাইলেন না। তিনি এই সময় অত্যন্ত অন্যমনস্ক থাকতেন, অনেক সময় নিজের প্রশ্নের উত্তরও তিনি শুনতেন না। তাঁর এই ভাবান্তর সম্পর্কে এক শিষ্যকে তিনি বলেন, 'অমরনাথে বাবা মহাদেব যে আমার মাথায় ঢুকেছেন, আর নড়ছেন না।' তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে এই মানসিক উর্ধ্বলোক থেকে কিছুটা নীচে নামিয়ে এনে তাঁকে স্বাভাবিক ক'রে তুলতে চেষ্টা করলেন। তাঁর পর্যটন সম্পর্কে নানা কাহিনী তাঁর কাছ থেকে শুনতে চাইলেন, তাঁর সঙ্গে লঘু আলাপ ক'রে তাঁর মনকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে চাইলেন। তাঁরা কিছুটা সফলও হন। স্বামীজী আবার ধীরে ধীরে পূর্ব-অবস্থা ফিরে পেতে লাগলেন। তিনি শিষ্যদের নিয়মিত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। শাস্ত্রালোচনা করতে লাগলেন। গুরুভাই ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের নানা কাজে নিয়োগ করলেন। ৫ই নভেম্বর তিনি মঠে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখার্জীকে এবং কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী নীলাম্বর মুখার্জীকে অভ্যর্থনা জানালেন। ইতিমধ্যে তাঁর ইউরোপীয় শিষ্যারা উত্তর ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিদর্শন ক'রে

ফিরে এলেন। স্বামীজী ১লা নভেম্বর থেকে বলরাম বাবুর বাড়ি ও মঠের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলেন।

১২ই নভেম্বর তারিখে কালীপূজার পূর্বদিন তিনি কয়েকজন শিষ্যাকে নিয়ে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবী স্থায়ী কার্যালয়ের স্থান পরিদর্শন করলেন। উপাসনা ও অনুষ্ঠানের আয়োজনও হলো। মঠে ঠাকুরের যে ছবিটি পূজিত হতেন, সেটিও এখানে আনা হয়। শ্রীমা তাঁর নিজস্ব ঠাকুরের ছবিটাও আনেন এবং বিশেষ আরাধনা ক'রে ঐ স্থানটি পবিত্র ক'রে তোলেন। অপরাহ্নে শ্রীমার সঙ্গে স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। পরদিন বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার নূতন বালিকা বিদ্যালয়টির উদ্বোধন হয়।

৯ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠের শুভ উদ্বোধন হয়। তখনও সমস্ত জমি সমতল করা হয় নি। বাড়িটির যে আমূল সংস্কার ও রদবদল চলছিল, তার কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির এবং সন্ন্যাসীদের ভোজনালয় তখনও নির্মিত হয়নি। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসেই এই স্থানটির পবিত্রকরণের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। বর্তমান অনুষ্ঠানে স্বামীজী পৌরোহিত্য করেছিলেন। ঐদিন প্রভাতে স্বামীজী তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাস্নান করেন এবং নূতন গেরুয়া পরিধান ক'রে ধ্যান-উপাসনাদি সাঙ্গ করেন। তারপর শঙ্খধ্বনি ও কাঁসরঘণ্টা-বাদ্যের মধ্যে শোভাযাত্রাসহ স্বামীজী তাম্রাধারে রক্ষিত ঠাকুরের পূত দেহাবশেষ ডানকাঁধে নিয়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ি থেকে গঙ্গাতীর ধরে নূতন মঠের দিকে অগ্রসর হলেন। শঙ্খধ্বনি, বাদ্য ও জয়ধ্বনিতে গঙ্গাতীর মুখর হয়ে উঠলো। পথে স্বামীজী তাঁর এক পার্শ্বচর শিষ্যকে বললেন, "ঠাকুর একবার আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে খুশি নিয়ে যাবি, তা কুঁড়েঘরেই হ'ক,

কি গাছতলাতেই হ'ক, আমি সেখানেই থাকব।' তাঁর সেই আশীর্বাদ ভরসা ক'রেই আমি নিজে এখন তাঁকে আমাদের ভবিষ্যৎ মঠে বয়ে নিয়ে চলেছি। বৎস, নিশ্চয় জেনো, যতোদিন তাঁর নাম তাঁর ভক্তদের শুদ্ধি, পবিত্রতা ও সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে, ততোদিন তাঁর পুণ্য অধিষ্ঠান এই স্থানটিকে পবিত্র ক'রে রাখবে।'

মঠপ্রাঙ্গণে নির্মিত একটি বিশেষ বেদীর উপর পবিত্র তাম্রাধার স্থাপন ক'রে স্বামীজী ও অন্যান্য সকলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর স্বামীজী যথাবিহিত পূজা-উপাসনা শেষ ক'রে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে কেবল সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে বিরজা হোম সম্পন্ন করলেন। তিনি স্বহস্তে পায়সান্ন রেঁধে ঠাকুরের উদ্দেশে নিবেদন করলেন। তারপর পুণ্য অনুষ্ঠানশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে আহ্বান ক'রে বললেন, "ভাইরা, এস আমরা সকলে কায়মনোবাক্যে যুগাবতারের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর পুণ্য অধিষ্ঠানের দ্বারা চিরকাল এই স্থানকে পবিত্র রাখেন এবং এই কেন্দ্রটিকে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মিলন-কেন্দ্র ক'রে একটি পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করেন।" অনুষ্ঠানশেষে পুনরায় পুণ্য তাম্রাধারটি নিয়ে সকলে শোভাযাত্রা ক'রে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ি মঠে ফিরে যান। এবার তাম্রধারাটি বয়ে নিয়ে যান স্বামীজীর গৃহী-শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে ঠাকুরের পুণ্য দেহাবশেষ স্থায়িভাবে মঠে আনা হয়। ঐ সময়ে মঠও নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ি থেকে স্থানান্তরিত হয়।

১৯শে ডিসেম্বর স্বামীজী কিছুদিনের জন্যে বৈদ্যনাথধাম যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে যান তাঁর ব্রহ্মচারী শিষ্য হরেন্দ্রনাথ। স্বামীজী বৈদ্যনাথে বাবু প্রিয়নাথ মুখার্জীর বাড়িতে থাকেন। এখানে তাঁর কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ হয়। স্বামীজী জানুয়ারি মাসটা দেওঘরে

থাকেন এবং ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই কলকাতায় ফিরে আসেন। এখন তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের কার্যাবলীকে ব্যাপক ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার দিকে মন দেন। আমেরিকা থেকে স্বামী সারদানন্দ ফিরে এসে রামকৃষ্ণ সংঘের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। সে কাজ তিনি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে করছিলেন। বৈদ্যনাথধাম থেকে ফিরে এসে স্বামীজী সন্ন্যাসীদের এক সভায় বললেন যে, তাঁদের এখন বুদ্ধশিষ্যদের মতো রামকৃষ্ণের বাণী-প্রচারের জন্যে বেরুতে হবে। তিনি স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দকে এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ঢাকা যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিরজানন্দ বললেন, 'আমি কি প্রচার করব? আমি যে কিছুই জানি না।' স্বামীজী ব'লে উঠলেন, 'তবে ঐ কথাই প্রচার কর।' বিরজানন্দ স্বামীজীর কথা ঠিক না বুঝতে পেরে বললেন, তিনি আরো সাধনা ক'রে আগে তিনি নিজের মুক্তির জন্যে সিদ্ধিলাভ করবেন, তারপর প্রচারে যাবেন। স্বামীজী বজ্রকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'তুমি যদি নিজের মুক্তি চাও তবে তুমি নরকে যাবে! যদি তুমি পরমকে লাভ করতে চাও তবে পরের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করো। তোমার নিজের মুক্তির বাসনাকে গলা টিপে মারো। সেটাই হ'লো সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।' তিনি পরে স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, 'বৎস, তোমার অন্তর ও আত্মা দিয়ে কাজ ক'রে যাও। ওটাই আসল জিনিস। কাজের ফলের কথা ভেবো না। যদি অপরের জন্যে কাজ ক'রে নরকে যাও, তাতেই বা ক্ষতি কি? নিজের মুক্তির মধ্য দিয়ে স্বর্গে যাওয়ার চেয়ে তা অনেক ভালো।" ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ তাঁদের গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে ঢাকা রওনা হয়ে গেলেন। স্বামীজী তাঁর দুজন গুরুভাইকে, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে গুজরাটে প্রচারের জন্যে পাঠালেন। স্বামী অভয়ানন্দ (মিস্ মারী লুইস) আমেরিকায় চার বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে বেদান্ত প্রচারেব পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতে এসেছিলেন।

তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালে বক্তৃতা দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

ইউরোপীয় শিষ্যদের জন্যে এদেশে ঠাণ্ডা পরিবেশে একটি মঠ স্থাপনের কথা স্বামীজী বহুদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন। এজন্যে তিনি নিজে ধরমশালা, মুরি, শ্রীনগর, দেরাদুন ও আলমোড়া শহরে উপযুক্ত জায়গা খুঁজেছিলেন। শেষে ব্যাপারটি তিনি সেভিয়ার-দম্পতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেভিয়ার-দম্পতি ও স্বামী স্বরূপানন্দ আলমোড়া জেলার অভ্যন্তরে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটি মনোরম স্থান নির্বাচন করলেন। আলমোড়া শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে ছ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত এই স্থানটির নাম মায়াবতী। ঘন অরণ্যে ঘেরা এই স্থানটি থেকে হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। এই স্থানটিতে তাঁরা অদ্বৈত আশ্রম ও প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার কার্যালয় স্থাপনের সংকল্প করলেন। জায়গাটি কেনা হ'লো এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে স্বামীজীর আশীর্বাদ নিয়ে এখানে তাঁরা 'অদ্বৈত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৩ই ডিসেম্বর (১৮৯৮ খ্রীঃ) তারিখেই স্বামীজী পুনরায় তাঁর পাশ্চাত্য ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুরুভাইরা, শিষ্যরা ও চিকিৎসকরাও তাঁকে পাশ্চাত্য-ভ্রমণে যেতে অনুরোধ করলেন। স্বামীজীও সমুদ্রযাত্রায় তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ব'লে আশা করছিলেন। ২০শে জুন তারিখে তাই তিনি প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাট থেকে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে ক'রে ইংলণ্ড রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।

১৮

আবার আমেরিকায় ও ইউরোপে

২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে পৌঁছলো। ঐ সময়ে কলকাতায় প্লেগরোগের প্রাতুর্ভাব হওয়ায় জাহাজ থেকে কাউকে মাদ্রাজে নামতে দেওয়া হ'লো না। ফলে স্বামীজীর হাজার হাজার ভক্ত ও শিষ্য স্বামীজীর দর্শন থেকে বঞ্চিত হ'লো। স্বামীজীর কয়েকজন পুরাতন বন্ধু ও শিষ্য ফলফুল নিয়ে জাহাজে এসে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে গেলেন। কলম্বো বন্দরে স্বামীজীকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হ'লো। ২৮শে জুন কলম্বো থেকে জাহাজ ছাড়লো। ঐ সময়ে বর্ষাকাল হওয়ায় সমুদ্র অত্যন্ত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ছিল। ফলে তুদিনের জায়গায় দশদিন লাগলো তাঁদের এডেন বন্দরে পৌঁছতে। ৮ই জুলাই তাঁরা সুয়েজ বন্দরে পৌঁছলেন। সুয়েজ থেকে নাপল্‌স্ ও মার্সেই হয়ে তাঁরা লণ্ডনে পৌঁছলেন ৩১শে জুলাই। লণ্ডনে টিলবেরি ডকে অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী ও শিষ্য স্বামীজীকে সাদর সংবর্ধনা জানালেন। এঁদের মধ্যে তুজন মার্কিন মহিলাও ছিলেন। ২০শে জুন তারিখে স্বামীজী ভারত থেকে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করছেন জেনে এই তুই মহিলা আমেরিকার ডেট্রইট থেকে এটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছিলেন। স্বামীজী লণ্ডনের উপকণ্ঠে উইম্বলডনে মাত্র সপ্তাহ ছিলেন। আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অসংখ্য চিঠি আসছিল। তাই স্বামীজী তুরীয়ানন্দ ও তাঁর মার্কিন শিষ্যাদের সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন। ভগিনী নিবেদিতা বিশেষ কারণে কয়েকদিন ইংলণ্ডে রয়ে গেলেন।

স্বামীজী নিউ ইয়র্কে মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের বাড়িতে গেলেন।

সেখান থেকে তিনি ও তুরীয়ানন্দ মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রায় দেড় শ মাইল দূরে হাডসন নদীর তীরে ক্যাট্স্কিল পাহাড়ে গ্রামের বাড়িতে গেলেন। মাসখানেক বাদে ভগিনী নিবেদতাও এসে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। স্বামীজীর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তিনি লেগেট-পরিবারের এই গ্রামের বাড়িতে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত ছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। স্বামীজীর আগমন-বার্তা পেয়ে তিনি স্বামীজীর কাছে এলেন। স্বামী অভেদানন্দের কাছে বেদান্ত প্রচারের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং বেদান্ত সোসাইটির জন্য একটি স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে জেনে স্বামীজী খুবই খুশী হলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দও কাজে নেমে পড়লেন। স্বামীজী কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর ৮ই নভেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্ক সোসাইটিতে একটি প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে সভাপতিত্ব করলেন। ১০ই নভেম্বর তারিখে বেদান্ত সোসাইটির গ্রন্থাগারে স্বামীজীর অনুরাগী ও শিষ্যরা একটি জনসভা ক'রে স্বামীজীকে সংবর্ধনা জানালেন। এই সময়ে স্বামীজী একদিন নিভৃতে স্বামী অভেদানন্দকে বললেন, "ভাই, আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। আমি বড় জোর আর তিন-চার বছর বাঁচবো।" স্বামী অভেদানন্দ প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "আপনি অমন কথা বলবেন না। আপনার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে উঠেছে। আপনি ওখানে কিছুদিন থাকলে আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য ফিরে পাবেন। তাছাড়া, আমাদের যে এখনও অনেক কাজ বাকী। কাজ তো এই সবেমাত্র শেষ হয়েছে।" স্বামীজী বললেন, "আমি, ভাই কি বলছি, তুমি বুঝতে পারলে না। আমি অনুভব করি, আমি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছি। আমার সত্তা এমন বেড়ে চলেছে যে, আমার মাঝে মাঝে বোধ হয়, এই দেহে আর তা ধরছে না। আমি যেন ফেটে পড়ছি। সত্যিই এই রক্ত-মাংসের পিঞ্জর আমাকে আর বেশিদিন ধ'রে রাখতে পারবে না।"

স্বামীজী পক্ষকাল নিউ ইয়র্কে ছিলেন। এই সময়ে তিনি আশেপাশের কয়েকটি শহরেও গিয়েছিলেন। ২২শে নভেম্বর তিনি ক্যালিফর্নিয়া রওনা হলেন। পথে তিনি চিকাগোতে তাঁর বহু পুরাতন বন্ধু ও অনুরাগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজী ক্যালিফর্নিয়ায় পৌছেন এবং সেখানে প্রায় ছ মাস থাকেন। স্বামীজী প্রথমেই যান লস্ এঞ্জেল্সে। এখানে তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিতা মিসেস্ ব্লোজেটের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এখানে মিস্ ম্যাক্লয়েডও ছিলেন। স্বামীজী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত লস্ এঞ্জেল্সে ছিলেন। এখানে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং নিয়মিত কতকগুলি ক্লাস নেন। এখানে 'রাজযোগ' বিশেষভাবে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। লস্ এঞ্জেল্সে স্বামীজী কিছুদিন মিস্ স্পেন্সারের গৃহেও আতিথ্য গ্রহণ করেন। মিস্ স্পেন্সার স্বামীজীর অন্যতমা উৎসাহিনী শিষ্যা হয়ে ওঠেন। স্বামীজী লস্ এঞ্জেল্স্ থেকে যান ওক্ল্যাণ্ডে। এখানে তিনি ধর্মযাজক রেঃ ডঃ বেঞ্জামিন মিল্সের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং ডঃ মিলসের গির্জায় আটটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্যে গির্জায় প্রতিদিন দু হাজারেরও বেশী লোক আসতেন এবং তাঁর বক্তৃতাগুলি সংবাদপত্রের শীর্ষে স্থান পেতো। স্বামীজীর বক্তৃতা এই রাজ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও মনীষীরা সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বামীজী এখান থেকে ক্যালিফর্নিয়ার রাজধানী স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো যান এবং সেখানে তিনি মে মাসের শেষ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে কাজ করেন।

তিনি আমেরিকার একটি নদীতীরবর্তী অঞ্চলে যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন একদিন দেখলেন, একদল যুবক বন্দুক নিয়ে নদীতে প্রবহমান শামুক শিকার করছে। কিন্তু শামুকগুলি দ্রুত স্রোতে সঞ্চালিত হওয়ায় তারা প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। স্বামীজী যুবকদের

ব্যর্থ মৃগয়া লক্ষ্য ক'রে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। যুবকরা তা লক্ষ্য ক'রে স্বামীজীকে বললো, তিনি ব্যাপারটা যতো সহজ মনে করছেন, তা নয়; তিনি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন। স্বামীজী যুবকদের কাছ থেকে একটি বন্দুক নিয়ে পর পর বারোটি শামুককে গুলীবিদ্ধ করলেন। যুবকরা হতভম্ব হয়ে গেল, এবং বললো, স্বামীজী নিশ্চয় এ কাজে অনেকদিন ধ'রে হাত পাকিয়েছেন। স্বামীজী বললেন, জীবনে এই তিনি প্রথম বন্দুক ধরলেন। তাঁর এই সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর মনোনিবেশের শক্তি।

স্বামীজীর চেষ্টায় লস্ এঞ্জেলস্, পাসাডেনা, স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কো, ওক্‌ল্যাণ্ড, আলামেডা প্রভৃতি স্থানে দ্রুত প্রচারকেন্দ্র গড়ে উঠলো। এইভাবে ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্ত-প্রচারের কাজ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করলো। মে মাসের (১৯০০ খ্রীঃ) শেষ পর্যন্ত স্বামীজী নিজে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোতে রইলেন। ক্যালিফর্নিয়া ত্যাগের আগে তিনি তাঁর অন্যতমা অনুরাগিণী ছাত্রী মিনি বুকের কাছ থেকে ১৬০ একর জমি দান রূপে পেলেন। এই স্থানটি বেদান্ত-শিক্ষার্থীদের একটি মিলনকেন্দ্র গ'ড়ে তোলার জন্যে দেওয়া হয়। স্বামীজী নিজে স্থানটি না দেখলেও স্থানটির বর্ণনা শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন। অরণ্য-পর্বতবেষ্টিত এই নির্জন স্থানটি সন্ন্যাসী-জীবন-যাপনের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। বারো মাইল দূরে ছিল লোকবসতি, পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিল নিকটতম রেলস্টেশন।

এখানে পরিশ্রমের ফলে স্বামীজী আবার অবসন্ন বোধ করতে থাকেন। তাই তাঁকে তাঁর শিষ্য ডাক্তার লোগান নিজের বাড়িতে রাখেন এবং সেবা ও চিকিৎসা করেন। ডঃ উইলিয়ম ফর্স্টারও স্বামীজীকে দেখেন। এই সময় স্বামীজী জনসভায় বক্তৃতা না দিয়ে গীতার ওপর কয়েকটি ঘরোয়া সভা করেন। ক্যালিফর্নিয়ায় থাকার সময়ে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমোদ-প্রমোদে ও রসালাপে যোগ দিতেন। অনেক সময়ে শিষ্যদের আমন্ত্রণে

পাহাড়ের উপত্যকায় সুরম্য বনভূমিতে চড়ুইভাতি করতে যেতেন। লস্ এঞ্জেল্‌সের বিখ্যাত ব্যাঙ্ক-মালিক মিঃ সীডের তিন বোন তাঁর শিষ্যা হয়েছিলেন। তাঁরা স্বামীজীর সেবায় ও বেদান্ত-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বামীজী ক্যালিফর্নিয়ায় প্রচারকার্যে অত্যধিক পরিশ্রম করেছিলেন, ঐ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে তিনি শতাধিক জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাছাড়া দর্শনার্থী ও পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং নিয়মিত শিক্ষাদানও ছিল। তাই তাঁর ক্লান্তি ও অবসাদ ছিল স্বাভাবিক।

ঐ সময়ে কিছুদিন মিঃ ও মিসেস্ লেগেট লণ্ডনে ছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে তাঁদের সঙ্গে প্যারিসে গিয়ে মিলিত হ'তে আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যে বিখ্যাত বিশ্বপ্রদর্শনী হচ্ছিল, এই উপলক্ষে একটি 'ধর্মসমূহের ইতিহাস সম্মেলনও' অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এই সম্মেলনে বক্তৃতাদানের জন্যেও স্বামীজী সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। স্বামীজী তাই ইউরোপে যেতে মনস্থ করলেন। ইউরোপ রওনা হওয়ার আগে তিনি গেলেন নিউ ইয়র্কে। পথে তিনি চিকাগো ও ডেট্রইটে পুরাতন বন্ধু ও ভক্তদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। স্বামীজী নিউ ইয়র্কে পর পর চারটি রবিবারে বক্তৃতা দিলেন এবং চারটি শনিবারে গীতা সম্পর্কে ক্লাস নিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে ক্যালিফর্নিয়ায় বেদান্ত-প্রচারের ও 'শান্তি-আশ্রমের' কর্তা ক'রে পাঠালেন। তারপর ২০শে জুলাই (১৯০০ খ্রীঃ) তিনি জাহাজে প্যারিস রওনা হয়ে গেলেন।

প্যারিসে বৃহত্তর সম্মান ও খ্যাতি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্যারিসে স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের সুরম্য বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। পরে তিনি কিছুদিন মিসেস্ ওলি বুলের অতিথিরূপেও থাকেন। মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের বাসভবনে ফ্রান্সের সমস্ত খ্যাতনামা কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, চিত্রকর, গীতকার, ভাস্কর

ও অভিনেত্রী এসে ভীড় করতেন। স্বামীজী তাঁদের কাছে ভারতীয় দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপটি অসীম দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন। প্যারিসে আগমনকালে স্বামীজীর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্যারিস বিশ্ব-প্রদর্শনী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম-ইতিহাস-সম্মেলনে ভাষণদান। স্বামীজী দু মাস ধরে ফরাসী ভাষা খুব ভালো ক'রে শেখেন এবং এই অল্প সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাকে এমনভাবে আয়ত্ত করেন যে, ভারতীয় দর্শনের মতো জটিল বিষয়কেও ফরাসী ভাষায় সুন্দররূপে উপস্থাপিত করতে পারেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় তিনি ঐ সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেও দুটি মাত্র বক্তৃতা দেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং তিনি তাঁর মতামত The East and the West নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। এখানে স্বামীজী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডেস, মনীষী মঁসিয়ে জুল বোয়া, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী পিয়ের হায়াসিন্থ্, মেশিন-গান-উদ্ভাবক মিঃ হিরাম ম্যাক্সিম, পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড, প্রিন্সেস্ দেমিদফ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠেন।

ইতিহাস-ধর্ম-সম্মেলনের পরে স্বামীজী ব্রিটানিতে মিসেস্ ওলি বুলের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকেন। ভগিনী নিবেদিতা আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছিলেন, তিনিও মিসেস্ ওলি বুলের বাড়িতে ছিলেন। এখানে মিসেস্ ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির সাহচর্যে ও ঘরোয়া আলোচনায় তাঁর কয়েকদিন কাটে। এই সময়ে বুদ্ধদেব সম্পর্কে তিনি প্রায়ই আলাপ করতেন। বলতেন, বুদ্ধের হৃদয় ও শংকরের বুদ্ধির মিলনের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে এবং এই দুয়ের মিলন ঘটেছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে।

স্বামীজী ব্রিটানি ত্যাগ করবার কয়েকদিন আগে ভগিনী

নিবেদিতা ইংলণ্ডে চলে যান। যাওয়ার সময়ে স্বামীজী আশীর্বাদ ক'রে বলেন, "একটি গোঁড়া মুসলমানসম্প্রদায় আছে, তারা তাদের নবজাত শিশুকে বাইরে ফেলে রেখে বলে, যদি আল্লাহ্ তোকে সৃষ্টি করেন, তবে মরে যা, যদি আলি তোকে সৃষ্টি করেন, তবে বেঁচে থাক। আমি তোমাকে বলব, 'যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করি, তবে তুমি বিনষ্ট হও; যদি মা তোমাকে সৃষ্টি করেন, তবে তুমি বেঁচে থাকো।"

স্বামীজী ব্রিটানি থেকে প্যারিসে ফিরে এলেন। এখানে তাঁর পুরাতন ভক্তদের মধ্যে বিখ্যাত গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে ও মিস্ জোসেফিন ম্যাক্‌লয়েড প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থাকতেন। স্বামীজী তিন মাস ফ্রান্সে ছিলেন। ২৪শে অক্টোবর তিনি মঁসিয়ে জুল বোয়া, মিঃ লোয়াসঁ ও মিসেস্ লোয়াসঁ, মাদাম কাল্‌ভে ও মিস্ জোসেফিন ম্যাক্‌ল্‌য়েডের সঙ্গে ওরিয়েণ্টাল এক্‌স্‌প্রেস যোগে প্যারিস ত্যাগ করলেন। পরদিন তাঁরা ভিয়েনায় পৌছলেন। এখানে তাঁরা তিনদিন রইলেন ও নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখলেন। অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন, তুরস্ককে যদি 'ইউরোপের রুগ্‌ণ লোকটি' বলা হয়, তবে অষ্ট্রিয়াকে বলতে হয় 'ইউরোপের রুগ্‌ণা স্ত্রীলোকটি'। ২৮শে অক্টোবর তাঁরা ট্রেন যোগে কনস্টাণ্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া পার হয়ে ৩০শে তারিখে কনস্টাণ্টিনোপলে গিয়ে পৌছলেন। কনস্টাণ্টিনোপলে পৌছলে শুল্কবিভাগীর কর্মচারীরা তাঁদের দুখানি বই ছাড়া অন্য সব বই ও কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলো। মাদাম কাল্‌ভে ও মঁসিয়ে জুল বোয়ার প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদেও কোন কাজ হ'লো না। স্বামীজী কনস্টাণ্টিনোপলে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান, মিউজিয়াম, সমাধিস্থান প্রভৃতি দেখেন। তিনি এখানে কয়েকজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, ফরাসী রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে মধ্যাহ্ন-ভোজন করেন। তিনি কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকে আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতা

করলেও তাঁকে সরকার থেকে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয় না। কয়েকদিন কনস্টান্টিনোপলে থাকবার পর তিনি আথেন্স্ রওনা হন। চারদিন আথেন্সে থাকবার পর তিনি রুশ জাহাজ 'জার'-এ চড়ে মিশর রওনা হন। মিশরে তিনি বহু দ্রষ্টব্য স্থান, প্রাচীন মন্দির, সমাধিমন্দির প্রভৃতি দেখেন। এই সব বহিঃদৃশ্যাবলী তাঁকে মুগ্ধ ও কৌতূহলী করলেও অধিকাংশ সময়ই তাঁর মন অন্তর্মুখী হয়ে থাকে। এই সময়ে ভারতে তাঁর প্রিয় ভক্ত ও সুহৃদ্ মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যু হয়েছিল। স্বামীজীর মন তা জানতে পেরেছিল। স্বামীজী আর কালবিলম্ব না ক'রে দ্রুত ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং ভারতগামী প্রথম জাহাজেই চ'ড়ে বসলেন। স্বামীজী প্রায় সকলের অজ্ঞাতেই বোম্বাইয়ে পৌঁছলেন এবং বোম্বাই থেকে হাওড়া রওনা হলেন। তাঁরা ৯ই ডিসেম্বর (১৯০০ খ্রীঃ) গভীর রাত্রিতে বেলুড় মঠে পৌঁছলেন।

মঠের সন্ন্যাসীরা ও ব্রহ্মচারীরা খেতে বসেছিলেন। এমন সময় বাগানের মালী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বললো, "একজন সাহেব এসেছেন।" এতো রাত্রে সাহেব! তাঁরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের ব্যস্ত বিমূঢ় ভাবের মধ্যেই স্বামীজী এসে দাঁড়ালেন। আনন্দের কলরব উঠলো চারিদিকে। সে রাত্রে আনন্দে মঠের কারো চোখে ঘুম এলো না।

১৯

পূর্ববঙ্গে ও আসামে

স্বামীজী বেলুড়ে পৌঁছে তাঁর মন যা জানতে পেরেছিল, তা সত্য কিনা যাচাই ক'রে দেখলেন। সত্যই মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। স্বামীজী কয়েকদিনের মধ্যেই মিসেস্ সেভিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রমে রওনা হলেন। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী ২৯শে ডিসেম্বর সকালে :কাঠগোদামে গিয়ে পৌঁছলেন। এই বৎসর প্রচণ্ড শীত পড়েছিল, তার ওপর ঐ সময়টায় শীতের তীব্রতা ছিল খুব বেশী। স্বামীজী পথে জ্বরজ্বর বোধ করছিলেন। তাই কাঠগোদাম থেকে মায়াবতী যাত্রার আগে সকলেই তাঁকে বিশ্রাম করতে বললেন। রেলস্টেশন থেকে মায়াবতী ৬৫ মাইল পাহাড়ে পথ। প্রচণ্ড বরফ পড়ায় পথ অত্যন্ত দুর্গম হয়ে উঠেছিল। শরীর ভালো না থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী এই পথ অতিক্রম ক'রে সঙ্গীদের নিয়ে ৩রা জানুয়ারি (১৯০১ খ্রীঃ) মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলেন। এইসময়ে মায়াবতী প্রায় বরফাচ্ছন্ন ছিল। ফলে স্বামীজীকে ঘরেই আটক থাকতে হ'তো। পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে অনেকেই দেখা করতে আসতেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্যের ক্রমেই অবনতি ঘটছিল। মানসিক দিক থেকে তিনি প্রফুল্ল থাকলেও দৈহিক শ্রম সহ্য করতে পারছিলেন না। কয়েকবার হাঁপানির প্রবল আক্রমণও ঘটেছিল। স্বামীজী আশ্রমের সকল সন্ন্যাসীকে আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে সেখানে তিন বছর থাকবার জন্যে বললে কেবল স্বামী বিরজানন্দ ছাড়া সকলেই রাজী হলেন। স্বামী বিরজানন্দ বললেন, তিনি কিছুদিন একাকী অন্যত্র থেকে ধ্যান ও তপশ্চর্যা করতে চান।

স্বামীজী বললেন, "তপশ্চর্যা ক'রে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রো না। আমাদের দেখে কিছু শিখতে চেষ্টা করো। আমরা কঠোর তপশ্চর্যা করেছি। কিন্তু ফল কি হয়েছে?—যৌবনে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে; আর সেজন্যে এখন ভুগতে হচ্ছে। তাছাড়া, তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করবার কথা কেমন ক'রে ভাবতে পার? দু-পাঁচ মিনিট ধ্যানই যথেষ্ট। সেজন্যে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় খানিকটা সময় হ'লেই চলে। বাকী সময়টা তোমার পড়াশুনো ও সকলের হিতসাধনে নিয়োগ করা উচিত। আমার শিষ্যদের তপশ্চর্যার চেয়ে কাজের ওপর জোর দিতে হবে। কাজই হবে তাদের তপশ্চর্যা, তাদের সাধনা।") বিরজানন্দ স্বামীজীর কথা স্বীকার ক'রে নিলেও বললেন, চরিত্রবল ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্যে তাঁর তপশ্চর্যার প্রয়োজন। বিরজানন্দ স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বামীজী বললেন, বিরজানন্দের কথা যে ঠিক তা মনে মনে বোঝেন। সন্ন্যাসীর স্বাধীন জীবন এবং যোগাভ্যাস তিনি নিজেও ভালোবাসেন। তিনি তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের অতীত দিনগুলি স্মরণ ক'রে বলেন, সেগুলিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।

অদ্বৈত-আশ্রমে কয়েকজন ভক্তের একান্ত ইচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি পূজাঘর স্থাপিত হয়েছিল। স্বামীজী একদিন সেখানে গিয়ে ফুল ধূপ ধুনো নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়ে রামকৃষ্ণের পূজা হচ্ছে দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেন এবং সন্ধ্যায় সকলে সমবেত হ'লে বললেন, "অদ্বৈত-আশ্রমে এই ধরনের পূজা-অনুষ্ঠানের তিনি বিরোধী। এই আশ্রম অদ্বৈতের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, কেবল অদ্বৈতের উপাসনাই এখানে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত প্রচার করেছিলেন। তাঁর শিষ্যরা অদ্বৈতের অনুসরণ করবে না কেন?" স্বামীজীর এই মন্তব্য শুনে অদ্বৈত-আশ্রমের সন্ন্যাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করেছিলেন। পরে এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বেলুড়ে তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের বলেছিলেন, "আমি চাই, অন্ততঃপক্ষে একটিও কেন্দ্র থাক,

যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহপূজা হবে না। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম, বুড়ো সেখানে আগেই গেড়ে বসেছে।"

স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভালো না থাকলেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। এই সময়ে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্যে তিনি কয়েকটি নিবন্ধ রচনা করেন এবং ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্ত' অনুবাদ করেন। তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি হ'তে থাকায় তিনি মায়াবতী থেকে পিলিভিতে নেমে আসেন। পিলিভিতে পৌঁছার আগেই তিনি স্বামী শিবানন্দকে বলেন যে, "আমি একাকী সেখান থেকে বেলুড় মঠের জন্যে অর্থসংগ্রহে বেরুবো। বেলুড় মঠের অন্যান্য সদস্যকেও সারা ভারত ঘুরে প্রচার চালাতে হবে এবং সাধারণ তহবিলের জন্যে অন্ততঃপক্ষে দু হাজার টাকা আনতে হবে।" স্বামী শিবানন্দ স্বামীজীর নির্দেশ হাসিমুখে মেনে নিলেন। স্বামীজী ২৪শে জানুয়ারি (১৯০১ খ্রীঃ) বেলুড়মঠে ফিরে এলেন।

স্বামীজী এখন সপ্তাহকাল হয় কলকাতায় বাগবাজারে বলরাম-বাবুর বাড়িতে, নয় বেলুড়মঠে কাটান। এই সময়ে শিষ্যদের শিক্ষাদানই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রমাগত স্বামীজীর আহ্বান আসতে থাকে। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। তাছাড়া, তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবীও পূর্ববঙ্গে ও আসামে কয়েকটি তীর্থস্থানে যাওয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে স্বামীজীকে আবার বেরিয়ে পড়তে হয়। ১৮ই মার্চ তারিখে তিনি সদলবলে কলকাতা ত্যাগ করেন এবং পরদিন ঢাকায় পৌঁছেন। ঢাকায় তিনি ট্রেনে পৌঁছলে ঢাকার বিখ্যাত উকিলবাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও বাবু গগনচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে তাঁকে ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। রেলওয়ে স্টেশনটি জনতায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং "শ্রীরামকৃষ্ণের জয়"-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। একটি বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে স্বামীজীকে শহরের প্রধান রাজপথগুলি ধ'রে জমিদার বাবু

মোহিনীমোহন দাসের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

শুভ বুধাষ্টমীর দিনে স্বামীজী তাঁর মা ও শিষ্যদের নিয়ে নৌকাযোগে লাঙ্গলবাঁধে যান এবং ব্রহ্মপুত্রে স্নান করেন। লাঙ্গলবাঁধ তীর্থটি পরশুরামের পুণ্যনামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। বুধাষ্টমীর উৎসবে এখানে অসংখ্য পুণ্যার্থী আসেন। ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামীজীর বাসভবনে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী আসতে থাকেন। তাঁদের তিনি রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মোপদেশ দেন। সকলেই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মধুর ব্যবহার, সুগভীর জ্ঞান ও ভক্তি দেখে বিমুগ্ধ হন। স্বামীজী জগন্নাথ কলেজে একটি বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—আমি কি শিখেছি। পরদিন পোগেজ স্কুলেও বিশালতর একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল—"যে ধর্মে আমরা জন্মেছি।" দুইটি বক্তৃতাই অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

ঢাকা থেকে স্বামীজী সদলবলে চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা যাত্রা করেন। পথে তিনি গোয়ালপাড়ায় ও গৌহাটিতে কয়েকদিন কাটান। তিনি গৌহাটিতে তিনটি ভাষণ দেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই মন্দের দিকে যেতে থাকে। শিলংয়ে গেলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে পারে ভেবে তিনি শিলং যাত্রা করেন। শিলং ছিল আসামের রাজধানী এবং সেখানেই আসামের ইংরেজ চীফ কমিশনার ভারতপ্রেমিক স্যার হেনরি কটন বাস করতেন। তিনি স্বামীজীর সম্পর্কে অনেক কথাই আগে শুনেছিলেন। তাই স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁর অনুরোধে স্বামীজী স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি সভায় বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনে স্যার হেনরি এতই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি নিজে স্বামীজীর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন এবং ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনা করলেন।

স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভালো নয় জেনে তিনি সিভিল সার্জেনকে স্বামীজীর চিকিৎসার জন্যে নির্দেশও দিলেন। স্বামীজী যতোদিন শিলংয়ে ছিলেন, প্রতিদিনই স্যার হেনরি তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ নিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভারতপ্রেম স্বামীজীকেও মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু শিলংয়েও স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হ'লো না। তিনি ডায়বিটিস রোগে ভুগছিলেন, সেই সঙ্গে হাঁপানিও প্রবল হয়ে উঠেছিল। সকলেই তাঁর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। স্বামীজী শিলং থেকে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে এলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণকেই তাঁর শেষ প্রচার-ভ্রমণ বলা চলে।

২০

মঠে

স্বামীজীর গুরুভাই ও শিষ্যরা সকলেই স্বামীজীকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের ও শিষ্যদের খুশী করবার জন্যে তাঁর সকল কর্মসূচী স্থগিত রেখে মঠে প্রায় সাতমাস বিশ্রাম নিলেন। এই সময়েও স্বামীজী মাঝে মাঝে শিক্ষা দিতেন, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে তাঁর আরব্ধ কাজ কেমন চলছে, তার খোঁজখবর নিতেন। অনেক সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতেন। তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করতেন। স্বামীজী নিজেও প্রফুল্ল থাকতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে গান গাইতেন, শিষ্যদের গান শোনাতেন, গুরুভাইদের সঙ্গে লঘু আলাপে যোগ দিতেন।

বেলুড় মঠে ভারতের সকল স্থান থেকে অসংখ্য দর্শনার্থী আসতেন এবং সকলেই তাঁর দর্শন ও আশীর্বাদ কামনা করতেন। স্বামীজী তাঁদের কাউকে নিরাশ করতেন না। তাঁর অসুস্থ দেহের ওপর তাতে যথেষ্ট চাপ পড়তো। গুরুভাইরা ও শিষ্যরা তাঁকে সামান্য একটু সেবা করবার জন্যেও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে কৌপীন মাত্র পরে মঠে ঘুরে বেড়াতেন। আবার কখনো তাঁকে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে দেখা যেতো—তিনি চিন্তায় মগ্ন হয়ে মঠ থেকে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়তেন। কখনো গঙ্গার ধারে ব'সে থাকতেন। কখনো কলকাতায় একটা দিন কাটিয়ে আসতেন। কখনো বা মঠে নিজের ঘরে বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতেন। কখনো গুরুভাইদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কখনো হেঁসেলে গিয়ে রান্নার তদারক করতেন। স্বামীজীর

দেহ ক্রমেই দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তা তাঁর মন ও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেও চঞ্চল হয়ে উঠতেন। তখন তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন। স্বামীজী হাসিমুখে তাঁদের বলতেন, "ভগবানের একটি দয়ার জন্যে আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই দয়াটি হ'লো এই যে, আমরা কেউ অমর নই।")

স্বামীজী মাঝে মাঝে মঠের দোতলার বারান্দায় বসে গঙ্গার ওপারে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরেব চূড়ার দিকে চেয়ে থাকতেন। তাঁর মুখখানি এক:অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। তিনি মাঝে মাঝে মঠের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর প্রিয় বেলগাছের তলাটিতে এসে বসতেন। মাঝে মাঝে বসতেন মঠ ও রামকৃষ্ণ-মন্দিরের মাঝখানকার আমগাছের তলাটিতে। চিন্তায় তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, অনেক সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকতো না। আমগাছটির তলায় তিনি অনেক সময় একটি চটের খাটিয়ায় ব'সে চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখতেন, বই পড়তেন, গল্প করতেন।

স্বামীজী থাকতেন মঠের দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকের বড় ঘরটিতে। এটিই ছিল তাঁর শয়নকক্ষ, বসবার ঘর, পড়বার ঘর। ঘরে একটি পাঁচ ফুট উঁচু আয়না ছিল দেওয়ালে; আর ছিল একটি আলনা, তাতে স্বামীজীর গেরুয়া কাপড়গুলি থাকতো। ঘরের মাঝখানে ছিল তারের গদি-আঁটা একটি লোহার খাটিয়া। এটি তাঁকে তাঁর পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যরা উপহার দিয়েছিলেন। তবে স্বামীজী এই খাটে প্রায়ই শুতেন না। তিনি শুতেন মেঝেতে একটি সামান্য বিছানায়। একটি কোচ, একটি লেখার টেবিল, একটি কলিংবেল, একটি ফুলদানিতে কিছু ফুল, শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি, একটি দেওয়ালপঞ্জী, একটি মৃগচর্মের আসন, চীনামাটির কিছু কাপ-ডিশ— এই ছিল এই কক্ষের আসবাবপত্র। এর অধিকাংশ জিনিসই স্বামীজীকে তাঁর পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্য-শিষ্যারা উপহার দিয়েছিলেন।

স্বামীজী প্রতিদিনই খুব ভোরে উঠতেন এবং সন্ন্যাসীদের ঘুম থেকে তুলতেন। মঠের বাগান, ফুলের বাগান, সবজির বাগান, পোষা জীবজন্তুগুলি, সকল কিছুর প্রতিই স্বামীজীর সস্নেহ দৃষ্টি ছিল। মঠে অনেকগুলি পোষা জীবজন্তু ছিল। যেমন, 'বাঘা' কুকুর, 'হংসী' ছাগী, 'মাতরু' ছাগলছানা, অনেকগুলি গোরু, ভেড়া, হাঁস, একটি হরিণ, একটি সারস। পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে ফিরে এসে স্বামীজী এগুলির সেবাযত্নে অনেকখানি সময় কাটিয়ে দিতেন। ছাগলছানাটিকে স্বামীজী খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর গলায় তিনি আদর ক'রে একটি ঘন্টির মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে তিনি যখন শিশুর মতো খেলা করতেন, দৌড়োদৌড়ি করতেন, তখন সকলে অবাক হয়ে যেতো। ছাগলছানাটি হঠাৎ মারা গেলে স্বামীজী খুবই ব্যথা পান। তিনি তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্রকে বলেন, "কি আশ্চর্য! আমি যাকেই ভালোবাসি, সেই তাড়াতাড়ি মরে যায়!" জীবজন্তুকে যাতে সময়মতো খেতে দেওয়া হয়, যাতে তাদের সেবাযত্ন হয়, সেদিকে ছিল স্বামীজীর সতর্ক দৃষ্টি। এ বিষয়ে স্বামী সদানন্দ ছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী।

জীবজন্তুগুলিও স্বামীজীকে একই চোখে দেখতো। একবার 'বাঘা' কুকুরকে তার দুষ্টামির জন্যে গঙ্গার ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাঘা মাঝি ও যাত্রীদের প্রতিবাদ ও প্রহার উপেক্ষা ক'রে একটি নৌকোয় চ'ড়ে বসে এবং মঠে ফিরে আসে, তারপর রাত্রির অন্ধকারে চলে যায় স্বামীজীর স্নানের ঘরে। ভোরের অন্ধকারে স্বামীজী বাঘাকে স্নানের ঘরে শুয়ে থাকতে দেখে তাকে আদর করেন। বাঘা কাতর চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে যেন আশ্রয় চায়। সে জানে, এ মঠে স্বামীজীই তাকে ক্ষমা করতে ও আশ্রয় দিতে পারেন। স্বামীজী বাঘাকে ক্ষমা করেন এবং সন্ন্যাসীদের জানিয়ে দেন, কোন অপরাধের জন্যেই কোনদিন বাঘাকে দূর করা চলবে না।

স্বামীজী জুলাই ও আগস্ট মাসে যতোখানি সম্ভব বিশ্রাম নেন। ফলে সেপ্টেম্বরে তিনি কিছুটা ভালো বোধ করেন।

স্বামীজীর ও বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীদের সমুদ্রযাত্রা, পাশ্চাত্যদেশীয়-দের সঙ্গে মেলামেশা, আহার সম্পর্কে বাছবিচারের অভাব প্রভৃতি নিয়ে গোঁড়া হিন্দুরা নানা সমালোচনা করতো। এমন কি, তাঁদের চরিত্র সম্পর্কেও নানা অপবাদ রটতো। স্বামীজীর কানে এসব এলে তিনি শান্তকণ্ঠে বলতেন, "জানো তো একটা কথা আছে—বাজার দিয়ে হাতী চলে যায় আর অসংখ্য কুকুর তার পেছনে ঘেউ ঘেউ করে। যখন দেশে কোন নূতন চিন্তাধারা প্রচারিত হয়, তখন পুরাতনপন্থীরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রত্যেক ধর্মপ্রচারককে এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছে। নির্যাতন নিপীড়ন ছাড়া কোন চিন্তা কখনো সমাজের অন্তঃস্থলে ঢুকতে পারে না! নিঃস্বার্থ ও নির্বিকার ভাবে কাজ ক'রে যাও, দেখবে সুফল ফলবেই।"

সুফল ফলতে শুরু করেছিল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীসম্প্রদায় সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। এবার অক্টোবর মাসে স্বামীজী যখন মঠে দুর্গোৎসবের আয়োজন করলেন, তখন মঠের জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে গেল। স্বামীজী অন্যান্য ব্যাপারে খুবই উদারতা দেখালেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে চিরাচরিত রীতিনীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। পূজার কিছুদিন আগে থেকে তিনি রঘুনন্দনের স্মৃতি নিয়ে এসে পড়তে থাকেন, তারপর গুরুভাইদের তাঁর মনের কথা বলেন। স্বামীজী দুর্গাপূজার প্রস্তাব তুললে স্বামী প্রেমানন্দ বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, মা দশভুজা গঙ্গা পার হয়ে এদিকে আসছেন। স্বামীজী কলকাতায় গিয়ে শ্রীমাকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানান। শ্রীমা সানন্দে সম্মতি দেন এবং পূজার আয়োজনের সকল ব্যবস্থা হয়ে যায়। মঠের আঙিনার উত্তরাংশে অস্থায়ী চালা বেঁধে দুর্গাপ্রতিমা নির্মিত হয়। শ্রীমা কলকাতা

থেকে আসেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বাবা নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য তন্ত্রধারক নিযুক্ত হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ পূজার আয়োজনের কণামাত্র ত্রুটি করেননি। প্রতিদিন শত শত দরিদ্র-নারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়। সপ্তমী পূজার দিন স্বামীজীর জ্বর হওয়ায় ঐ দিন তিনি নিজে পূজায় যোগ দিতে পারেননি। পরদিন তিনি পূজায় যোগ দেন, মার আরাধনা করেন ও পুষ্পাঞ্জলি দেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মার পূজার সময় যে গানগুলি গাইতেন, সেগুলি গান।

স্বামীজী মঠে লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজারও আয়োজন করেন। কালীপূজার পরে মা ভুবনেশ্বরীদেবী স্বামীজীকে জানান যে, তিনি শিশুকালে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে ভুবনেশ্বরীদেবী মা কালীর কাছে মানত করেছিলেন যে, শিশু যদি সেরে উঠে তবে তিনি তাকে মার কাছে মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়াবেন। কিন্তু এই মানতের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। এখন পুত্রের ক্রমাগত অসুস্থতার ফলে তাঁর সেই মানতের কথা মনে পড়েছে। স্বামীজী মার মুখ থেকে এই কথা জেনে খুব অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কালীঘাটমন্দিরে যান এবং গঙ্গাস্নান ক'রে ভেজা কাপড়েই মূর্তির পদতলে তিনবার ভূমিতে গড়াগড়ি দেন, তারপর মাকে পূজা দিয়ে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং সেই মন্দিরে ব'সে মার উদ্দেশে হোম করেন।

(অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের এই মূর্তিপূজা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষারই পরিপূর্ণ ফল। মা ও পরম ব্রহ্ম যে এক, এ শিক্ষা ঠাকুরই তাঁকে দিয়েছিলেন।)

অক্টোবর মাসে (১৯০১) স্বামীজীর অসুস্থতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার সণ্ডার্স তাঁকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সামান্যতম দৈহিক ও মানসিক শ্রমও নিষিদ্ধ ছিল। বিশ্রাম, চিকিৎসা ও মঠের সন্ন্যাসীদের সযত্ন সেবার ফলে স্বামীজী কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বৎসরের শেষাশেষি

জাপানের দুজন বৌদ্ধ পণ্ডিত মঠে এসেছিলেন—রেভারেণ্ড ওডা ও মিঃ ওকাকুরা তাঁরা জাপানে ধর্মসম্মেলনের আয়োজন করছেন তাতে স্বামীজীকে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানালেন। তাঁরা জানালেন, স্বামীজী উপস্থিত না থাকলে এই সম্মেলন সার্থক হবে না। স্বামীজী তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও সম্মতি দিলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করলেন। ওকাকুরা বোধগয়া যাচ্ছিলেন, তিনি স্বামীজীকে তাঁর সঙ্গী হ'তে অনুরোধ জানালেন। স্বামীজী সানন্দে রাজী হলেন। তিনি কাশী যাওয়ার কথাও ভাবছিলেন। তাই বললেন, "ভালোই হবে, তথাগত যেখানে বোধি লাভ করেছিলেন, তা দর্শন ক'রে তথাগত যেখানে তাঁর বাণী প্রথম প্রচার করেছিলেন, সেখানে যাব।"

১৯০২ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী বোধগয়ায় ও বারাণসীতে কাটান। এই তাঁর জীবনের শেষ সফর।

কাশীর শুষ্ক আবহাওয়ায় তাঁর শরীরের কিছুটা উন্নতি হবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কাশীতে তিনি আবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কাশীর বহু পণ্ডিত এবং তাঁর পুরাতন বন্ধু ও অনুরাগী ভক্ত এসে রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। এখানে ভিঙ্গার মহারাজা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে কাশীতে মঠ স্থাপনের জন্যে টাকা দিতে চাইলেন। স্বামীজী তাতে সম্মত হয়ে কলকাতায় ফিরে স্বামী শিবানন্দকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইভাবে কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সূচনা হ'লো। স্বামীজী কাশীর যুবকদের জনসেবার কাজে উৎসাহিত ক'রে তুললেন। এইভাবে কাশীর কয়েক হাজার যুবক সংঘবদ্ধ হ'লো এবং অসংখ্য দরিদ্র, নিরাশ্রয়, নিঃসহায় ও রুগ্‌ণ তীর্থযাত্রীদের সেবার ভার নিলো।

কাশীতে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হ'লো। গঙ্গা, অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির ও সাধুসঙ্গ তাঁকে বেশ প্রফুল্ল ক'রে তুললো তিনি সুস্থ বোধ করলে মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করলেন এবং মন্দির-

গুলিতে দেবদেবী দর্শন ক'রে কাটালেন। কিন্তু কাশীতে আর বেশী দিন তিনি থাকলেন না। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে যোগদানের জন্যে বেলুড়ে ফিরে এলেন। কিন্তু বেলুড়ে ফিরেই স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি জন্মোৎসবের দিন নিজের ঘর ছেড়ে বেরুতেও পারলেন না। কয়েকদিন যাবৎ তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর পাগুলি ফুলে গিয়েছিল। স্বামীজীর অসুস্থতা বাড়ায় উৎসবটি ম্লান হয়ে গেল। মঠের সন্ন্যাসীরা সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অসংখ্য নরনারী এই উৎসবের দিনে স্বামীজীর দর্শন পাবেন আশা ক'রে এসেছিলেন, তাঁরা নিরাশ হলেন। গুরুভাই ও শিষ্যদের মনের অবস্থা জেনে তিনি তাঁদের উৎসাহিত করবার জন্যে বললেন, "দুঃখের কাছে হার মেনে লাভ কি? এই দেহ যখন জন্মেছে, এই দেহ তখন মরবেই। আমি যদি আমার ধ্যানধারণা তোমাদের মধ্যে এতোটুকু দিয়ে যেতে পারি, তবে জানবো আমার জীবন ব্যর্থ হয়নি। সর্বদা মনে রেখো, ত্যাগই মূল কথা। একথা না বুঝলে মুক্তিলাভের কোন আশা নেই।"

গুরুভাইদের অনুরোধে স্বামীজী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় সম্মত হলেন। তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন কলকাতার বিখ্যাত কবিরাজ মহানন্দ সেনগুপ্ত। কবিরাজ স্বামীজীর জন্যে জল ও নুন একেবারে নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। দেহের ওপর তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, তা দেখবার জন্যেই যেন স্বামীজী সানন্দে চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে নিলেন। স্বামীজী ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল খেতেন, অথচ তিনি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ না ক'রে কোন অসুবিধা বোধ করলেন না। গুরুভাই ও শিষ্যরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেন, "দেহ মনের ভৃত্য; মন যা হুকুম করবে, দেহ তা শুনতে বাধ্য।"

এই কঠোর চিকিৎসা, স্বল্পাহার ও অনিদ্রা সত্ত্বেও স্বামীজীর মুখমণ্ডলের সেই দিব্য জ্যোতি বিন্দুমাত্র ম্লান হ'লো না। চিকিৎসা-

আরম্ভের কিছুদিন আগে তিনি পঁচিশ ভল্যুম নবপ্রকাশিত এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আনিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। এই কঠোর চিকিৎসার মধ্যেও তিনি নিয়মিত পড়ে যেতে লাগলেন। তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী একদিন তাঁকে বললেন, "এক জন্মে এতোগুলি ভল্যুম প'ড়ে আয়ত্ত করা কঠিন।" তিনি জানতেন না যে, ইতিমধ্যেই স্বামীজী দশটি ভল্যুম প'ড়ে শেষ করেছেন এবং এগারোর ভল্যুম পড়ছেন। তিনি বললেন, "তার মানে? তুমি এই দশ ভল্যুমের যেখান থেকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, দেখ, আমি বলতে পারি কিনা। শরৎচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে ভল্যুমগুলি নামিয়ে আনলেন এবং প্রত্যেক ভল্যুম থেকে বেছে বেছে অনেক কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী সেগুলির উত্তরই দিলেন না, অনেক ক্ষেত্রে বই থেকে হুবহু লাইনগুলিও উদ্‌ধৃত করলেন। শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব'লে উঠলেন, "এ কোন মানুষের ক্ষমতায় সম্ভব নয়।" স্বামীজী বললেন, "এতে অলৌকিক কিছু নেই। (কেউ যদি কঠোর ভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করে, তবে সে যা একবার শুনবে বা পড়বে, তা তার বহু বছর হুবহু মনে থাকবে। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবে আমরা জাতি হিসাবে শক্তিতে ও বুদ্ধিতে হীন থেকে হীনতর হয়ে পড়ছি এবং আমাদের পৌরুষ হারাচ্ছি।")

তারপর স্বামীজী শরৎচন্দ্রকে হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন ধারা আলোচনা ক'রে বোঝাতে লাগলেন। এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঘরে ঢুকে শরৎচন্দ্রকে তিরস্কার ক'রে বললেন, "তোমার কি একটু বুদ্ধিবিবেচনা নেই। স্বামীজী অসুস্থ। তাঁকে হালকা কথাবার্তায় খোলা হাসি-খুশী রাখবে, না তাঁকে দিয়ে এইসব জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাচ্ছ।" শরৎচন্দ্র লজ্জিত হলেন। স্বামীজী বলে উঠলেন," তোমাদের এইসব চিকিৎসা আর ধরাবাঁধার কে ধার ধারে? ওরা আমার ছেলে; ওদের শিক্ষা দিতে গিয়ে যদি এ দেহ যায়, তাতে কে তোয়াক্কা রাখে?" স্বামীজী তারপর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু

করলেন। তিনি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সমালোচনা করলেন এবং মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তিনি একজন শিষ্যকে দিয়ে মঠের লাইব্রেরি থেকে মেঘনাদবধ কাব্য আনালেন ও তার সুন্দর কয়েকটি অংশ উচ্চকণ্ঠে পড়ে শোনালেন।

স্বামীজী মার্চ মাসের গোড়া থেকে তাঁর তিরোধান পর্যন্ত কয়েক মাস নিজের অসুস্থতাকে উপেক্ষা ক'রে নানা কাজ ক'রে চলেন। তাঁর গুরুভাইরা দর্শনার্থীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শুনলে তিনি কষ্ট পেতেন, বলতেন, "এ দেহটায় লাভ কি? পরহিতে যাক এটা। ঠাকুর কি শেষ দিন পর্যন্ত তাই ব'লে যাননি? আর আমি তা করব না? এ দেহ যায় যাক। যখন কোন সত্যসন্ধানী আসে, তার সঙ্গে কথা কয়ে আমি যে কি আনন্দ পাই, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। মানুষের মধ্যে আত্মাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আমি হাজারবার মরতেও প্রস্তুত আছি।"

২১

মধ্যাহ্নে সূর্যাস্ত : মহাসমাধি

এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটছিল, যাতে স্বামীজীর তিরোধানের সময় যে আসন্ন, তা বোঝা যেত। কিন্তু স্বামীজীর হাসিখুশী ভাব, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের দৃষ্টি সেদিকে পড়তে দেয়নি। স্বামীজী বারাণসী থেকে ফিরে এসে তাঁর সকল গুরুভাই ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের সামান্য সময়ের জন্যে হ'লেও এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। তাঁর এই ডাক মহাসমুদ্রের ওপারেও গিয়ে পৌঁছেছিল। অনেকেই এসে পৌঁছেছিলেন। অনেকে আবার কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেন নি। পরে তাঁদের দুঃখের সীমা ছিল না। স্বামীজী অসুস্থ হ'লেও তাঁর তিরোধানের কাল যে এমন আসন্ন, তা কেউ বুঝতে পারেননি।

স্বামীজী ক্রমেই মঠের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন এবং অন্যদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দিচ্ছিলেন। তিনি কর্মের বন্ধন থেকে ক্রমেই নিজেকে মুক্ত ক'রে নিচ্ছিলেন। তপশ্চর্যা ও ধ্যানই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "নরেন যখন নিজে জানতে পারবে ও কে, তখন ও এই দেহে থাকতে পারবে না।" এ কথাটা স্বামীজীর গুরুভাইদের প্রায়ই মনে পড়তো। তাই তাঁর তিরোধানের কয়েকদিন আগে ঠাকুর সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর এক গুরুভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আপনি কে ছিলেন, তা কি আপনি জানতে পেরেছেন?" স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন "হ্যাঁ, জানতে

পেরেছি।" গুরুভাইরা চমকে উঠলেও স্বামীজীর প্রফুল্ল ভাব দেখে তাঁরা আশঙ্কাটাকে প্রশ্রয় দিলেন না।

তিরোধানের সপ্তাহকাল আগে স্বামীজী তাঁর শিষ্য স্বামী সুধানন্দকে একটি পঞ্জিকা আনতে বললেন। স্বামীজী পঞ্জিকার কয়েক পৃষ্ঠা নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর পঞ্জিকাটি নিজের কক্ষে রেখে দিলেন। পরে কয়েকদিন তাঁকে অনেকসময় পঞ্জিকাটি মন দিয়ে পড়তে দেখা যেত। কিন্তু তখনও কেউ ভাবতে পারেন নি যে, স্বামীজী তাঁর তিরোধানের দিনটিই স্থির করছেন। ৪ঠা জুলাই, ১৯০২, শুক্রবার। ঠাকুরও তাঁর তিরোধানের আগে কয়েকদিন এইভাবে পঞ্জিকা নাড়াচাড়া করতেন।

তিরোধানের তিন দিন আগে স্বামীজী মঠের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে স্বামী প্রেমানন্দকে গঙ্গার তীরে একটি স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেখিয়ে বললেন, তিনি দেহত্যাগ করলে ঐ জায়গায় যেন তাঁর সৎকার করা হয়। ঐ দিনই তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে বলেন, "একটি মহা তপস্যা ও ধ্যান আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি হচ্ছি।"

ঐদিন বুধবার, ছিল একাদশী। স্বামীজী সারাদিন নিজে একাদশীর উপবাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সকলকে তিনি নিজে পরিবেশন ক'রে খাওয়াতে চাইলেন। তিনি সকালে সকলকে সস্নেহে পরিবেশন করলেন। শিষ্যদের খাওয়া হ'লে তিনি নিজে তাঁদের হাতে জল দিলেন ও তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন। শিষ্যরা সকলে প্রতিবাদ করতে লাগলেন, 'এ কাজ তো আপনার নয়; আমরা শিষ্য, এ কাজ তো আমাদের। স্বামীজী প্রতিবাদে কান দিলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন, "যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।" শিষ্যরা বলতে চাইলেন, "কিন্তু সে তো তাঁর মৃত্যুর আগে।" কিন্তু কথাগুলি ঠোঁটে এসেও থেমে গেল, তাঁরা চমকে উঠলেন।

৫ই জুলাই ছিল শনিবার ও অমাবস্যা। মায়ের পূজার প্রশস্ত সময়। তাই স্বামীজী ঐ দিন মঠে বিশেষভাবে কালীপূজার আয়োজন করতে নির্দেশ দেন। স্বামীজীর ঐসব উক্তি সত্ত্বেও তাঁর তিরোধান যে এতোই আসন্ন, কেউ অনুমান করতে পারেন নি।

৪ঠা জুলাই শুক্রবার। এই দিনটিতে তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল অর্থপূর্ণ, অথচ সে অর্থ তখন কারো কাছে ধরা পড়েনি। স্বামীজী ভোরে উঠেছিলেন। তিনি চা খেয়ে মঠের মন্দিরে গিয়ে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল, তিনি মন্দিরের দরজা ও জানালাগুলি বন্ধ ক'রে খিল দিলেন। অথচ তিনি ধ্যান করবার সময়ে সর্বদা দরজা-জানালা খোলা রাখতেন। তিনি আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত একটানা তিনঘণ্টা রুদ্ধদ্বার-মন্দিরে রইলেন। সকলে আশ্চর্য হলেন, কারণ এতো দীর্ঘক্ষণ তিনি একটানা ধ্যান করতেন না। তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ আঙিনায় পায়চারি ক'রে বেড়ালেন। তিনি গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ অস্ফুট-কণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন, "যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকতো, তবে সে বুঝতে পারতো, বিবেকানন্দ কি করেছে। তবু, সময় হ'লে কতো বিবেকানন্দই না জন্মাবে!" অদূরে স্বামী প্রেমানন্দ দাঁড়িয়েছিলেন, স্বামীজীর এই অস্ফুট উক্তি তাঁর কানে যেতে তিনি চমকে উঠলেন। এ ধরনের কথা তো স্বামীজী কোনোদিন বলেননি।

স্বামীজী গুরুভাই ও শিষ্যদের সঙ্গে একত্র আহার করতেন না। কিন্তু সেদিন তিনি একত্র আহার করলেন। তিনি প্রতিটি খাদ্য আনন্দের সঙ্গে খেলেন। বললেন, তাঁর শরীরটা এতো ভালো বোধ হচ্ছে যে, এমনটি কোনদিন হয়নি।

আহারের মিনিট পনেরো পরে, বেলা একটার সময়, স্বামীজী ব্রহ্মচারীদের ঘরে গেলেন এবং তাঁদের ডেকে ব্যাকরণ পড়াতে লাগলেন। তিনি প্রায় তিনঘণ্টা ব্যাকরণ পড়ালেন। এইসব

নীরস বিষয় তিনি চিরকাল যেমন গল্প ও রসালাপের মধ্যে সহজ ও সজীব ক'রে পড়াতেন, আজ তেমনিটিই করলেন।

বিকালের দিকে স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় দু-মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতে গেলেন। তিনি গুরুভাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করলেন। মঠে একটি বৈদিক কলেজ স্থাপনের কথাও বললেন। এ ধরনের কলেজ-প্রতিষ্ঠায় লাভ কি হবে প্রশ্ন করলে স্বামীজী বললেন, "এতে কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হবে।"

মঠে ফিরে স্বামীজী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেন। এই যে তাঁদের শেষ আলাপ, তখনো কেউ জানতেন না।

যতোই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগলো, ততোই স্বামীজী চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন। সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজলে তিনি তাঁর কক্ষে ফিরে গেলেন এবং তাঁর একজন শিষ্যকে জপমালা আনতে বললেন। শিষ্যটি জপমালা আনলে স্বামীজী তাঁকে বাইরে বসতে ব'লে ঘরের মধ্যে জপ ও ধ্যান করতে বসলেন। ঘণ্টাখানেক জপ ও ধ্যান করবার পর তিনি মেঝেতে বিছানায় এসে শুলেন এবং শিষ্যটিকে ডেকে তাঁর মাথায় একটু বাতাস করতে বললেন। শিষ্যটি ভাবলেন, স্বামীজীর সম্ভবত তন্দ্রা এসেছে। ঘণ্টাখানেক বাদে স্বামীজীর হাত কেঁপে উঠলো এবং দুবার গভীর নিঃশ্বাস পড়লো। শিষ্য ভাবলেন, গুরুদেব সমাধিস্থ হয়েছেন। শিষ্যটি নিচে গিয়ে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে আনলেন। তিনি এসে দেখলেন স্বামীজীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ী বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী এসে পড়লেন। স্বামীজীকে সমাধিস্থ মনে ক'রে তাঁর সমাধি ভাঙাবার জন্মে উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের নামগান করতে লাগলেন। কিন্তু সমাধি ভাঙলো না। রাত্রিতে একজন বড় ডাক্তার আনা হ'লো। তিনি স্বামীজীর দেহ পরীক্ষা ক'রে বললেন, স্বামীজী জীবিত নেই।

পরদিন দেখা গেল স্বামীজীর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ এবং মুখে ও নাকে

সামান্য রক্ত। কোন কোন ডাক্তার বললেন, মাস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে স্বামীজীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কেউ সুনিশ্চিত হতে পারলেন না।

স্বামীজী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন, এ বিষয়ে তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের কারো সংশয় ছিল না। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি কোনদিন চল্লিশ হবো না।" মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন।

স্বামীজীর মৃত্যু মঠবাসীদের কাছে ছিল বিনামেঘে বজ্রাঘাত। তাঁরা সকলেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সারা মঠে শোকের কালো যবনিকা নেমে এসেছিল।

স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সকাল থেকে মঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। মঠের গেটে ও ঘাটে গাড়ি :ও নৌকার ভীড় ও আনাগোনা চলতে লাগলো। স্বামীজীর দেহকে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁর কক্ষে অনন্ত শয়ানে শায়িত রাখা হয়েছিল। দর্শকরা দলে দলে স্বামীজীকে তাঁদের শেষ প্রণাম জানিয়ে এলেন। স্বামীর দেহে ও মুখে এতোটুকুও মৃত্যুর ছায়া নেই। সেই অপরিম্লান হাস্যস্মিত মুখমণ্ডল! সকলের মনেই এক প্রশ্ন—স্বামীজী কি সত্যই মৃত, না সমাধিস্থ। মঠের সন্ন্যাসীদের মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল। স্বামীজী হয়তো অজ্ঞাত কোন সমাধিতে নিমগ্ন, কালোত্তীর্ণ হ'লে তিনি যথাসময়ে আবার সংজ্ঞা লাভ করবেন। কিন্তু যতোই সময় যেতে লাগলো, স্বামীজীর দেহ ততোই কঠিন হ'তে লাগলো। সন্ন্যাসীরাও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেন।

বেলা দুটোর সময় স্বামীজীর গৈরিকবাসাবৃত দেহকে তাঁর কক্ষ থেকে নিচে আঙিনার সামনে চত্বরে নামানো হ'লো। ভক্তরা অনেকেই তাঁর পায়ের তলায় আলতা মাখিয়ে মসলিনের উপর পায়ের ছাপ তুলে নিলেন। তারপর শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে ধূপধূনো দিয়ে তাঁর আরতি করা হ'লো। শিষ্যরা এসে গুরুদেবের চরণে

মাথা রেখে প্রণাম জানালেন। তারপর "জয় শ্রীগুরু মহারাজজীকি জয়!" "জয় শ্রীস্বামীজী মহারাজজীকি জয়!" ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে বিশাল শোভাযাত্রা স্বামীজী-নির্দেশিত স্থানে স্বামীজীর দেহকে বয়ে নিয়ে চললো। সন্ন্যাসী ও ভক্তরা স্বামীজীর দেহকে চিতায় শায়িত ক'রে আগুন দিলেন। দাউ দাউ ক'রে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন। গোধূলির ধূসর আলোকে চিতার অগ্নিশিখাও স্তিমিত হয়ে এলো। নেমে এলো রাত্রির কালো ছায়া। সন্ন্যাসীরা চিতায় গঙ্গাজল ঢেলে মঠে ফিরে এলেন।

পরদিন সন্ন্যাসীরা স্বামীজীর ভস্মাবশেষ সংগ্রহ ক'রে আনলেন। স্বামীজীকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে এখন স্বামীজীর মন্দির নির্মিত হয়েছে। চিতার উপর নির্মিত হয়েছে একটি বেদী এবং এই বেদীর উপর স্থাপিত হয়েছে ঠাকুরের একটি মর্মর-মূর্তি। স্বামীজীর চিতাভস্মের কিছুটা এখানে আছে। বাকীটা রাখা হয়েছে তাম্রাধারে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে। এই মন্দিরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, দ্বৈত ও অদ্বৈত, মা ও ব্রহ্ম এক হয়ে আছেন।

ঘটনাপঞ্জী

১৮৬৩, ১২ জানুয়ারি (বাংলা ১২৬৯ সাল, মকরসংক্রান্তি) নরেন্দ্রের জন্ম।

১৮৭১ মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশনে প্রবেশ।

১৮৭৭ রায়পুরে পিতার নিকট গমন।

১৮৭৯ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ।

১৮৮০ জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি ইন্‌স্টিট্যুশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রবেশ।

১৮৮১ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ ও পরে সাক্ষাৎকার।

১৮৮৪ বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু ; নরেন্দ্রের বি. এ. পরীক্ষায় সাফল্য।

১৮৮৫ শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতার সূত্রপাত ; নরেন্দ্রের আধ্যাত্মিক উন্নতি, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও গুরুভাইদের নেতৃত্বদান।

১৮৮৬ নবেন্দ্রের বোধগয়া দর্শন ; নির্বিকল্প সমাধি ; শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নরেন্দ্রের মধ্যে নিজশক্তি সঞ্চারণ ; শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান ; বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা, আঁটপুরে তরুণ সন্ন্যাসীদের শপথগ্রহণ।

১৮৮৮ ভারত-পরিক্রমা শুরু—বারাণসী, অযোধ্যা, লখ্‌নৌ, বৃন্দাবন, হৃষীকেশ।

১৮৮৯ বরানগর মঠে অবস্থান।

১৮৯০ পুনরায় ভারত-পরিক্রমা—বৈদ্যনাথ ; এলাহাবাদ ; গাজীপুর ; পওহারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; বারাণসী ; বরানগর মঠে দুই মাস ; ভাগলপুর ; দেওঘর ; কাশী ; অযোধ্যা ; নৈনিতাল ; আলমোড়া ; শ্রীনগর ; তেহ্‌রি ; হৃষীকেশ ; শাহ্‌রনপুর ; মীরাট।

১৮৯১-৯২ দিল্লী গমন ; আলোয়ার ; জয়পুর ; আজমীড় ; খেতরি ; আমেদাবাদ ; লিম্বডি ; জুনাগড় ; পোরবন্দর ; বোম্বাই ; কোলাপুর ; বেলগাঁও ; মহীশূর ; কোচিন ; ত্রিবাঙ্কুর ; রামেশ্বরম্‌ ; রামনাড ; পন্দিচেরি ; মাদ্রাজ।

১৮৯৩ হায়দরাবাদ ; স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা (৩১শে মে) ; সিংহল, সিঙ্গাপুর, মালয়, চীন, জাপান হয়ে উত্তর আমেরিকা

মহাদেশে উপস্থিতি ; ভ্যাঙ্কুবার থেকে চিকাগো, বিশ্বমেলা-দর্শন ; বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন শুরু (১১ই সেপ্টেম্বর) ; স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বমেলায় বক্তৃতাদান ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে সফর ও বক্তৃতাদান।

১৮৯৪ ডেট্রইট, চিকাগো, নিউইয়র্ক ও বোস্টনে অবস্থান ও বেদান্তপ্রচার।

১৮৯৫ পার্সি ও থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে অবস্থান ; মিসেস ফাংকে ও মিস্ ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলের শিষ্যত্ব-গ্রহণ।

১৮৯৬ প্যারিস ও প্যারিস থেকে ইংলণ্ড-যাত্রা ; আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন ; বেদান্ত সোসাইটি অব্ নিউ ইয়র্কের প্রতিষ্ঠা ; পুনরায় ইংলণ্ড গমন ; ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; ইউরোপ-ভ্রমণ ; ভারত-যাত্রা।

১৮৯৭ ভারতে প্রত্যাবর্তন ; সিংহল, রামনাড, মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা ; দার্জিলিং গমন ; রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা ; আলমোড়া যাত্রা ; বেরিলি, আম্বালা ও অমৃতসর হয়ে কাশ্মীর গমন ; রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট, লাহোর, দেরাদুন, আলোয়ার, জয়পুর, খেতরি, কিষেণগড়, আজমীঢ়, যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোয়া, প্রভৃতি ভ্রমণ।

১৮৯৮ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ; বেলুড়ে মঠের জন্য জমি ক্রয় ; মিস্ নোবেলকে ব্রহ্মচারিণী রূপে দীক্ষাদান ; আলমোড়া গমন ; কাশ্মীর গমন ; অমরনাথ দর্শন ; ক্ষীরভবানীতে সাধনা ; কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১৮৯৯ আলমোড়ায় অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা ; স্বামীজীর ইংলণ্ড ও ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা যাত্রা।

১৯০০ আমেরিকায় ও ইউরোপে প্রচার ; ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯০১ স্বামীজীর অসুস্থতা বৃদ্ধি ; ওডা ও ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯০২ বোধগয়া ও কাশী ভ্রমণ—জীবনের শেষ ভ্রমণ ; বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন ; তিরোধান (৪ঠা জুলাই)।

বিবেকানন্দের বাণী

"ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালোবাসা ভালো ; কিন্তু ভালোবাসার জন্যই তাঁহাকে ভালোবাসা আরও ভালো।"

*　　　*　　　*

"কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ।"

*　　　*　　　*

"প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান্ সূর্যে উপনীত হয়।"

*　　　*　　　*

"ভারতের কোটি কোটি নরনারী শুষ্ক কণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।"

*　　　*　　　*

"জগতের মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে—ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতেই তাঁহাদের অন্তরে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।"

*　　　*　　　*

"কর্মের জন্যই কর্ম কর। সকল দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহাদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর ; তাঁহারা কর্মের জন্যই কর্ম করেন, নাম-যশ গ্রাহ্য করেন না, স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের প্রকৃত উপকার হইবে বলিয়াই তাঁহারা কর্ম করেন।"

*　　　*　　　*

"আলস্য সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। 'ক্রিয়াশীলতা' অর্থে সর্বদাই প্রতিরোধ বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্ভাবের প্রতিরোধ কর। যখন তুমি এই কার্যে সফল হইবে, তখন শান্তি আসিবে।"

* * *

"যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে দুর্নীতি-পরায়ণ বলিতে হইবে। যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাকে অসৎপ্রকৃতি বলিতে হইবে, কারণ তাহার উপর শত শত ব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। যদি সে সচেষ্ট হইয়া ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে।"

* * *

"আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া কঠিন। যথার্থ ত্যাগীর অপেক্ষা যথার্থ কর্মীর জীবন কঠোরতর না হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন।"

* * *

"এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি—সর্বদাই যেন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবে আমরা নিশ্চয় আলোক দেখিতে পাইব।"

* * *

"আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়া থাকিবে। আমাদের কর্তব্য—দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকারীকে ভালোবাসা।"

* * *

"এই জগতে প্রকাশিত সুখদুঃখের শক্তিসমষ্টি সর্বদাই সমান। আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে ঠেলিয়া দিতেছি মাত্র, কিন্তু উহা চিরকালই একরূপ থাকিবে, কারণ এইরূপ থাকাই উহার স্বভাব। এই জোয়ার-ভাটা, এই ওঠা-নামা জগতের স্বভাবগত।"

* * *

"যদি জীবন চাও, তবে ইহার জন্য তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মরিতে হইবে। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিসের দুইটি বিভিন্ন রূপ মাত্র—শুধু বিভিন্ন দিক হইতে উহারা একটি তরঙ্গের উত্থান ও পতন এবং দুইটি একত্র করিলে একটি অখণ্ড বস্তু হয়।"

* * *

"যথার্থ সাম্যভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কখন হইতেও পারে না। এখানে কি করিয়া আমরা সকলে সমান হইব? এই অসম্ভব ধরনের সাম্য বলিতে সমষ্টি-বিনাশই বুঝায়।...সৃষ্টির জন্য সাম্যভাববিনাশকারী শক্তির যতোটা প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব-স্থাপনকারী শক্তিরও ততটা প্রয়োজন।"

* * *

"কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিও না; প্রতিদানে কিছুই চাহিও না। যাহা তোমার দেওয়ার আছে দাও। ইহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না।...শিক্ষা কর—দান করিবার জন্যই এ-জীবন, প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে; সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর। শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—যাহা দেয়, তাহা দিতেই হইবে।"

* * *

"কোন কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। নিম্নতর কার্য করে বলিয়াই একজন—যে উচ্চতর কার্য করে তাহার তুলনায় নিম্নস্তরের হয় না।...এই কার্য করিবার ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষা। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি ব্যবসায় ও কর্ম অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত জুতা প্রস্তুত করিতে পারে সে বড়।"

* * *

"দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না। সে ক্ষেত্রে সংগ্রামই ভালো।"

* * *

"যে কুসংস্কার তোমার মনকে আবৃত রাখিয়াছে, তাহা দূর করিয়া দাও। সাহসী হও। সত্যকে জানিয়া তাহা জীবনে পরিণত কর। চরম লক্ষ্য অনেক দূর হইতে পারে, কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।"

* * *

"সমাজব্যবস্থা একদিনে নির্মিত হয় নাই। পরিবর্তন করিতে হইলে—কারণ দূর করিতে হইবে। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে; কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, মূলে যাইতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তারপর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে শুধু প্রতিবাদে—চীৎকারে কোন ফল হইবে না, তাহাতে বরং অনিষ্টই হইবে।"

* * *

"যখন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে।"

* * *

"মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে—তোমরা সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছ, কখনও সাহায্য পাও নাই; যেটুকু সাহায্য পাইয়াছ, সব নিজের ভিতর হইতে। যে কাজে তুমি নিজে চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই ফল পাইয়াছ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ।"

* * *

"মন্দির বা গির্জার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু সেখানেই যাহার মৃত্যু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য।"

* * *

"আপনাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যিনি অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন? বেদান্ত পাঠ ও ধ্যানের সাধনা ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখুন। এ দেহ অপরের সেবায় উৎসর্গ করুন। তাহা হইলেই জানিব, আপনারা বৃথা আমার কাছে আসেন নাই।

* * *

"সর্বজীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানে আমি বিশ্বাস করি। সকল জাতির যাহারা দুর্বৃত্ত, দরিদ্র, নিপীড়িত, তাহারাই আমার ভগবান্। এই ভগবানের জন্য আমি বারে বারে জন্মিতে চাই। জন্ম জন্ম দুঃখ পাইলেও আমার দুঃখ নাই।"

* * *

"আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি।...সর্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের কথা শোনাইয়া কোন লাভ নাই।"

* * *

"আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য অন্যান্য সকল অর্থহীন দেবতাকেই আমাদের মন হইতে বিদায় দিতে হইবে। একমাত্র জাগ্রত দেবতা হইলেন আমার নিজের জাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, তাঁহার পদ, তাঁহার কর্ণ প্রসারিত রহিয়াছে; তিনি সকল কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। অন্যান্য সকল দেবতারা ঘুমাইতেছেন। যে বিরাট্ ভগবান্ আমাদের চতুর্দিকে রহিযাছেন, তাঁহার পূজা না করিয়া আমরা কি অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটিব? আমাদের চতুর্দিকে যাঁহারা আছেন—সেই বিরাটের পূজাই আমাদের প্রথম পূজা হইবে। ...মানুষ ও প্রাণী, ইহারাই আমাদের দেবতা—সর্বপ্রথম আমরা যে দেবতার পূজা করিব, তাঁহাবা হইলেন আমাদের স্বদেশবাসী।"

* * *

"তুমি যদি নিজের মুক্তি খোঁজ, তবে তুমি নরকে যাইবে। তোমাকে খুঁজিতে হইবে অপরের মুক্তি।...যদি অপরের জন্য কাজ করিয়া তোমাকে নরকে যাইতে হয়, তবে নিজের মুক্তি খুঁজিয়া স্বর্গে যাইবার অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক বেশী।"

* * *

"ভ্রাতৃত্ববোধ বা ধর্মবোধ কি আর দেশে আছে? কেবল অস্পৃশ্যতা। এই সমস্ত প্রথা যেগুলি মানুষকে ছোট করি... সেগুলিকে লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া ফেল!"

* * *

"মুমূর্ষুর জীবন রক্ষার জন্য জীবন দিয়া কাজ আরম্ভ ... ধর্মের মূলকথা।"

* * *

"তোমাদের কর্তব্য হইল জাতিধর্মনির্বিশেষে দীন-দুঃখীর ... করা। তোমাদের কাজের ফল বিবেচনা করিবার কি অধি... আছে? তোমাদের কর্তব্য হইল কাজ করিয়া যাওয়া।"

* * *

"আমার দেশের একটি কুকুরও যখন অনাহারে থাকিবে, তখন আমার সমগ্র ধর্মের কর্তব্য হইবে তাহাকে খাইতে দেওয়া।"

* * *

"ভারত যদি তাহার ভগবৎ-সন্ধান চালাইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার মৃত্যু নাই। কিন্তু সে যদি রাজনীতি করে, সামাজিক দ্বন্দ্বে নামে, তবে সে মরিবে।"

* * *

"যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি ধর্ম? আমাদের খালি 'ছুঁয়ো না' 'ছুঁয়ো না'।"

* * *

"প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি ক'রে মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল স্রোত ধর্ম। সেই স্রোতকে প্রবল করা হইলে পার্শ্ববর্তী স্রোতগুলিও বহমান হইবে।"

* * *

"আমি ধর্মপ্রচারক নই, আমার সত্যকার স্থান হিমালয়ে; কিন্তু আমি সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। এবং এই সংগ্রাম আমার দেশব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।"

* * *

"নিশ্চিত জানিও, সব কিছুতেই তুমি আছ। সেইজন্যই কাহাকেও আঘাত করিও না। কারণ, অন্যকে আঘাত করিলে তুমি নিজেকেই আঘাত করিবে।"

* * *

"অনন্তকাল ধরিয়া আমি এক—একাকী। কাহাকে আমি ভ
জীবন ভ সবই তো আমার আত্মা। এই সত্য অবিরাম ধ্যা
ভবিষ্যতের ভ-ব; ইহার ভিতর দিয়াই উপলব্ধি আসিতে থাকে। সে
করুন। তা ভিতর দিয়াই তুমি হইবে অপরের নিকট আশীর্বাদস্বরূপ।"
আসেন নাই। * * *

দেখিবার জন্য কে মোমবাতি জ্বালায়? সত্য যখন
"সর্বজীায়, কোনও সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না।"
বিশ্বাস ব * * *

তাহারা প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে। দৃঢ়চেতা
জন্মিব্যক্তিই সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।...প্রফুল্লতা
প্রয়োজন, তাই বলিয়া অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে চলিবে না।"

অতিরিক্ত হাস্যকৌতুক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় অলস করিয়া তোলে, ইহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বৃথা ক্ষয় হয়।"

* * *

"আমরা শরীরের যতোই যত্ন লই না কেন, শরীর তো একদিন যাইবেই। ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদের শরীর অপরের সেবা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

* * *

"আমি লক্ষপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব—এ ভাব যেমন, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তেমনি।"

* * *

"জগতে সর্বদাই দাতাব আসন গ্রহণ করো। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেও না। ভালোবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, যতটুকু যা তোমার দেওয়ার আছে দিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না। কোন শর্ত ক'রো না, তা হ'লেই তোমার ঘাড়েও কোন শর্ত চাপবে না।"

* * *

"কিছু পাওয়াব চেষ্টা ক'বো না, কিছু এড়াবার চেষ্টাও করো না—যা কিছু আসে গ্রহণ কর, 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট' হও। কোন কিছুতে বিচলিত না হওয়াই মুক্তি বা স্বাধীনতা। কেবল সহ্য ক'রে গেলে হবে না, একেবারে অনাসক্ত হও।"

* * *

"যদি তুমি কাউকে সিংহ হ'তে না দাও, তা'হলে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। তার কারণ, পুরুষ তার উপর অত্যাচার করছে। এখন সে শৃগালীর মতো; কিন্তু যখন তার উপর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।"

* * *

"জগৎটা আমাদের উপভোগের জন্য পড়ে রয়েছে। কিন্তু কখনও অভাববোধ ক'রে কিছু চেও না। অভাববোধ করাটা দুর্বলতা, অভাববোধই আমাদের দুর্বল ক'রে ফেলে। আমরা ভিক্ষুক নই, আমরা রাজপুত্র।"

*